সেমিনার
স্মারক-গ্রন্থ
[২০০৩-২০০৫]

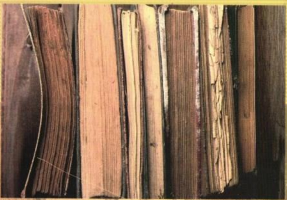

সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ

[২০০৩-২০০৫]

সম্পাদনায়

মোশাররফ হোসেন খান

সেমিনার বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

www.pathagar.com

সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ
[২০০৩-২০০৫]

সম্পাদনায়
মোশাররফ হোসেন খান

প্রকাশনায়
সেমিনার বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা),
ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৮৬২৭০৮৬
ই-মেইল : bic@accesstel.net

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০০৬

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

প্রচ্ছদ
গোলাম মাওলা

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

বিনিময়
একশত পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

সেমিনার প্রবন্ধ

আমরা কলম সৈনিক : আমাদের কলম হোক চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের হাতিয়ার
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ৫
বিশ্বায়ন : ইসলাম ও বাংলাদেশ ॥ অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ ১৭
শিক্ষা দর্শন : শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ৩৯
ইসলামী সংস্কৃতি : অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ৫০
বিশ্বায়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ ॥ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ৭৪
যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদ ॥ অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ ৯৮
ইজতিহাদ কি ও কেন ॥ মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান ১০৯
ক্ষুদ্র ঋণ : দারিদ্র্য দূরীকরণ বনাম সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন সুদৃঢ়করণ
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১১৫
সন্ত্রাসবাদ ॥ শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ১৪৫

পরিশিষ্ট

লেখক সম্মেলন ও সেমিনার-প্রতিবেদন ॥ মোশাররফ হোসেন খান ১৫৪

www.pathagar.com

আমরা কলম সৈনিক আমাদের কলম হোক চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের হাতিয়ার

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

■

শুরুর কথা

হৃদয় নিংড়ানো সকল প্রশংসা আর ভালবাসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য 'যিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষ জানতো না', (সূরা আল আলাক : ৪, ৫ আয়াত), যিনি চিরঞ্জীব, নিত্য বিরাজমান (সূরা আল বাকারা : ২৫৫ আয়াত), যিনি মানুষকে (নারী ও পুরুষ) আর প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়ে (সূরা আল বাকারা : ৩০ আয়াত), অতুলনীয় সম্মান প্রদান করেছেন (সূরা ইসরাইল : ৭০ আয়াত)। সিজদাবনত হৃদয়ে তাঁকে জানাই অনন্ত কৃতজ্ঞতা।

ফুলের মত ফুটফুটে মেয়ে শিশুদের জীবন্ত কবরদানকারী, পাথরের চেয়েও কঠিন আর নিষ্ঠুর হৃদয়ের অধিকারী মানুষগুলোর কাছেও "আল আমিন" বা পরম বিশ্বাসীর শ্রদ্ধা অর্জনকারী, মানব জাতির মুক্তির দিশারী, অনুপম চরিত্রের অধিকারী, নারীদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী অনন্য সে মানুষটির কথা স্মরণ করছি, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি পৃথিবীতে আল্লাহপাক প্রদত্ত মানুষের (নারী ও পুরুষ) প্রতিনিধিত্বের ভূলুণ্ঠিত মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অতুলনীয় সম্মানের অধিকারী মানুষের ইবাদাত পাবার যোগ্য সত্তা একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কেউ নয়, এ সত্য তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বললেন, 'এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর, তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক (সূরা আল আনআম : ১০২ আয়াত)।' তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার রব কথাবার্তা বলবেন। তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না।' (সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম) সূত্র : রিয়াদুস সালেহীন ২য় খণ্ড, ৪০৫ নং হাদীস

www.pathagar.com

অগণিত দরূদ বর্ষিত হোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যিনি মহান আল্লাহপাকের প্রতিটি নির্দেশ বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে বাস্তবায়ন করেছেন, জীবনের ঝুঁকিকে তুচ্ছ করে আল্লাহপাকের নির্দেশের আনুগত্যে অটল থেকেছেন। আল্লাহপাকের ভাষায় তিনি আমাদের মত একজন মানুষই ছিলেন। যার কাছে মহান আল্লাহপাক মানব জাতির জন্য ওহী বা আসমানী দিক নির্দেশনা নাযিল করেছেন। অনুসরণের জন্য একমাত্র তাঁর চরিত্রই আদর্শ মানদণ্ড। মন্দের সীমাহীন প্রাধান্য ও প্রাবল্যের ভেতর দিয়ে কিভাবে ভালকে জয়যুক্ত করতে হয় এবং তার প্রাধান্য বজায় রাখতে হয় তার উদাহরণ মানব জাতির জন্য রাসূলই (সা) রেখে গেছেন। এ কথা আমাদের সবারই জানা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন ডিগ্রিধারী মানুষ ছিলেন না। ওয়াদা রক্ষা করা, সঠিকভাবে আমানতের হিফাযত করা, কখনই মিথ্যার আশ্রয় না নেয়া, ঝগড়া না করা ও সুন্দর ব্যবহারে তিনিই হয়েছিলেন চরম মন্দের মধ্যে মানুষের পরম আস্থাভাজন এবং বিচক্ষণ মানুষ। হয়েছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত শেষ রাসূল এবং আল্লাহপাক প্রদত্ত জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের নির্ভীক সেনাপতি।

আল্লাহপাক প্রদত্ত জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের সেইসব অতন্দ্র সৈনিক, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের ওপরও আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক, যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

কলম সৈনিক কারা

বস্তুত আনুগত্যেই সৈনিকের পরিচয়। কলম সৈনিকরাও এর ব্যতিক্রম নন। কিয়ামত পর্যন্ত আল কুরআনকে অবিকৃত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহপাক নিজেই (সূরা আল হিজর : ৯ আয়াত) এবং আল কুরআনের বিধান অনুযায়ী গোটা মানব জাতিকে পরিচালনা করার দায়িত্ব রয়েছে ঈমানদার মানুষদের (নারী ও পুরুষ) ওপরই। আর পরিচালনার যুগোপযোগী দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব রয়েছে বিশ্বাসী কলম সৈনিকদের। কিন্তু যার যা নেই তা সে দিতে পারে না কখনো। আসমানী জ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয় যে কলম সৈনিকের হৃদয় এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যাপন, তাঁর কলমতো আসমানী নীতির যুগোপযোগী দিক নির্দেশনার হাতিয়ার হবে না কখনো। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত বা Technological, সামাজিক, ভৌগোলিক প্রাকৃতিক-সার্বিক দিকে পরিবেশের যে অভাবনীয় পরিবর্তন ইতিমধ্যে হয়েছে একজন কলম সৈনিকের আসমানী জ্ঞানের পাশাপাশি তার সাধ্য অনুযায়ী এই পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত খুঁটিনাটি জানা থাকতে হবে। পরিবেশের বিশ্লেষণ করতে হবে আসমানী নীতিমালার ভিত্তিতে আর আসমানী সেই নীতিমালার ভিত্তিতেই আমাদের আজকের বিশ্বের পরিবেশকে সাজানোর দিক নির্দেশনা দিতে হবে নিপুণভাবে।

একজন সৈনিক আলেম নাও হতে পারেন। তেমনি একজন আলেম সৈনিক নাও হতে পারেন। কিন্তু একজন বিশ্বাসী কলম সৈনিককে একই সাথে আলেম ও সৈনিক হতে হয়। একই সাথে দু'টো মর্যাদার দায়িত্ব বহনের কারণে খুবই সাবধানে তার কলমকে

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে হয়। তরবারির ধার বা সঙ্গীনের শক্তি শরীরকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে কেবল, মানুষের মনকে পরাজিত করতে পারে না। কিন্তু কলম? তার ধারতো হৃদয়কে হিদায়াতের আলোয় ভরিয়ে দেয় কিংবা কুফরীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে কিংবা বিভ্রান্তির গলিপথে হৃদয়কে হয়রান করে। তাই বিশ্বাসী কলম সৈনিককে ভাবতেই হয় যে, তার কলমের ধার, হাজার হাজার বনি আদমের হৃদয়কে কি বিভ্রান্তির অন্ধ গলিপথে হয়রান করে জাহান্নামের অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে, নাকি হিদায়াতের নূর দিয়ে জান্নাতের রাজপথে নিয়ে তুলবে আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিদার পেয়ে সে হৃদয় তৃপ্ত হবে।

বিশুদ্ধ জীবনাদর্শ বিশুদ্ধ চিন্তার উৎস

হিদায়াতের নূর তো কেবল আল কুরআন আর সুন্নাহতে আছে। পৃথিবীর তাবৎ মানুষ আল্লাহপাকের নাযিল করা আসমানী নূরেই আলোকিত হয়ে সোনার মানুষ হয়, হয়েছিল এবং হচ্ছে। মানুষের হৃদয়টাকে আলোকিত করার মতো যোগ্যতা আর কিছুরই নেই। বাংলাদেশ তথা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের হৃদয়গুলোকে কুফরী, মুশরিকী জীবনাদর্শের বিভ্রান্তির অন্ধকারে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে তাগুতের কিছু কলম সৈনিক। বিভ্রান্তির অন্ধগলিতে খাবি খাওয়া মানুষে হৃদয়গুলোর মুক্তির জন্য কারা সংগ্রাম করবে? বিশ্বাসী কলম সৈনিকরা ছাড়া আর কারা? কিন্তু আমাদের অনেকের জীবনাচরণ আর দৃষ্টিভঙ্গিতে আল কুরআনের নীতিমালার নূর নেই। অথচ আল কুরআনের নূর যেখানে পড়ে সেখানেই সোনা হয়। মানুষের হৃদয় সে নূরের আলোয় আলোকিত হলে সে মানুষ সোনার মানুষ হয়। কোন জীবনাদর্শের প্রতি দুর্বলতা না দেখিয়েই বলছি জীবন সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গতার ধারণা আল কুরআনের জীবনাদর্শেই পেয়েছি। জীবনের পূর্ণাঙ্গতা দু'টো পর্যায়ের সম্মিলনে হয় : দুনিয়া ও আখিরাত। জীবনের এ দু'টো মৌলিক দিকের দ্বিধাহীন দিক নির্দেশনা কেবল আল কুরআনেই আছে। আল কুরআনই একমাত্র বিশুদ্ধ জীবনাদর্শ। আল কুরআনই বিশুদ্ধ চিন্তার উৎস।

চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের হাতিয়ার

কলমতো হাতিয়ার নয়, হৃদয়টাই আসল হাতিয়ার। ভাষাতো হাতিয়ার নয়, মনের ভাবটাই আসল হাতিয়ার। কলম তাই লিখে, হৃদয় যা লিখতে বলে। ভাষায় তাই-ই বের হয়, ভাব যা বলতে বলে। হৃদয় আর ভাবের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে জীবনাদর্শের। জীবন ও জগৎ পরিচালনার জন্য মানুষ যে জীবনাদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে, সে জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটে তার ভাষায়, কলমে এবং চরিত্রে। তাই চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের হাতিয়ার মূলত বিশুদ্ধ জীবনাদর্শ।

বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের প্রতিফলন

লেখকদের লেখা ও জীবনাচরণে বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের যতো প্রতিফলন ঘটবে চিন্তার বিশুদ্ধি ততো ত্বরান্বিত হবে। লেখকের কথা, কলম, জীবনাচরণ তথা চরিত্র সবই তখন হয়ে উঠবে হাতিয়ার, ক্ষুরধার। কলম সৈনিকদের চরিত্র ও জীবন-যাপনে বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের প্রতিফলনের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ নিয়েই পরবর্তী আলোচনা।

www.pathagar.com

১. আল কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক

সূরা আল হিজর এর ৯নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি উহার সংরক্ষক।"

সূরা আলে ইমরান এর ৭নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, "তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, এইগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো রূপক বা মুতাশাবিহ, যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রূপক আয়াতের অনুসরণ করে।"

সূরা আল বাকারার ২নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, "যালিকাল কিতাবু... মুত্তাকীন"– "এটা সেই কিতাব এতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ নির্দেশক।"

জীবনের প্রতিটি স্তরে বা বাঁকেই রয়েছে ভাল ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব। সত্যের পথে অবিচল থাকতে মানুষের প্রয়োজন হয়েই পড়ে সত্যের দিক নির্দেশনার। বার বার আল কুরআনের আসমানী নীতিমালার কাছে আমরা মুখাপেক্ষী হলে, একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমরা বিশ্বাস করি আল কুরআন সংরক্ষক আল্লাহপাক এখনও আল কুরআনকে অবিকৃত রেখেছেন। প্রমাণিত হয় যে, আমরা বিশ্বাস করি আল কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ। সর্বোপরি কুরআনের প্রতি মুখাপেক্ষীতাই মূলত আল কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্কের প্রমাণ। ব্যক্তির জীবনে বা সমাজে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাতে আল কুরআনের আয়াতের প্রতিফলন দেখতে পাওয়াটাও আল কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্কের প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে ড. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল এর ব্যক্তিগত জীবন থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। ঘটনাটি ১৯৮৮ সালের। ড. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল ছিলেন একজন পণ্ডিত, কবি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার অধিকারী মানুষ। শুনা যায়, জীবনে একাডেমিক ক্যারিয়ারে তিনি কখনো দ্বিতীয় হননি। মৃত্যুর পূর্বে ১৫ জুলাই, ১৯৮৮ তারিখে ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় তিনি লিখেছিলেন :

"কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, আমার মৃত্যু আসন্ন। এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। আজ মধ্যরাতেই কাউকে না জানিয়ে চলে যেতে পারি। আবার থেকেও যেতে পারি। কিন্তু কতো দিন? তা কেউ বলতে পারে না। এরকম অনিশ্চয়তার ভেতর বেঁচে থাকা যায়! যেন অস্থায়ী চাকরী। পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ বহাল হল। যদি জানতাম আরো ছ'মাস আছি, সেভাবেই কাজ-কর্ম অগ্রাধিকার অনুযায়ী গুছিয়ে-টুছিয়ে নিতাম। আগে তো ওসবই হিসেব-নিকেশ করিনি। এখন দেখছি আমি একটা আপাদমস্তক ব্যর্থ মানুষ।"

এক সপ্তাহ পরে, ২৪ জুলাই, ১৯৮৮ তারিখে লেখা ডায়েরীতে তাঁর শেষ বক্তব্যটি ছিল এরকম–

"মানুষ যদি নিকটতম ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু অনুমান করতে পারতো!"

জীবনে দ্বিতীয় হননি এমন একজন মানুষ যখন নিজেকে আপাদমস্তক ব্যর্থ মানুষ বলে উল্লেখ করেন এবং নিকটতম ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানা তো দূরের কথা, অনুমানও করতে

www.pathagar.com

পারছেন না বলে স্বীকৃতি দেন তখন আল কুরআনে বর্ণিত সেই আয়াতগুলোর কথা মনে হয়, যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন :

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। যাকে আগুন হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সেই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময়ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫ আয়াত)

আল্লাহপাক আরো বলেন, "কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।" (সূরা ৩১ লুকমান : ৩৪ আয়াত)

ডায়েরীর পাতায় উৎকীর্ণ জনাব আবু হেনার জীবনের গভীরতম উক্ত উপলব্ধিগুলো কি আল কুরআনের উক্ত আয়াতগুলোর প্রতিধ্বনি নয়? এভাবে বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার ভেতর আল কুরআনের নূরকে খুঁজে পাবার মত গভীর সম্পর্ক আল কুরআনের সাথে কলম সৈনিকদের থাকা প্রয়োজন।

২. মৌলিক ইবাদাতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা

কমিশন্ড র‍্যাংক বলে সেনাবাহিনীতে বিশেষ মর্যাদার সৈনিক কর্মকর্তাদের বুঝানো হয়। কমিশন বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কারণেই এই মর্যাদা। আল্লাহপাক নির্ধারিত মৌলিক ইবাদাতসমূহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মনোভংগির সাথে পালন করার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নিহিত।

সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ এবং পর্দা মৌলিক ইবাদাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আল মাউনে আল্লাহ পাক "ফাওয়াই... লীন" বা "সেইসব নামাযীদের জন্য ওয়াইল নামক জাহান্নাম" বলে মূলত সালাতের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার অভাবে কি অমর্যাদাকর পরিণতি একজন নামাযীর জীবনে ঘটে তারই কথা বলেছেন। একইভাবে মিথ্যা কথা ও কাজ যে পরিত্যাগ করেনি তার সাওম মূলত ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট ব্যতীত কিছু নয় বলে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হাজ্জ করলো না তার মৃত্যু ইসলামের ওপর হয়েছে কি না তা আল্লাহপাকই ভাল জানেন। সম্পদের পবিত্রতাই অর্জন হয় না যাকাত প্রদান না করলে। সবচেয়ে অবহেলিত হলো পর্দার বিধান। আল্লাহপাক বলেন,

"চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।" (সূরা আল মুমিন : ৪১ আয়াত)

আল্লাহপাক আরও বলেন, "মুমিন নর-নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।" (সূরা আন নূর : ৩০, ৩১ আয়াত)

এ প্রসঙ্গে আমি দুজন বিখ্যাত কবির কবিতার কিছু চরণ তুলে ধরতে চাই যা পাঠককে আল্লাহপাকের নাযিলকৃত পর্দার আসমানী নীতিমালা হতে বিচ্যুত হতে উৎসাহিত করছে :

www.pathagar.com

যেমন, তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি
একি মোর অপরাধ?

কিংবা–

“হলেই বা তুমি স্রষ্টার গড়া সৃষ্টি সে অনুপম
আমি যে দ্রষ্টা, দৃষ্টি আমার দান;
স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির চেয়ে দ্রষ্টা সে নহে কম
দৃষ্টি অভাবে সৃষ্টি যে হয় ম্লান।”

দুজন বিখ্যাত কবির দু'টো কবিতার এই চরণগুলো কি দৃষ্টিকে অসংযত করতে উৎসাহিত করছে না? অথচ এর পাশাপাশি অসংযত দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণাদায়ী কাব্যও রয়েছে। যেমন,

ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে
কারো নজর পড়তে পারে
মেঘেদের উড়ো চিঠি
উড়েওতো আসতে পারে
ঝলমল করিও নাগো
তোমার ঐ অত আলো
বেশী রূপ হলে পরে
সাবধানে থাকাই ভাল
মুখের ঐ উড়নিটাকে একটু ঢাকো
খুলোনাকো দোহাই একেবারে।

উড়নি দিয়ে চাঁদের সৌন্দর্যকে মেঘের অসংযত উড়ো দৃষ্টির আড়াল করতে কবি এখানে পরামর্শ দিচ্ছেন। এবার দেখা যাক, ইসলামের মূল আকীদাগুলোর বিষয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার ধরন কেমন। তাওহীদ হচ্ছে ইসলামের প্রাণ। আল্লাহপাকের সত্তা এবং গুণাবলীর বিষয়ে কোন বস্তু তো নয়ই, কোন ব্যক্তি এমনকি কোনো নবীকেও ভক্তির আতিশয্যে শরীক করা পরিত্যাজ্য। যেমন,

“বারেক মুখে নিলে যাঁর নাম
চিরতরে হয় দোযখ হারাম,
পাপীর তরে দন্তে যাঁহার
কওসরের পিয়ালা”

কিংবা–

শহীদের তাজা খুন মেখে
ওই এল পুন কোরবানী
নিয়ে এল কোন মন্তরে
অন্তরে নব সুরখানি।

www.pathagar.com

উদ্ধৃত কবিতার চরণগুলো বিশ্লেষণে আমরা কি পাই? মুখে কয়েকবার নবীর নাম নিলেই চিরতরে দোযখ হারাম হয়ে যাবে– এ ধারণা কি তাওহীদের মূল ধারণার অনুরূপ? কিংবা ইসলামে কি "মন্ত্র" জাতীয় কোন ধারণা আছে? অথচ আমাদের চারপাশে এ জাতীয় ধারণা আর বিশ্বাসেরই ছড়াছড়ি। তাই সচেতনভাবেই একজন বিশ্বাসী কমল সৈনিককে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সঠিক ধারণা অর্জনের পাশাপাশি মৌলিক ইবাদাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চেতনার অধিকারী হতে হবে। এভাবেই প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ চিন্তার মুখপাত্র হওয়া সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে সূরা আত-তাওবার ৬৬নং আয়াত এবং সূরা আল হাজ্জ-এর ১১নং আয়াতের বক্তব্য :

আল্লাহপাক বলেন, "এখন তোমরা আর কৈফিয়ত পেশ করো না, ঈমান আনার পরও তো তোমরা কুফরী করেছো" (Make no excuse; You disbelieved after you had believed) (সূরা আত-তাওবা : ৬৬ আয়াত)। সূরা আল-হাজ্জ এর ১১নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন, "মানুষের মধ্যে কেউ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে, তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে। এটা তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।"

৩. সামগ্রিক চেতনার অনুভূতি

মুসলিম উম্মাহর চেতনা বা সামগ্রিক চেতনার চেয়ে নবাবী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনা বর্তমান মুসলিম সমাজকে এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের সামগ্রিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন এই বলে যে, "কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি তা'মুরূনা বিল মারূফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকারি ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ"– তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর। (সূরা আলে ইমরান : ১১০ আয়াত) মুসলিম শাসনাধীন সুলতানী কিংবা মুঘল আমলের কিছু ব্যতিক্রমী শাসক ছাড়া প্রায় সকল সম্রাট বা নবাবদের জীবন ছিল আল কুরআনের সেই উম্মাহর চেতনা থেকে বহু দূরে। রাজ্যের মানুষ বা উম্মাহর কল্যাণ নয় বরং জমিদারী সীমানা, পর নারী আর মদ, এই ছিল তিন মূল চেতনা। আজও এ ধ্বংসাত্মক চেতনার প্রভাব, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রধান শত্রু হয়ে আছে। এ ধ্বংসাত্মক চেতনার মোহ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পালন করতে হবে বিশ্বাসী কলম সৈনিকদেরই, যেন উম্মাহর চেতনায় মুসলিম জনতা আবারও ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা খুঁজে পায়।

৪. চিন্তার ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার চেতনা

আল কুরআনের বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের ব্যাপারে উদাসীনতা, স্বেচ্ছা-মূর্খতা আর হঠকারী জীবনযাত্রা, বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের চর্চাকে অসম্ভব করে তুলেছে প্রায়। ফলে আমরা ব্যাপকভাবে চিন্তা আর আচরণের বিক্ষিপ্ততায় তথা ঐক্যহীনতায় জর্জরিত এবং জীবনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিশ্বের দরবারে দুর্বল ও শক্তিহীন একটি জাতি হিসাবে

www.pathagar.com

পরিচিত। চিন্তার ঐক্য আর সংঘবদ্ধতার চেতনাই যে একটি দুর্বল ও শক্তিহীন জাতির উত্থানের মূলসূত্র এবং আল কুরআনের বিশুদ্ধ জীবনাদর্শই যে এর একমাত্র উৎস, এ বিষয়টি শক্তিশালী এবং জীবন ঘনিষ্ঠ উপমায় তুলে ধরার দায়িত্ব এসে যায় বিশ্বাসী কলম সৈনিকের ওপর।

৫. বড়ত্ব অথবা হীনমন্যতা নয়, প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস

শুরুতেই বলেছিলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই কলমের সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষ জানতো না। (সূরা আল আলাক : ৪, ৫ আয়াত) বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে আছেন আল্লাহপাক। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। (সূরা আল বাকারা : ২৫৫ আয়াত)

আজকের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যা কিছু ভাল আমরা দেখি, সবই সময়ের সাথে সাথে আল্লাহপাকের প্রদত্ত বিধান এবং প্রেরিত রাসূলদের জীবন দৃষ্টান্ত হতে গৃহীত। ঐসব কল্যাণকর জীবন পদ্ধতি, জ্ঞান এবং আচরণ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্য দিয়ে বর্তমান সভ্যতা পর্যন্ত পৌঁছেছে। দুঃখজনক হলো, আল্লাহপাকের বিধানের কল্যাণকর সঠিক দিকগুলোকে কাজে লাগিয়ে মানুষ উপকৃত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যে আল্লাহপাক মানুষের কল্যাণে এগুলো দিলেন তাঁর প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নেই। ইসলামে যেসব সুন্দর জীবনাচরণ রয়েছে ঐক্যবদ্ধভাবে যদি তা মেনে চলা সম্ভব হত, তবে আমাদের এ পৃথিবীটা অনেক সুখের হত। তাই প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কিছু ভাল দিক দেখেই নিজেদের হীনমন্যতায় ভোগার কোন কারণ নেই, তেমনি অহেতুক বড়ত্বের জটিলতায় ভোগারও কোন যুক্তি নেই। বরং আল্লাহপাক প্রদত্ত মর্যাদা সচেতন করে তোলা, মানুষকে আত্মবিশ্বাসী এবং আল্লাহমুখী করাই কলম সৈনিকের কাজ।

৬. নারীদের মর্যাদা সচেতনতা

জাহিলিয়াতের যুগেও কোন মা তার মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দিয়েছে এমন শুনিনি। বরং বাবা বা পুরুষরাই এ নিষ্ঠুরতম কাজ করে নারীর মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়েছে। পৃথিবীর কোথাও কোন পতিতলয় নেই, কিন্তু অসংখ্য পতিতালয় রয়েছে। পুরুষরাই এইসব পতিতালয়ের কারিগর। পুরুষরাই এর খদ্দের এবং নেপথ্য নায়ক। এখানেও নারীর মর্যাদা হরণকারী হচ্ছে পুরুষ। নারীবাদিতা, নারী আন্দোলন নামে সারা পৃথিবীতে যাই-ই পর্যবেক্ষণ করুন না কেন এর পেছনে পুরুষদেরই হাত পাবেন। গোটা পাশ্চাত্যের নারীকে যে শুধু পণ্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে বা নারীকে পণ্য হয়ে তৃপ্ত হবার অনুভূতিতে অভ্যস্ত করা হয়েছে, এর পেছনেও পুরুষরাই রয়েছে।

অন্যদিকে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারীও পুরুষ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় শুধু আরব নয় তৎকালীন রোম ও পারস্য সভ্যতায় নারীর যে অবর্ণনীয় অবমাননাকর অবস্থা ছিল তা থেকে নারীর মর্যাদাকে যে চূড়ায় উপনীত তিনি করেছিলেন তা এক কথায় অতুলনীয়। বর্তমানে এত মানবাধিকার সংস্থা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ নারী ন্যূনতম মানবাধিকারও পাচ্ছে না। বস্তুত লোক দেখানো দরদ আর আল্লাহর ভয়ে আন্তরিক দরদের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতালের ফারাক। আর তাই নারীকে

www.pathagar.com

আল্লাহপাকের দেয়া মর্যাদা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো নারীর প্রতি সদাচরণই প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকারকে নিশ্চিত করতে পারে। পুরুষ সভ্যতার চালক হলে নারী মানব সভ্যতার গাড়ী। গাড়ী ছাড়া, চালকের চালনার যোগ্যতা থাকা না থাকা অর্থহীন। নারী ছাড়া সভ্যতার কোন বিকাশ নেই। মানব সভ্যতার বিকাশে নারীর গুরুত্ব আল্লাহপাকের কাছে এতই যে তিনি আন নিসা বা নারী (Woman) নামে একটি সূরাই নাযিল করেছেন। বিশ্বাসী কলম সৈনিকদের কলমের হাতিয়ার চালনায় অবশ্যই গভীর গুরুত্ব দিতে হবে নারীর মর্যাদার মত স্পর্শকাতর বিষয়ে।

৭. মর্যাদা সচেতনতা ও শব্দের ব্যবহার

প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষের এই বাংলাদেশে কিংবা ৬০০ কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে কলম সৈনিকের হাতিয়ার হতে যে শব্দ বা বাক্য বের হবে তার মর্যাদা মূলত এক একটি বুলেট কিংবা ক্ষেপণাস্ত্রের। যা অসংখ্য মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের কারণ হতে পারে। শুধু তাই নয়, যিনি সেই শব্দ বা বাক্যের সফল প্রয়োগ করবেন দুনিয়া ও আখিরাতে তার ব্যক্তিগত কল্যাণ-অকল্যাণও এর সাথে জড়িয়ে আছে।

আল্লাহপাক বলেছেন, "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" (সূরা কাফ : ১৮ আয়াত)

সুতরাং একজন কলম সৈনিক যে কি বিশাল মর্যাদার অধিকারী তা অনুভবে রেখেই শব্দ বা বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হতে হবে। অন্যথায় অসংখ্য মানুষের চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের পরিবর্তে চিন্তার বিভ্রান্তিই বাড়াবে কেবল।

৮. লেখার রুহ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আস্ সাফ-এ বলছেন, "ইয়া আইয়্যুহাল... আনতাকুলু মালা তাফআলুন"– "হে মুমিনগণ, তোমরা সে কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরা কর না, তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।" (সূরা আস্ সাফ : ২, ৩ আয়াত)

কথা ও কাজের অমিল, কোন ব্যক্তির চিন্তার বিভ্রান্তির একটি প্রমাণ এবং হাদীসের পরিভাষায় এটি একটি মুনাফিকির লক্ষণ। যিনি নিজেই চিন্তার জগতে বিভ্রান্ত তিনি কিভাবে বিশুদ্ধ চিন্তা উপহার দেবেন? একটি অত্যন্ত সুলিখিত লিখনও কোন কার্যকর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না যখন লেখকের জীবনাচরণ ও লেখার বক্তব্যের মধ্যে মিল না থাকে। কথা ও কাজের মিলের অভাবে একটি ভাল লেখা একটি জড় বস্তুর মতই প্রাণহীন। অথচ কথা ও কাজের মিল থাকার কারণে সেই একই লেখা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। যেন এক রুহ, সে লেখার ভেতরে রয়েছে। আল কুরআন পড়ার সময় আমরা যে প্রাণবন্ত তা অনুভব করি তার কারণ হচ্ছে আল্লাহপাকের চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ নন এবং কথা ও কাজের মিলেও তিনি অতুলনীয়। আর এজন্যই তাঁর প্রেরিত কিতাবের গভীর প্রভাব আজও আছে। কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাই লেখায় রুহ থাকার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিশ্বাসী কলম সৈনিকদের অপরিহার্য সঙ্গ হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

৯. কৃতজ্ঞচিত্ততা

পৃথিবীতে যত জাতি বিশ্বসভায় নিজেদের সম্মানজনক আসন তৈরি করে নিয়েছে এরা সবাই জাতীয়ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী। সেটা হচ্ছে কৃতজ্ঞচিত্ততা। জাতীয়ভাবে এই গুণের নিরব দুর্ভিক্ষ আমাদের মাঝে আছে। আন্তরিকভাবেই কেউ কারো উপকার করলে, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ই না, বরং সে উপকারটা তার নেহায়েত প্রাপ্য ছিল তাই-ই তিনি পেয়েছেন, যেন এর জন্য কোন সৌজন্য প্রকাশের প্রয়োজনও নেই এমন একটা ভাবই প্রকাশ পায়। জাতীয়ভাবে এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে কলম সৈনিকদেরই উদারতা, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞচিত্ততা চর্চার এক নতুন স্রোতধারাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে, অন্যথায় চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের জন্য শত চেষ্টা এই সংকীর্ণতার চরায় আটকে থাকবে।

আল্লাহপাক বলছেন, "এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সূরা আন নাহল : ৭৮ আয়াত)।

সুতরাং আল্লাহপাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধারণাকে এবং মানুষের প্রতি সদাচরণ ও সৌজন্য প্রদর্শনকে নিজেদের কথায়, লেখায়, আচরণে প্রকাশ করার সংগ্রাম কলম সৈনিকদেরকে চালিয়েই যেতে হবে।

১০. চারটি আবশ্যিক গুণ

তখনও নবুওয়াতের জন্য মনোনীত হননি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু আরবের সব মানুষের কাছে তার পরিচয় ছিল, তিনি সত্যবাদী, আমানতদার, ওয়াদাপালনকারী আর সুন্দর ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ প্রদর্শনকারী। এই চার গুণের প্রভাব এতই যে, চরম জাহিলিয়াতের মধ্যেও নবীজীকে তারা "আল-আমিন" বলতে নিজেদেরকে বাধ্য মনে করেছে। লেখক যতবড় মাপেরই হোন না কেন, ঐ চারটি মৌলিক গুণের একটিকেও যদি কেউ অবহেলা করেন, তবে তার মর্যাদা ধুলিমলিন হবেই। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কেবল একজন ভাল মানুষ হতে হলেও ঐ গুণগুলোর প্রয়োজন। ঐ চারটি গুণ শুধু মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। কোন পশু কিংবা মানুষ নামের পশুর মধ্যে ঐ গুণগুলো পাওয়া যাবে না।

একজন মুসলিমের ঐ গুণগুলোতো অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আজকে মুসলমানদের মধ্যে ঐ গুণগুলোর বড় অভাব। অনেকেই এখন যত বড় লেখক তত বড় অবৈধ যৌনচারী, ততবেশী মদখোর, ততবড় নকলকারী, ততবেশী মিথ্যেবাদী, ততবেশী খেয়ানতকারী, ততবেশী ওয়াদাখেলাপকারী। মানুষের সমাজকে যারা শুদ্ধ করবে তারাই আকণ্ঠ অশুদ্ধিতে নিমজ্জিত। এদের কাছেই যদি সমাজের পথ নির্দেশের প্রত্যাশা করা হয় তবে গোটা জাতিকেই এরা মদ ও নারীর আসক্তিতে নিমজ্জিত করার পরামর্শ ও মন্ত্রণা দেয়া ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না।

তাই কলম সৈনিকদেরকে মানবীয় ঐ চারটি গুণের বিকাশে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাতে হবে। তাহলেই প্রকৃতপক্ষে কলম হয়ে উঠবে চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের হাতিয়ার।

www.pathagar.com

১১. সবাইকে ভাল বানানোর চেতনা

সবাইকে ভাল বানানোর এক অসম্ভব, অপ্রাকৃতিক এবং অবাস্তব সাধনা করছে এমন মানুষ আমাদের সমাজে এখন অনেক।

আল্লাহপাক বলছেন, "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে।" (সূরা আয যুখরুফ : ৩৬, ৩৭)

শয়তান যার সহচর সে তো কখনো ভাল হবার নয়।

আল্লাহপাক আরো বলেন, "এইভাবেই নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে।" (সূরা আল ফুরকান : ৩১ আয়াত)

নবীর শত্রুরা কি ভাল হয়েছিল কখনো? আবু জাহল কি শেষ পর্যন্ত ভাল হয়েছিল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন তা হলো : "অন্যান্য সব জীবন বিধানের ওপর ইসলামী জীবন বিধানকে বিজয়ী করা।" (সূরা আস্ সাফ : ৯ আয়াত)।

সবাইকে ভাল করে ফেলার দায়িত্ব আল্লাহপাক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেননি। বরং খারাপের ওপর ভালর প্রাধান্য সৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছেন। মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত করতে বলেছেন।

এভাবে আল কুরআন-আল হাদীসের পর্যালোচনায় দেখা যায়, সবাইকে ভাল বানানোর চেতনা একটি অলীক স্বপ্ন। পৃথিবীর জীবনে এ অসম্ভব। কলম সৈনিককে সচেতনভাবেই ভালর প্রাধান্য ও প্রাবল্য সৃষ্টির সাধনা করতে হবে। তাই ইসলামে শুধু সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিই নয় বরং আল কুরআনের পথে দৃঢ়তার চিত্র তুলে ধরতে হবে কলম সৈনিকদেরকে। আমাদের মনে রাখতে হবে সৌন্দর্যে মুগ্ধতা আসে আর দৃঢ়তায় আসে বিজয়।

শেষ কথা

পরিশেষে বলতে চাই, আল্লাহপাকই বিশুদ্ধ চিন্তার দৃশ্য-অদৃশ্য সকল উৎসবের মালিক। বিশুদ্ধ চিন্তার প্লাবনে সব জঞ্জাল সাফ করতে হলে প্রয়োজন আল্লাহ্ পাকের অফুরান দান। একজন কলম সৈনিক যদি সেই দানের উপযুক্ত না হন তবে তিনি কিভাবে তার হাতিয়ারকে বিশুদ্ধ চিন্তার প্লাবন সৃষ্টির জন্য কাজে লাগাতে পারবেন? আর নিজেকে আল্লাহপাকের দানের উপযুক্ত করতে হলে আল্লাহ্ পাকের সাথে গভীর সম্পর্কের কোন বিকল্প নেই।

বিশুদ্ধ চিন্তার জন্য চাই বিশুদ্ধ মানুষ। বিশুদ্ধ মানুষ পেতে হলে প্রয়োজন, মাতৃগর্ভে তাকদীর লেখার আগেই আল্লাহপাকের কাছে নেক সন্তানের তথা বিশুদ্ধ প্রজন্মের জন্য অশ্রুপাতের সাথে দোয়া এবং দাওয়াত ও সদাচরণের মাধ্যমে মানুষের মনকে জয় করা।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে সূরা হা হীম আস্ সাজদা-তে আল্লাহপাক বলেন, "ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী হয় কেবল তারাই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী হয় কেবল তারাই যারা মহাভাগ্যবান।" (সূরা হা হীম আস্ সাজদা : ৩৪, ৩৫ আয়াত)

সেই মহাভাগ্যবান মানুষ হবার এবং আগামী প্রজন্মকে বিশুদ্ধ চিন্তার সাথে গড়ে তোলার সংগ্রামে আল্লাহপাক আমাদের বিজয়ী করুন। ■

লেখক-পরিচিতি : শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির- বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ম্যানেজার, (কষ্ট এন্ড বাজেট), দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন, গাজীপুর, ঢাকা।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১৮ই মার্চ, ২০০৪ লেখক সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

বিশ্বায়ন : ইসলাম ও বাংলাদেশ

অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ

■

১. ভূমিকা

২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ[১] নামে আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশ পায়। এতে 'বিশ্বায়ন' ও অন্যান্য প্রসঙ্গে যৎসামান্য আলোকপাত করা হয়। বছর চারেক পর আমি এ বিষয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি জাতীয়ভিত্তিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করি।[২] সে সময় আমাদের চিন্তার জগতে 'বিশ্বায়ন' বা Globalization নামের প্রপঞ্চটিকে গেঁথে দেওয়ার জন্যে দেশী-বিদেশী, বিশেষ করে, পশ্চিমা প্রচার-মাধ্যম ও পণ্ডিতকূল ব্যাগ্র হয়ে ওঠে। আমরা লক্ষ্য করে দেখি, 'বিশ্বায়ন' নতুন কিছু নয়; সামন্তবাদ-উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ধারাবাহিকতার সর্বসাম্প্রতিক প্রকাশ। সে সময় 'সভ্যতার সংঘাত' (স্যামুয়েল হান্টিংটন) বা 'ইতিহাসের পরিসমাপ্তি' (ফ্র্যান্সিস ফুকুয়ামা) বলে কিছু দার্শনিক বিতর্কও আরম্ভ করা হয় মূলত সমাজতন্ত্রের পতন-পরবর্তী পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সম্ভাব্য রূপ-চরিত্রটিকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে।[৩] কিন্তু সমাজতন্ত্রের অলীক-স্বপ্নভঙ্গের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দেশে দেশে ইসলামের পুনরুত্থানের প্রসঙ্গটিকে আড়াল করে পুঁজিবাদী শোষণ চালানোর জন্য যে একটি তথাকথিত আদর্শিক মুখোশের প্রয়োজন ছিল, তা 'বিশ্বায়ন'-এর প্রবক্তারা সে সময় বুঝতেও দেননি। আজকেও 'বিশ্বায়ন' নামক রহস্যময় তত্ত্বকথায় সহজে ধরা যায় না সাম্রাজ্যবাদের পুরোনো খেলা। তবে গভীর অভিনিবেশের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হলে খ্রিস্ট-ইহুদি নেতৃত্বাধীন ইঙ্গ-মার্কিন পুজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী চক্রের চক্রান্ত উন্মোচিত করা কঠিন নয়। একবিংশ শতাব্দীর এহেন এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার নানা অন্ধি-সন্ধি, যা 'বিশ্বায়ন' নামের মোড়কে চালানো হচ্ছে, তা ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনুধাবন করা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী দেশের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বিশেষ করে, দেশপ্রেমিক-চিন্তাশীল প্রজন্মের আত্ম-পরিচয় ও সার্বভৌম ভবিষ্যতকে নিরাপদ রাখার স্বার্থে 'বিশ্বায়ন' নামক অক্টোপাশের শতমুখী আক্রমণের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়ার নানা দিক, মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইসলাম ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা। এ সংক্রান্ত আলো

চনই প্রাধান্য পেয়েছে প্রবন্ধে। প্রবন্ধের উদ্দেশ্যকে প্রতিপন্ন করতে আলোচনা নিম্নের ধারাক্রম অনুযায়ী অগ্রসর হয়েছে :

- 'বিশ্বায়ন'-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- বিশ্বায়ন-এর নানা দিক
- বিশ্বায়নঃ সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গাবলী
- ইসলামের প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন
- বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জঃ বাংলাদেশের বাস্তবতা
- উপসংহার

২. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৮৯৪ সালে জোসিয়া স্ট্রং নামক জনৈক মার্কিন লেখক দ্য নিউ এরা অব দ্য কামিং কিংডম নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন:[৪]

"শীঘ্রই একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সে রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অ্যাংলো-স্যাক্সনরাই যোগ্যতম জনগোষ্ঠী; আর এ কাজে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে হবে আমেরিকানদেরই।"

এর প্রায় শতবর্ষ পরে, পশ্চিমা একাধিপত্যকে জাহির করে আরেক মার্কিন গবেষক পিটার এফ. ড্রানকার তার পোস্ট ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি শীর্ষক গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষাতেই জানান:[৫]

"The future may be 'Post-Western'; it may be 'Anti-Western'. It cannot be 'Non-Western."

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ১৯৯১ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে বলেন:

"এখন আমরা নতুন একটি বিশ্বকে দেখতে পাচ্ছি, এমন একটি বিশ্ব-যেখানে একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার প্রকৃত সম্ভাবনা উজ্জ্বল। উইনস্টন চার্চিলের ভাষায় এমন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা-যেখানে ন্যায় বিচার ও অবাধে চলাফেরার, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষার নীতিসমূহ বর্তমান। এমন একটি বিশ্ব যেখানে স্নায়ুযুদ্ধের রাহুমুক্ত জাতিসংঘ তার প্রতিষ্ঠাতাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি স্ফুরণে সক্ষম। এমন একটি বিশ্ব, যেখানে সব দেশ সকলের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।"[৬]

বলা বাহুল্য, কথাগুলোর ভালো দিকগুলো বাস্তব কার্যক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংঙ্গতিবিহীন ছিল এবং কিছু দিনের মধ্যেই পৃথিবী প্রত্যক্ষ করে পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন এককেন্দ্রিক বিশ্ব

www.pathagar.com

ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী-আগ্রাসী তৎপরতায়। এই এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থাকে কেউ কেউ বলছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'আধিপত্যের কেন্দ্রিককরণ'[৭]।

শুধু রাজনীতিবিদ বা পণ্ডিতগণই নন, এখনও বিপুল সংখ্যক পশ্চিমা নাগরিক পর্যন্ত মনে করেন যে, তারাই সমগ্র বিশ্বের অভিভাবকরূপে ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে, তারাই বিশ্বের পরিত্রাতা, এবং এটা পূর্ব-নির্ধারিত। এ মানসিকতার জন্যই তারা পৃথিবীকে ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বাধীন একটি মাত্র ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত রাখার চেষ্টা করে, যার নাম এখন বলা হচ্ছে 'এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা' এর এরই ধারাবাহিকতা ও প্রতিফলরূপে বিকাশ লাভ করেছে এক বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গত আমাদেরকে আরেকটি অন্তঃস্রোত বা under current মাথায় রাখতে হবে, আর তা হলো 'মার্কিন মৌলবাদ' ইস্যু। বিখ্যাত ধর্মনিরপেক্ষবাদী পণ্ডিত অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ভাষায়:[৮]

"মার্কিন মৌলবাদের ইতিহাস বেশ পুরানো। মার্কিন সংস্কৃতি থেকেই এর উদ্ভব। এর সঙ্গে সম্প্রসারণবাদ, আধিপত্যবাদ ও শ্রেষ্ঠত্ববাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরাই অভ্রান্ত, আমরাই নেতৃত্বদানের যোগ্য, আমরাই ঈশ্বরের নিজস্ব নির্বাচিত ব্যক্তি--মার্কিন রাজনৈতিক চিন্তায় এসব বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল; যা খ্রিস্টীয় মৌলবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের বিষয়টিকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়। এখনো বিপুল সংখ্যক মার্কিন সাধারণ নাগরিক এবং সে দেশের সামরিক প্রভুরা তো অবশ্যই, মনে করেন যে মার্কিনরাই সমগ্র বিশ্বের অভিভাবকরূপে ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছেন; তারাই বিশ্বের পরিত্রাতা, এবং এটা পূর্ব নির্ধারিত। এটাই মার্কিন মৌলবাদ এবং এভাবেই তাদের মৌলবাদী মানসিকতায় নিজের ছাঁচে মার্কিনরা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত ও ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করে।"

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ক্রুসেড বা নবজাগরণের মাধ্যমে নব-ইউরোপের উত্থান এবং সারা দুনিয়ার খ্রিস্টানদের 'সিটি অব গড' প্রতিষ্ঠার কথা সকলের জানা বলে এখানে আলোকপাত করা হলো না। এটাও আমাদের জানা যে, নবজাগরণ বা রেঁনেসাস ও রিফর্মেশনের নামে ইউরোপের জাতিগুলো ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপিয় ভাষায়, শিল্পকলায়, ভাস্কর্যে, চিন্তা কাঠামোয়, মতাদর্শ বিনির্মাণে কি প্রবলতরভাবে খৃস্টবাদকে আত্মস্থ, প্রকাশিত ও বিকশিত করেছে। বলা সঙ্গত যে, খৃস্ট ও ইহুদিরা পবিত্র ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর থেকেই কখনও এককভাবে কিংবা কখনও যৌথভাবে অথবা অন্যান্য তাগুতি শক্তিকে সঙ্গী করে ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপর রয়েছে। এ দীর্ঘ সামগ্রিক আগ্রাসনের ধারাবাহিকতায় তাজা উদাহরণ হিসাবে বিগত অর্ধ-সহস্র বছরের উপনিবেশিকতাবাদের ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করে। সে সময় পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য তারা 'হোয়াটম্যান্স বার্ডেন' তত্ত্বটি আবিষ্কার করে । এ তত্ত্বে জোরেই তারা পৃথিবীর দেশে-দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে অকাতরে শাসন-শোষণ চালিয়েছে; স্থানীয়-দেশজ ধর্ম-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ-প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ইসলামিক দুনিয়ার সব কিছু ভেঙ্গে দিয়ে নিজেদের ইসলামবিরোধী কাঠামোতে সাজিয়ে

www.pathagar.com

ফেলেছে। এবং খৃস্ট-ইহুদি মতবাদপুষ্ট পশ্চিমা ব্যবস্থাকে সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর আধুনিকতা ও উন্নতির নামে চাপিয়ে দিয়ে বলেছে যে, সব কিছু করা হয়েছে তোমাদের ভালোর জন্য! এটা আমরা সাদা মানুষের দায়! শোষণ নয়, আমরা মহৎ দায়িত্ব পালন করছি মাত্র![৯]

উপনিবেশিকতার ভয়ঙ্কর নেতিবাচক প্রভাব আজও উপনিবেশিকতাত্তোর দেশগুলোতে সংঘাত, বিভাজন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হানাহানি, দুর্নীতি, বিভাজনের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আফ্রিকান এক নেতার উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্যঃ "সাদা চামড়ার মানুষেরা ভালো ভালো কথা বলে আমাদের হাতে বাইবেল ধরিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকার ব্যবস্থা করলো। আমরা যখন চোখ খুঁলি, তখন দেখতে পাই আমরা পরাধীন আর আমাদের জমিগুলো তাদের দখলে।"[১০]

পশ্চিমা শক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় উপনিবেশবাদের আপাত উচ্ছেদ হলেও পৃথিবী সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ নামের দুই পশ্চিমা রাক্ষসের থাবার নিচে বন্দি হয়ে যায় প্রায় সত্তর বছরের জন্য। সমাজতন্ত্রের পতনের (১৯৯০) পর পৃথিবীকে দখল ও কর্তৃক করার প্রশ্নটি যখন আবার সামনে এসে গেল তখন সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে পুঁজিবাদ সর্বগ্রাসীরূপে আবির্ভূত হলো। বলা হলো, গণতন্ত্র আর মানবাধিকার নিশ্চিত করবে উদারতন্ত্রী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সামুয়েল পিটার হান্টিংটন, যিনি পুঁজিবাদী তাত্ত্বিক হিসাবে সমাজতন্ত্রের অগ্রগমনকে হটাতে নানা তত্ত্ব হাজির করতেন এবং পাকিস্থানসহ বেশ কিছু দেশে অগণতান্ত্রিক সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র ও সামরিক বাহিনী ও তাদের জংলী-ফৌজি শাসনের পক্ষে ওকালতি করতেন, বললেন, পৃথিবীতে এখন গণতন্ত্রের 'থার্ড ওয়েভ' চলছে এবং এটা চলতে থাকবে সভ্যতার মধ্যে সংঘাতের পথে। তার মতে, যেহেতু কোন মতাদর্শ আর পৃথিবীতে নেই তাই বিভিন্ন সভ্যতা যেমন, খ্রিস্টবাদ, ইসলাম, হিন্দুবাদ ইত্যাদির মধ্যে লড়াই হবে। তিনি এবং তার বন্ধুরা ইসলামকেই একমাত্র শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করলেন, যে শক্তি বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা পুঁজিবাদ-খৃস্টবাদকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য রাখে। এ পক্ষের আরেক তাত্ত্বিক ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে বললেন, 'সমাজতন্ত্রের পতনের পর 'ইতিহাসের সমাপ্তি' (The End of the History) ঘটেছে। এখন পশ্চিমা ইতিহাস গতির সামনে দাঁড়ানোর আর কেউ নেই।' পশ্চিমা পণ্ডিতদের মতামত আসলে বিশ্বব্যাপী তাদের আগ্রাসনকে সফলভাবে সূচিত করার সুপ্ত আকাংখারই বহিঃপ্রকাশ এবং সে আকাংখাকে বাস্তবায়নে তত্ত্বগত শক্তি যোগানোর তাগিদ থেকে উদ্ভূত।[১১]

উপরিউক্ত তাত্ত্বিক আলাপ-আলোচনা ও ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে গত শতাব্দীর শেষে এবং বর্তমান শতাব্দীর সূচনা থেকেই 'বিশ্বায়ন'-এর আবির্ভাব। অতএব, বিগত ইতিহাসের গতি, যা সর্বদা পৃথিবীর দরিদ্র মানুষ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তা মাথায় রেখে 'বিশ্বায়ন'কে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা জরুরি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবেচনায় 'বিশ্বায়ন'-এর কুফলের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। ইসলামী বিশ্বও 'বিশ্বায়ন'-এর বিকল্পের

www.pathagar.com

সন্ধানে ব্যস্ত। ফলে এহেন স্রোতধারাসমূহকে পর্যালোচনার মাধ্যমে ক্রম-বিকাশমান 'বিশ্বায়ন' তত্ত্ব বা প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবেশ করা দরকার।[১২]

বিশেষভাবে বাংলাদেশে আমাদের জন্য এটাও বিবেচনায় রাখা জরুরি যে, অবিভক্ত ভারতবর্ষ, মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ, মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ককেন্দ্রিক ওসমানিয়া সালতানাৎ, আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহসহ তাবৎ ইসলামী দুনিয়ার এবং অনুন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রে বিগত দিনে উপনিবেশবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের নামে ভয়াবহ লুণ্ঠন, অনুন্নয় অবক্ষয় ও অসততার ক্ষত চিহ্ন রেখে গেছে এবং এখনও গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের নামে নানা আঘাতের রক্তাক্ত চিহ্ন রেখে চলেছে। ফলে এখন যে 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়া পশ্চিমা ঐতিহাসিকতার ধারাবাহিকতায় এসে উপস্থিত হয়েছে, তার চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে ইতিহাসের নিরিখে এবং আন্তর্জাতিক ঘটমানতার প্রেক্ষিতে; এবং অবশ্যই ইসলাম ও বাংলাদেশের বাস্তবতাকে সামনে রেখে। কারণ যারা আমাদের বিরুদ্ধে তেড়ে আসছে, তাদের আদর্শিকভাবে প্রতিহত করার প্রেরণা আমরা পাব শান্তি ও কল্যাণের চাবি-কাঠি ইসলাম থেকে আর কর্মক্ষেত্র প্রিয় স্বদেশ-জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় সুমৃত্তিকায়। কারণ 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়া নিয়ে যে ইঙ্গ-মার্কিন পশ্চিমা অক্ষশক্তি আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, তাদের বিশ্বাস আর বক্তব্য হলো:[১৩]

"The EU (European Union) is the biggest aid provider in the world and sees it as on investment built on enlightened self-interest. The US, on the other hand, believes in raw military power in pursuing its national interest and in doing so, it asserts that it need not be subject to international law. That means power beats principles every time. It illustrates a tendency to dismiss, rather than discuss, and deride rather than debate and that views, opposed to US foreign policy based on muscular power."

৩. বিশ্বায়নঃ বিভিন্ন দিক

'বিশ্বায়ন' শব্দটি/প্রত্যয়টি/প্রক্রিয়াটি আমাদের ব্যবহারে অতি সম্প্রতি এসে যুক্ত হয়েছে। এটা কোন দেশী শব্দ বা প্রত্যয় বা প্রক্রিয়া নয়। ইংরেজি Globalization শব্দের বঙ্গানুবাদ হিসাবে এই 'বিশ্বায়ন' শব্দটি/প্রত্যয়টি/প্রক্রিয়াটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য 'বিশ্বায়ন' শব্দটি/প্রত্যয়টি/প্রক্রিয়াটির বদলে 'গোলাকায়ন' শব্দ/প্রত্যয়/প্রক্রিয়া চর্চা করে থাকেন।

'বিশ্বায়ন'- শব্দ, প্রত্যয়, প্রক্রিয়া বা মতাদর্শ যে আঙ্গিকেই হোক না কেন, সর্বপ্রথম আমাদের গোচরীভূত হয় পশ্চিমা দাতা সংস্থা ও দেশসমূহ এবং পশ্চিমা পণ্ডিত ও প্রচার মাধ্যমের দ্বারা। পরে এ দেশীয় পশ্চিমাঘেঁষা পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদর্শের অনুসারী বুদ্ধিজীবী মহল, যার মধ্যে সাবেক আমলা, সম্পাদক, এনজিও নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কনসালটেন্ট, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পবোদ্ধা,

www.pathagar.com

অবসরপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদসহ সমাজের উপর কাঠামোর কিছু লোক রয়েছেন এবং যাদেরকে হাল আমলে তারস্বরে সিভিল সোসাইটি নামে তুলে ধরা হচ্ছে, তারা ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার ও চর্চা শুরু করেন।

'বিশ্বায়ন' এতটাই নতুন যে, অনেক অভিধানেও সেটা আসে নি এবং এখনও সর্বসাধারণের বোধগম্যতা ও ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি।। এর কারণ:

- শব্দটি বিদেশী, নতুন ও আরোপিত;
- এদেশের সংস্কৃতি ও অভ্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং
- এর অর্থ বা ভাবাদর্শ অপরিষ্কার, দুরভিসন্ধিমূলক ও চাতুরীপূর্ণ।

ফলে 'বিশ্বায়ন' শব্দটির অর্থগত-ভাবগত-তাৎপর্যগত-প্রেক্ষিতগত নানা দিক বিস্তারিত পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের দাবি রাখে। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীর দ্রুতলয় ও পালাবদলের পৃথিবীতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অস্তিত্ব ও বিকাশ বিভিন্নভাবে ব্যাহত ও বিপদগ্রস্ত হচ্ছে এবং আক্রমণ ও বিপদের মধ্যে পড়ছে গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস। বিশেষ করে ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বাধীন পুঁজিবাদী ও খ্রিস্টবাদী পশ্চিমা জগৎ বিশ্বের যে কোন স্থানে ইসলামে উত্থান ও প্রতিষ্ঠাকে চরম শক্তি প্রয়োগ বা এক তরফা কূটনৈতিক স্বেচ্ছাচারের মাধ্যমে প্রতিহত করছে। ইরাকসহ মুসলিম বিশ্ব এমনই পশ্চিমা আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

অতএব বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রচারিত বিশ্বায়নের মতো একটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ মতবাদ বা প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট পরিমাণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে এবং আমাদের বাস্তবতায় এর উপযোগিতাকে মূল্যায়ন বা পরিমার্জন না করে অন্ধভাবে ব্যবহার বা অনুসরণ করা হবে নিছক বিপদজনক একটি কাজ। তাই 'বিশ্বায়ন' প্রসঙ্গে যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও বিতর্ক হওয়া দরকার। এ লক্ষেই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 'বিশ্বায়ন' শব্দটির অর্থ, সংজ্ঞা, ভাবাদর্শ, উদ্দেশ্য, বিকাশ ও তাৎপর্যসহ সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা করা জরুরি মনে করি। এছাড়াও আমরা এ প্রবন্ধে 'বিশ্বায়ন'-এর মধ্যে নিহিত অর্থনৈতিক-আগ্রাসনমূলক আন্তর্জাতিকতাবাদকে ইসলামের সার্বজনীন-আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করাও প্রয়োজন মনে করি। একই সঙ্গে পশ্চিমা শোষণ-ঐতিহ্যের হাতিয়ার উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বা নব্য-সাম্রাজ্যবাদের ধারাবাহিকতায় 'বিশ্বায়ন'-এর অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যকে যাচাই-বাছাই- মূল্যায়ন ও পরীক্ষা করারও অবকাশ রয়েছে বলে বিশ্বাস করি। এবং সর্বশেষ আমরা বাংলাদেশের প্রসঙ্গে 'বিশ্বায়ন' ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর উপর আলোকপাতের মাধ্যমে উপসংহারে উপনীত হতে আগ্রহ পোষণ করি।

প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে কয়েকটি শিরোনামের অধীনে উপরিউক্ত ইস্যুগুলোকে আলোচনায় নিয়ে আসা হবে।

৪. বিশ্বায়ন : সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গাবলী

প্রথমে একটি নতুন ধরনের শব্দ বলে মনে হলেও পরে অনুধাবন করা যায় যে, এটি একটি পশ্চিমা মতবাদ বা মতাদর্শ বা প্রক্রিয়া। Encyclopædia Britannica-এর

www.pathagar.com

ভাষায়: Globalization is a phenomenon involving the integration of economies, cultures, governmental policies, and political movements around the world. অর্থাৎ, 'বিশ্বায়ন' হলো এমন একটি প্রপঞ্চ যা লিপ্ত রয়েছে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সরকারের নীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহকে একাত্ম করার কাজে।[১৪]

মাত্র কয়েক বছর আগে, ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে পশ্চিমা পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকদের বরাত দিয়ে 'বিশ্বায়ন' শব্দটি সর্বপ্রথম উল্লেখিত হয়। তখন বলা হয় অর্থনীতি, যোগাযোগ--এমন কি, রাজনীতি ও সামরিক বিষয়াবলীর বিশ্বায়নের কথা (...globalization of the economy, communications- even politics and military affairs...)।[১৫]

তারপর থেকে এ প্রসঙ্গের পক্ষে ও বিপক্ষে তৎপরতা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সিয়াটল বা কানকুন সম্মেলনেও বিশ্বায়নপন্থী পশ্চিমা পুঁজিবাদী বিশ্ব ও তাদের অনুসারী দেশগুলো প্রবল জনবিক্ষোভের সম্মুখীন হন এবং এখনও হচ্ছেন।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লিউটিও) বা আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (আইএমএফ), প্রথমত ও প্রধানত তাদের ভাষায় 'বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যস্ত দুর্বল অর্থনীতিকে' ঋণ দেওয়ার বিশ্বব্যাপী নীতিকে 'বিশ্বায়ন' নামে জাহির করে। সে সময়, অর্থাৎ '৯০-এর দশকে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিমা জগত বিশ্বে সামাজিক উন্নয়ন, উত্তর-দক্ষিণ বৈষম্য হ্রাসসহ অনেকগুলো আপাত সুন্দর ও শ্রুতিমধুর বিষয় প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, সে সময়ই হান্টিংটন, ফুকোয়ামা প্রমুখ তাত্ত্বিক এ দর্শনও হাজির করেন যে, সমাজতন্ত্রের পতনের পর ভবিষ্যতে পশ্চিমা জগতের সঙ্গে ইসলামের লড়াই হবে। বস্তুত এ ধরনের একটি জটিল, পরিবর্তমান, সংকুল পরিস্থিতিতে 'বিশ্বায়ন'-এর উদ্ভব ঘটে।[১৬]

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি এগিয়েছে একটি কর্মধারার মধ্য দিয়ে। বিগত বিংশ শতাব্দীর নব্বুই দশকে শুরু হয়েছিল 'বিশ্ব বাণিজ্য সংলাপ'। উরুগুয়ে রাউন্ডে সে সংলাপের সমাপ্তি টানা হয়। আর সৃষ্টি হয় ওয়াল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বা ডব্লিউটিও। এ সংস্থার মাধ্যধমেই বিশ্বায়ন প্রাতিষ্ঠানিকরূপ পায়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন-এর ব্যানারে বিশ্ব বাণিজ্য নীতি প্রণয়নের কাজে বিশ্বের সকল দেশকে একমত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ জন্য প্রতিয়িত ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য ফোরাম সংলাপ, আলোচনা, ওয়ার্কসপ, গবেষণা করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বড়ো দু'টি সম্মেলন হয়েছে সিয়াটল ও কানকুনে, যাতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীগণ অংশ নেন। সেসব সম্মেলন ভোক্তা বা কনজুমার্স, শ্রমিক, নাগরিক, পেশাজীবী সংগঠনের তীব্র, আক্রমণাত্মক ও রক্তাক্ত বিরোধের মুখে পড়ে। বিরোধিরা মনে করেন:[১৭]

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কেবল বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একটি অনিরপেক্ষ আদালত, কারণ স্থানীয় আইন আন্তর্জাতিক আইনে কোন বাধা সৃষ্টি করলে সে বিবাদ মীমাংসার জন্য তিন আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

আমলাকে নিয়ে বিচারকদের যে প্যানেল রয়েছে তা নিয়োগকর্তার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা শ্রম আইন ও মানবাধিকার পদদলিত করছে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা পরিবেশ ধ্বংস করছে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মানুষ হত্য করছে।
- যুক্তরাষ্ট্র অগণতান্ত্রিকভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে অনুমোদন দিয়েছে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্থানীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বৈষম্য বৃদ্ধি করছে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা জাতীয় স্বাধীনতাকে খর্ব করছে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও এর বিশ্বায়নের ধারণার সঙ্গে মানবতাবাদীদের সম্পর্ক নেই, আছে অবাধ পুঁজি সঞ্চালন করে মুনাফা অর্জনের নগ্ন প্রচেষ্টা।

এগুলো হলো বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক সমালোচনা।

অন্যদিকে কিছুদিন পর দেখা গেলো, পরিবেশগত সমস্যার পশ্চিমা সমাধান হিসাবে যে বৈশ্বিকতাবাদ বা Globalism হাজির করা হলো, লক্ষ্য করে বুঝা গেলো সেটাই দক্ষিণের দেশগুলোর বাস্তুসংস্থান সমস্যার দাওয়াই হয়ে উঠেছে। বেড়ে গেছে অভিবাসন ও শ্রমের অবাধ যাতায়াত। উন্নত উত্তর বিশ্ব এভাবেই মজুরের সংস্থান করতে সচেষ্ট হচ্ছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিকতাবাদের আদলে বৈশ্বিকতাবাদের যে উত্থান, সেটাই এ পরিবেশগত সমস্যারও শুরু করে। ইউরোপ যখন দুনিয়ার ৮৫% ভাগেই উপনিবেশ স্থাপন করে তখন থেকেই তারা এ দুনিয়ার সম্পদের ওপর একছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। দাস ব্যবস্থা এবং নানা ধরনের সম্পদ ও চিরায়ত জ্ঞান লুণ্ঠন চলে। কাঁচামালের ফিনিস গুডস তখন তারা বিক্রি করতো আর এখন তারা সকল লোকায়ত জ্ঞান ও সম্পদকে আত্মসাৎ করে সেগুলোকেই আবার প্যাটেন্ট আকারে দক্ষিণের দেশগুলোতে বিক্রি করছে। বিশেষ করে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে উত্তর তথা ইউরোপ-আমেরিকার এ একাধিপত্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের সার্বিক নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে চরম নির্ভরশীলতার সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক দাপট আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, একদা পশ্চিমা বণিকের মানদণ্ডই ক্ষমতার রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল উপনিবেশ স্থাপন ও সম্প্রসারণের প্রাক্কালে।[১৮]

সামগ্রিক বিবেচনায় বিশ্বায়নকে বলা হচ্ছে সর্বগ্রাসী, যা বিশ্বের দেশে-দেশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-জীবনযাপন-দর্শনসহ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। এমন কি, এককেন্দ্রিক বিশ্বের হোতা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণা ও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেযুক্ত বৈশ্বিক সামরিক নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। পারমাণবিক নিবারণ এবং সামরিক জোট ভিত্তিক, যেমন ন্যাটো, ওয়ারশ ইত্যাদি ভিত্তিক নিরাপত্তা ধারণার গুরুত্ব অপসারিত হয়েছে বহুলাংশে। এবং সে সঙ্গে বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের রূপ ও চরিত্র। এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে লাগসই সামরিক ও বিদেশ নীতি প্রণযন করছে যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নীতি ও স্বার্থের চারিত্র্য বদল প্রভাবিত করেছে বিশ্ব রাজনীতি ও শক্তির ভারসাম্যের বিন্যাস। যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুযুদ্ধোত্তর সামরিক নীতিতে শত্রুমিত্রের নয়া ধারণা, জাতীয় স্বার্থের ব্যাখ্যা ও তার ভিত্তিতে নির্ধারিত বিভিন্ন অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব নিশ্চিতভাবেই সে সব অঞ্চলে এবং সে সঙ্গে তাবৎ বিশ্বের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট করছে।[১৯]

পাশাপাশি বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীব্যাপী সম্পদ, যোগাযোগ, প্রযুক্তি, তথ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটতে শুরু করেছে, যা ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি সর্বক্ষেত্রে এমনই সব সুযোগ তৈরি করছে যে, অনগ্রসর দেশের উদ্যমী মানুষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করলে মাথাপিছু আয় বাড়াতে সক্ষম। ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের, যোগাযোগের কল-কব্জাটি পশ্চিমা শক্তির কব্জায় থাকলেও অংশ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আম-জনতার মধ্যে। বিশ্বায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতি ও সুযোগগুলোর মধ্যে তুলনামূলক অংক কষে লাভ-ক্ষতির খতিয়ান তৈরি করা দরিদ্র ও নির্ভরশীল দেশগুলোর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। এটা বিবেচনা করাও জরুরি যে, আপাত কোন লাভ আখেরে কি কি লোকসান আনছে![২০]

যদিও চলমান বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত এবং সে সব লাভ-ক্ষতির দেশভিত্তিক বা আন্তর্জাতিক কোন প্রোফাইল এখনও প্রস্তুত করা হয় নি আর বাংলাদেশ তো এ কাজে কোন ভয়ানক অপ্রস্তুত, তথাপিও বিশ্বায়নের বেশ কিছু নেতিবাচক বিষয় সামনে চলে এসেছে। যেমনঃ বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও অর্থনীতিতে 'ডিজলোকেশন' হচ্ছে। পুরনো বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনের এ পাগলা হাওয়াকে যে দেশ চিহ্নিত করতে ও সামলাতে ব্যর্থ হবে, সে দেশকে পাগলা হাওয়া কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। এমন কি, প্রস্তুতিহীন দরিদ্র দেশগুলোর মানুষ, সমাজ, প্রতিষ্ঠান বিশ্বায়নের অকস্মাৎ ও ক্রমবর্ধিষ্ণু গতিবেগের সামনে উদ্ভ্রান্তির চাপে পড়ছে, তা সামলানোর মধ্যে মানবিক, প্রাতিষ্ঠানিক, আইনগত ও সামাজিক সংহতিও অনেক দেশে অনুপস্থিত। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বা এর সঙ্গে কার্যকরী ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার উপযুক্ত সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক বেষ্টনী, স্বশাসন ও ভরসা আনতে পারেন নীতিপ্রণেতা ও রাজনীতিবিদগণ। ব্যক্তি ও সরকার উভয়েই বিশ্বায়নের চাপ মুকাবেলার মতো উপযুক্ত নৈতিক ক্ষমতা না দেখাতে পারলে হতাশাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। বরং উন্নয়নশীল দেশের হঠাৎ উৎফুল্ল হওয়ার পরবর্তীতে ন্যূজ ও হতাশাময় বিষণ্ণতার ছাপ দেখা যাচ্ছে বিশ্বায়নের অভিঘাতে; এবং স্বকীয় অক্ষমতার জন্য কোন প্রতিরোধী ব্যবস্থা বা বিকল্প বা লাগসই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারছে না।[২১]

যেহেতু মুক্তবাজার অর্থনীতিরই বিকশিত রূপ হলো 'বিশ্বায়ন' সেহেতু একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে বিশ্বায়ন লাগামহীন ও বিকল্পহীন ব্যবস্থা হিসাবে সর্বগ্রাসীভাবে দাপট দেখিয়ে যাবে--যতক্ষণ না বাজার অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে বা কোন কার্যকর বিকল্পের উদ্ভব হচ্ছে।এ ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের সাপেক্ষে প্রস্তুতির প্রথম কর্তব্য হতে পারে,

www.pathagar.com

বিশ্বায়নের প্রাথমিক প্রক্রিয়াজনীত সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার সমস্যা সামলানো, যাতে ব্যক্তির ও সমাজের প্রতি সবচেয়ে বড়ো সার্পোর্ট দিতে হবে রাষ্ট্রকে। তাছাড়া মুক্ত বাজার অর্থনীতির ইতিবাচক ধাপগুলো, যেমনঃ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, কম দামে পণ্য ভোগ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি পেতে হলে বাজার অর্থনীতিকে আরও সমাজনৈতিক করতে হবে; অর্থাৎ ভোগ ও তৃপ্তির মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। উদ্বাহু ভোগের ও উপযোগিতার কুফল, যা বর্তমানে পশ্চিমারা ভোগ করছে, সে সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ভোগ ও অতি উপযোগিতার একটি স্রোত বহুজাতিক কোম্পানি, গণমাধ্যম ও তাদের বিজ্ঞাপনী সংস্থার এজেন্টদের মাধ্যমে বাংলাদেশের দেশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা এখন দিক-ভ্রান্তের মতো অনুৎপাদনশীল কাজে লিপ্ত হচ্ছে। পোশাক, ফ্যাশন শো, শো বিজ, প্রদর্শনী, ক্যারিয়ার প্যাটার্নে একটি অন্ধ পশ্চিমা অনুকরণ দেখা যাচ্ছে। খাদ্যাভাসেও এসে গেছে পশ্চিমা ড্রিংস্ ও ফাস্ট ফুডের দাপট। এমন কি, বহুজাতীয় অর্থায়নে পত্র-পত্রিকাগুলো যে সকল বিষয় চর্চা করছে, তা জাতির আশা-আকাংখার বদলে পশ্চিমের আদল এনে দিচ্ছে আমাদের চিন্তা-দর্শন-জীবনযাপনে। পত্রিকাগুলোর বিশেষ সংখ্যার বিষয়সূচি ও অলংকরণ দেখলে এবং তাদের প্রাত্যহিক পরিবেশনাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হবে না যে এসব বাংলাদেশ নামক একটি মুসলিম দেশে হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলোরও একই অবস্থা। বহুজাতিক বিজ্ঞাপন ও তাদের বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো, যাতে আছে এমন কিছু ব্যক্তি যারা আসলে বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসে ও আচরণে অভ্যস্ত একদল ব্যবসায়ী কাম রাজনীতিবিদ কাম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাম বুদ্ধিজীবি কাম অধুনা সিভিল সোসাইটি! টিভিতে কাদের কি কি ও কত টাকার বিজ্ঞাপন প্রচার হয় তার হিসার নিলে কারা আন্তর্জাতিক পুঁজির বেনিফিসারি, তা বেড়িয়ে আসবে। বলা বাহুল্য, বিশ্বায়নকামী বহুজাতিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এদেরকে কি উদ্দেশ্যে শক্তি ও অর্থ যোগাচ্ছে এবং জাতীয়ভাবে প্রজেক্ট করছে তাও খতিয়ে দেখা দরকার। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। আমরা যদি বিগত তত্ত্বধায়ক সরকারগুলোর উপদেষ্টাদের আর্থ-সামাজিক-পেশা-বৃত্তি-বিশ্বাসগত দিকগুলোকে বিবেচনায় আনি, তাহলে দেখা যাবে যে, এমন অনেক সদস্য ছিলেন যাদের দেশে ও জনগণের মধ্যে কোন কন্সটিটিউন্সি নেই, আছে বহুজাতীয় ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিজ্ঞতা আর পশ্চিমা শক্তির সমর্থন। এদের হাতে কাদের স্বার্থ নিরাপদ হবে তা ভেবে দেখা দরকার।

অন্যদিকে আসে এনজিওগুলোর কথা। তারা রাজনীতি-নিরপেক্ষভাবে শুধু উন্নয়নের কাজ করার অঙ্গীকার করেও সরাসরি কাজ নীতিতে জড়িত হচ্ছে। অনেক সময়ই তারা সরকার ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। ফতোয়া, যা একান্তই ধর্মীয় বিষয়, তা নিয়ে তারা দেশের আলেম সমাজের সঙ্গে রক্তাক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে। তারা দেশে বিদ্যমান আইন ও নীতিতে তাদের পক্ষে নিয়ে আসতে সদা তৎপর। আর এক্ষেত্রে তারা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার শান্তিপূর্ণ পথ পরিহার করে শক্তি প্রদর্শনের পন্থাই বেছে নিচ্ছে। দেশের সামাজিক,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নীতি প্রণয়নে তাদের এজেন্ডা, সুপারিশ, প্রস্তাব ও আকাংখা নিরূপিত হচ্ছে পশ্চিমা-ভোগবাদী দাতাদের উদারতন্ত্রী আদর্শে, যা অনেকাংশে দেশের বিদ্যমান সংস্কৃতি ও ইসলামের বিপরীত। এক্ষেত্রে তারা তাদের ও দাতাদের পছন্দের সিভিল সোসাইটির মতামতকে নানা আলোচনা বা গোল টেবিল বা সংলাপের নামে ঘনীভূত করে জাতীয় ইস্যু হিসাবে গুরুত্ব পাইয়ে দিতে চেষ্টা করে; যদিও তাদের মতামতের পেছনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন থাকে না। পশ্চিমা দেশ ও দাতারাও এই শ্রেণীটির পক্ষে সরব।

বিশ্বায়নের আর্থ-রাজনৈতিক দিকগুলোকে পুষ্টি যোগানোর জন্য দেখা যাচ্ছে একটি অপারেশনাল ও প্রফেশনাল বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠী গড়ে তোলা হচ্ছে, যারা নানা পেশা ও বৃত্তিতে, এমন কি সরকারি-বিরোধী দলগুলোতে ঘাপটি মেরে থেকে পশ্চিমা ভোগবাদ ও মুনাফা-লোভী বাজার অর্থনীতি এবং এবং সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নীতি, আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রচার ও প্রসারে কাজ করছে। এবং তাদের তৎপরতাকে নানা পণ্ডিত তত্ত্ব ও মডেলের মাধ্যমে নিয়ে এসে আর এসবের পক্ষে বার বার বলতে বলতে একটি ডিসকোর্স তৈরি করে ফেলেছে, যা ক্রমে ক্রমে মানুষের বিশ্বাসের মর্ম মূলে গেঁথে যাচ্ছে। এ রকম কয়েকটি অতিকথা বা মিথকে আমরা ডিসকোর্স হিসাবে পাই।[২২] যেমন:

১. বিশেষ একটি দেশ না চাইলে এ দেশে ক্ষমতায় আসা বা থাকা যাবে না।

২. এ দেশে সরকারের মাধ্যমে কোন কাজই হয় না, কিছু করতে হলে করতে হবে এনজিওদের মাধ্যমে।

৩. টুপি-দাড়ি থাকলে আর নামাজ-রোজা-ধর্ম-কর্ম করলেই মৌলবাদী-ধর্মান্ধ-সাম্প্রদায়িক-পশ্চাৎপদ।

বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান এবং ক্রম অগ্রসরমান এসব মিথ্যা, মিথ ও ডিসকোর্স বদলানোর মতো বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হলে মানসিক দাসত্বের শৃংখল ভাঙা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে, সমাজের অবহেলিত দরিদ্র মানুষদের সামর্থ্য অর্জন ও অংশগ্রহণ ছাড়া যেহেতু মানব সম্পদ উন্নয়ন বাজার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, সেহেতু তাদের দিকে রাষ্ট্রকে অধিকতর মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রেও এনজিও আর দাতাদের কথা উল্লেখ করতে হয়। কারণ তাদের কথিত দারিদ্র্য বিমোচন নীতিতে সাধারণ মানুষ সুদ ও অন্যান্য শর্তের নিগড়ে বন্দি হচ্ছে। ফলে তাদের কিঞ্চিৎ বায়িং ক্যাপাসিটি বাড়লেও সামর্থ্য বলতে যে ব্যাপক ক্ষমতা বুঝায় তা বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

তাই রাষ্ট্র যেহেতু সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, সেহেতু প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নের সমস্যা দূর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র পথ দেখাবে, জনতাকে প্রণোদিত করবে, অচলায়তন ভাঙবে এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেবে সমগ্র জাতিকে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সৎ ও যোগ্য লোকের উপস্থিতি জরুরি। গোষ্ঠী, পরিবার বা অন্য কোন ক্ষুদ্রতার অনুসারীদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করারও জরুরি। শুধু চিন্ত-ভাবনাই নয়; বিদ্যমান হতাশাজনক ধারার বিরুদ্ধে গুণগত পরিবর্তন সূচিত করতে হবে। জনগণের

www.pathagar.com

সামনে আশাবাদী-আদর্শিক নেতৃত্বের মডেল হাজির করতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী দেশের জন্য একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় সমর্থ এবং উন্নয়ন-আকাংখী স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যোগ্যতাসম্পন্ন একদল প্রশিক্ষিত, সৎ, নিবেদিতপ্রাণ, নির্লোভদের খুঁজে বের করতে হবে; প্রয়োজনে এমন যোগ্যতাসম্পন্নদের তৈরি করতে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন সংক্রান্ত প্রস্তুতি বলতে রাষ্ট্রের আর মূলস্রোতের মানুষের প্রস্তুতিরই তাগিদ দেওয়া হচ্ছে।[২৩]

৫. ইসলামের প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের পরপরই ইসলামের উত্থানের সম্ভাবনা জাগিয়ে বহু কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে বলা হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে:[২৪]

"বর্তমান বিশ্বে ইসলামের পরিচ্ছন্ন প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ও কার্যকারিতা কোন দৈবযোগ নয়। এটা ঘটেছে পাশ্চত্য ও প্রাচ্য--উভয় মডেল ও তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার ঐতিহাসিক তৎপরতা থেকে। ইসলাম আদর্শগতভাবে সার্বভৌম। যখন অন্য সকল ভাবনাকল্প তাদের দূরপ্রান্তিক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে মানব জাতির ওপর কার্যকর প্রভাব স্থাপনে অসমর্থ এবং যখন একটি সমন্বয় বা মধ্যপন্থার দিকে সচেতন বা অবচেতনভাবে অগ্রসরমান, তখন ইসলাম এই স্বাভাবিক প্রেক্ষিতকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধারণ ও লালন করে। ইসলাম অতীতে যেমন প্রাচীন সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, তেমনই তাকে আজ আবার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--এই দুই চিন্তাশিবিরে বিভক্ত বিশ্বে সহজাত একক ভূমিকা বহন করার দায়িত্ব নিতে হবে।"

অথচ একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেদনার কথা হলো যে নানাভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন বা চিত্রিত করা হয়েছে। এ কাজটি একদিনে হয় নি, হয়েছে দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে-- ক্রুসেড, উপনিবেশিকতাবাদ এবং বর্তমানে বিশ্বায়নের ভেতর দিয়ে। ইসলামবিরোধী মিথ ও ডিসকোর্সকে ভাঙার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা আমরা দেখাতে পারিনি। এক্ষেত্রে আমাদের আলেম, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত সমাজ তথা কার কি ব্যর্থতা, সে মূল্যায়ন করতে হবে । এ প্রবন্ধে সে মূল্যায়নের অবকাশ নেই। তা আলাদাভাবে করা জরুরি। আমরা আমাদের ব্যর্থতার কারণে যে প্রতিফল ভোগ করছি তার দিকে নজর দিতে পারি। সাধারণভাবে প্রধান ফলাফলগুলো এ রকম :[২৫]

- মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে আত্ম-পরিচয়ের সংকট।
- বিভেদ ও বিভ্রান্তির সূচনা।
- ইতিহাস চেতনার লুপ্তি।
- সামাজিক শক্তি হিসাবে ইসলামের প্রান্তিকিকরণ।
- ইসলামের ব্যাপকভিত্তিক আন্তর্জাতিকতাবাদে ফাটল।

www.pathagar.com

- ইসলামের মৌল বিষয়ের মধ্যে ঐক্যমতের অভাব। `
- অসংখ্য অনৈসলামিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ। এবং
- সার্বিকভাবে দিক-নিদের্শনাহীনতার উদ্ভব।

উপরোক্ত সমস্যা এবং এরকম আরো অনেক সমস্যার উপস্থিতি আমরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এবং বিভিন্ন দেশে দেশে দেখতে পাই। বাংলাদেশের উদাহরণে যদি আসি, তাহলে দেখা যাবে যে, এখানে ইসলাম ও মুসলমানরা সবচেয়ে না-হক আচরণের শিকার হয়েছেন। এ দেশে ইসলামের নামে সবচেয়ে জঘণ্য কাজগুলো করেছে অসৎ রাজনীতিবিদগণ এবং ক্ষমতালোভী অগণতান্ত্রিক সামরিক-বেসামরিক আমলাগণ, যাদের জীবন-যাপন ও বিশ্বাস, উভয়টিই পশ্চিমা মূল্যবোধের অনুসারী এবং তারা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অনাগ্রহী। পাকিস্তানের উদ্ভব থেকে আজকের দিন পর্যন্ত উদাহরণ দিয়ে এ কথা প্রমাণ করা যাবে।

সে বিস্তারিত ঐতিহাসিক পর্যালোচনাতেও আমরা যাচ্ছি না। আমরা শুধু এ কথাই বলতে পারি যে, প্রকৃত ইসলামি আদর্শের শক্তিকে কাজ করার সুযোগ না দিয়ে, কেবল সংবিধানের মাত্র দু'টি লাইনকে প্রাধান্য দিয়ে, ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার অপচেষ্টাকে যথার্থ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ভাঙতে হবে। সংবিধানের ভাষ্যে 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' আর 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস'-এ দু'টি লিখিত বাক্য ছাড়া বাকি সকল আইন-কানুন, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিধানসহ সামগ্রিক কাজ-কর্ম যে দেশে ইসলামবিরোধী বা পশ্চিমের আদলে হয়, সে দেশে ইসলামী বিধি-বিধানকে ঠেকাতে এবং ইসলামকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরতে বিশ্বায়নের পশ্চিমা মতাদর্শবাহী সিভিল সমাজের এতো গবেষণা, আন্দোলন, সংলাপ, গোল টেবিল, প্রকাশনা কেন, তা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। দরকার ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য ও তত্ত্বগতভাবে যেসব মিথ্যা আরোপ ও বিভ্রান্তি চাপানো হয়েছে, সেগুলোকে অপনোদন করা। এ কাজ সফলভাবে করা না হলে ইসলামের মূল ভিত্তিটিই মিথ্যাচারের স্তুপের নিচে চাপা পড়বে।

বাংলাদেশে এ কাজ কতটুকু করা হচ্ছে, কোন পরিকল্পনা এক্ষেত্রে আছে কি না তা আমাদের ভাবতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী পণ্ডিতরা ইতোমধ্যেই বিশ্বায়নের ফলে ইসলামের লাভ-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কাজ শুরু করেছেন স্বল্প আকারে হলেও। আমাদেরও বসে থাকলে চলবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবায়িত জীবন ব্যবস্থা ইসলামের অভিযাত্রা দেশ-কালে সীমিত গণ্ডিকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলগামী, কারণ ইসলাম সারা বিশ্বের জন্য। আর বিশ্বায়নও পশ্চিমা খ্রিস্ট-ইহুদি দুনিয়া আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে দিতে উদ্যত। ফলে এ দুই আন্তর্জাতিক আদর্শের মধ্যে অভিঘাত জরুরি। এ অভিঘাতের নেতিবাচক দিককে কাটিয়ে উঠে একে ইসলামী-বিকল্পের মাধ্যমে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানোই লাভজনক। এক্ষেত্রে তাই কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় রাখা যায় :[২৬]

www.pathagar.com

- তুলনামূলক আলোচনা করে ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদ ও বিশ্বায়নের আন্তর্জাতিকতাবাদ কোথায় কোথায়, কি কি ভাবে সাংঘর্ষিক তা চিহ্নিত করে প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেওয়া।
- বিশ্বায়নের লাগামহীন মুনাফা লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ইসলামী বিকল্প উপস্থাপন করা।
- অবাধ ভোগের মাধ্যমে মানুষের সত্তাগত ক্ষতির বিষয় চিহ্নিত করা।
- মানুষকে যান্ত্রিক ও পণ্য-তুল্য করার প্রচেষ্টাকে পর্যালোচনা করা।
- ইসলামী আদর্শ-বিশ্বাস-ধর্ম-দর্শনসহ সর্বক্ষেত্রে বিশ্বায়নের কুপ্রভাবকে চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা।
- বিশ্বায়নের যোগাযোগ ও তথ্য-মাধ্যমের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের আহ্বান পৌছানোর সুযোগ নেওয়া এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী ঐক্য জোরদার করা।
- বিশ্বায়নের সুযোগে ব্যাপক ইসলামী ভাবাদর্শে মানব সম্পদ তৈরি করে তাদেরকে দীন এবং দুনিয়া হাসিলের জন্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া।
- ইসলামী ভাবাদর্শে বিশ্বায়নের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুকাবেলার উপযুক্ত সামাজিক শক্তি সঞ্চয় করার লক্ষ্যে চিন্তা-কর্ম-বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতাকে বেগবান করা।
- তাবৎ বিশ্বের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-আদর্শ-মূল্যবোধগত সমস্যাকে ইসলামী মডেলে সমাধানের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেওয়া।
- বাংলাদেশের জন্য বিশেজ্ঞদের নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা।
- ইসলামের সামগ্রিক সৌন্দর্যকে বিশ্বায়নের আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগের সুবাদে পৃথিবীর কেন্দ্রে ও প্রান্তে প্রান্তে প্রতিস্থাপিত করা।
- বিশ্বায়নের দ্রুতলয় পরিবর্তমান পরিস্থিতিকে সর্বদা পর্যালোচনার অধীনে রাখার জন্য প্রতিনিয়ত গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা।
- বিশ্বায়নের যতগুলো ইমপেক্ট ও ডাইমেনশন রয়েছে, সেগুলোকে গভীরভাবে মনিটর করে আপটুডেট থাকা এবং সে সব ক্ষেত্রে ইসলামী বিকল্পের বিকাশ ঘটানো।

এ সকল পরামর্শই শেষ কথা নয়, বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বিষয়ক চিন্তা-ভাবনার গতানুগতিক প্যাটার্নকে বদলে সম্ভাবনা জাগ্রতকারী ইসলামের জীবন্ত-চিন্তা স্রোতের উন্মেষ ঘটিয়ে আমাদের কর্তব্য হবে কৌশলপূর্ণ অবস্থান গড়ার ব্যবস্থা নেওয়া এবং সেইভাবে জনগণকে প্রণোদিত করা।

৬. বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ : বাংলাদেশের বাস্তবতা

বিদ্যমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া একটি বিতর্কিত প্রক্রিয়া। এর পক্ষে এবং বিপক্ষে দুই দলই যথেষ্ট আবেগ নিয়ে জোরালো বক্তব্য উত্থাপন করে থাকেন। আরেকটি পক্ষ, যারা বিগত ২০০১ সালে 'বাংলাদেশের উন্নয়ন এজেন্ডা' প্রণয়নের লক্ষ্যে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি 'টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন' করেছেন, তারা এই ক্ষেত্রে বিশ্বায়নবিরোধী রাজপথের বিক্ষোভের গুরুত্ব অস্বীকার না করেও মনে করেন যে

www.pathagar.com

যেহেতু বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই ডব্লিউটিও-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন সেহেতু বর্তমানে আমাদেরকে বিদ্যমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেই জাতীয় স্বার্থের সর্বোচ্চ সংরক্ষণের জন্য সর্বাধিক চেষ্টা করতে হবে। মূল বিষয় হচ্ছে কারো চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে নিজস্ব নীতিগত ও কৌশলগত অবস্থান ও জাতীয় স্বার্থ বজায় রেখে বিশ্বায়নের সুফলগুলোকে কাজে লাগাতে হবে এবং কুফলগুলো এড়ানোর জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

কিন্তু কিভাবে বাংলাদেশ বিশ্বায়নের সুফলগুলোকে কাজে লাগাতে এবং কুফলগুলোকে প্রতিহত করতে পারবে? এই জন্য কি বাংলাদেশ প্রস্তুত?

একবিংশ শতাব্দীর সদা-পরিবর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া অক্টোপাশের মতো আমাদের সমাজ-জীবন-বিশ্বাস-মূল্যবোধসহ সকল কিছুকেই তার নিজের কব্জার মধ্যে ঘিরে ধরেছে; আমাদের সমাজ-জীবন-বিশ্বাস-মূল্যবোধসহ সকল কিছুকেই বিশ্বায়নের নীতি-আদর্শ-কাঠামোর অধীনস্থ করছে এবং আমাদের সমাজ-জীবন-বিশ্বাস-মূল্যবোধসহ সকল কিছুকেই বদলে দিচ্ছে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও খ্রিস্টবাদী-ইহুদিবাদী মতাদর্শের রঙে। এই আগ্রাসন ক্ষুদ্র ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মূল্যবোধগত-রাজনৈতিক তথা সার্বিক অস্তিত্বের জন্য ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ। বিশ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র, উন্নয়নকামী ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রের মতোই বাংলাদেশেও অভিন্ন-অসহায় অবস্থা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে বিশ্বায়নের দ্রুতগতি বাংলাদেশ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে হিমসীম খাইয়ে দিচ্ছে। আমরা সহজেই বুঝতে পারছি, বিশ্বায়নের প্রভাব এড়ানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বায়নের পক্ষ বা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া যেমনিভাবে জরুরি, তেমনি জরুরি বিশ্বায়নের ফলাফলকে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা। কেননা, এ প্রশ্নটি বেশ জোরালোভাবেই সামনে এসে গিয়েছে, আর তা হচ্ছে– বিশ্বায়ন কি আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে নাকি দরিদ্র দেশসমূহের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আরো বেশি প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেবে এবং বৈশ্বিক অসাম্যকে জোরদার করবে ? একই সঙ্গে এটাও অনস্বীকার্য যে বিশ্বায়ন দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে এবং বিশ্বায়নের সুফল কেবলমাত্র তখনই ভোগ করা সম্ভব, যখন বাংলাদেশের মতো দেশসমূহ বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কেননা, প্রস্তুতি গ্রহণে সামান্যতম দেরি বিশ্বায়নের সুফলের ক্ষেত্রে বিশাল পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

যদিও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ও তার নিয়মাবলি একটি সতত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া, তথাপি এই প্রক্রিয়ায় সর্বদাই জাতীয় স্বাথে দর কষাকষির সুযোগ রয়েছে এবং তা করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে মনিটর করে স্বীয় জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অবস্থান নির্ণয় সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক লবি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে এবং নীতি ও কর্মসূচিগত দিক থেকে এমন আরো অনেক কিছু করতে হবে, যা বাংলাদেশকে

www.pathagar.com

বিশ্বায়নের সুফলগুলোকে কাজে লাগাতে এবং কুফলগুলোকে প্রতিহত করতে সাহায্য করবে।

বিদ্যমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার নিরিখে 'টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন' মনে করে যে:[২৭]

"(এ লক্ষ্যে) প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি বাংলাদেশের নেই। তাই অবিলম্বে উপযুক্ত প্রশিক্ষিত জনবল সমন্বয়ে এ ধরনের একটি জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি গড়ে তোলা দরকার। সে লক্ষ্যে বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক আন্তঃমন্ত্রণালয় ব্যবস্থার আরো স্বচ্ছ ও অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন প্রয়োজন।"

'টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন'ই শেষ কথা নয়; তাদের মতামতই বাংলাদেশের সামগ্রিক জনমতের স্মারক নয়। তদুপরি 'টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন' প্রণেতাদের শ্রেণী ও আদর্শিক চরিত্র এবং তাদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও আনুগত্যের প্রসঙ্গও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়; এবং তাদের সামগ্রিক বিশ্বাস, পরিকল্পনা, কমর্সূচি ও কার্যক্রমও কোনভাবেই বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের চেতনায় নির্মিত মূলস্রোতের সঙ্গেও সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তাই আমাদেরকে বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল সকল অংশের মতামতকেও সঞ্চালিত ও সংগ্রন্থিত করতে হবে। এবং জনমতের স্বচ্ছ ও আপামর গোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য এমন কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যা আমাদের জনগোষ্ঠীর সচেতনতা ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে ফলে জাতিগতভাবে আমরা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবো এবং একই সঙ্গে বিশ্বায়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করে আমাদের স্বকীয়তা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার ধারাবাহিক পরম্পরা ধরে রেখে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবো। মূল বিবেচ্য বিষয় এখানেই নিহিত। আর এটা করার পূর্বশর্ত হলো: দিক-নিদের্শনা দিতে পারে এমন বুদ্ধিবৃত্তিক-জ্ঞানভিত্তিক তৎপরাকে বাস্তবায়নযোগ্য-কর্মমুখী পন্থায় সম্প্রসারিত ও জোরদার করা। মনে রাখা জরুরি যে, আবেগ বা হটকারিতা দিয়ে নয়, বিশ্বায়নের ধেয়ে আসা প্রায়-অদম্য দানবীয় স্রোতকে রোখতে হলে বা মানিয়ে নিতে হলে বা আমাদের অনুকূলে লাগাতে হলে আমাদের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে কৌশল ও বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হবে, যা অর্জিত হলে পারে নিয়ত গবেষণা ও চর্চার মাধ্যমে আহরিত নৈপূণ্যের মাধ্যমে।

আমরা এক্ষেত্রে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একবিংশ শতাব্দীর প্রস্তুতি ও বিশ্বায়ন সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলোকে সামনে রেখে বাংলাদেশের জন্য কিছু অবশ্য করণীয় কাজকে চিহ্নিত করতে পারি :[২৮]

- বাংলাদেশকে কৃষিনির্ভর দেশ বিবেচনা করে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ থেকে দূরে রাখরার কোন কারণ নেই। কেননা, বাজার অর্থনীতির সুবাদে কৃষি পণ্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। কৃষিনীতি ও কৌশলের ওপর এবং উন্নত প্রযুক্তি, বীজ,কীটনাশক ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন থাবা বসাচ্ছে। দেশজ প্রযুক্তি, কৌশল ও জাতিসমূহ বাঁচানো দুষ্কর হয়ে পড়ছে।

www.pathagar.com

তাছাড়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি অনুযায়ী কৃষিতে ভর্তুকি প্রদানের এবং বেসরকারিকরণের মতো স্পর্শকাতর বিষয় দাতাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। ফলে এ দিকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও নজর দেওয়া দরকার।

- বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ও নিয়ন্ত্রণ বজায়ের জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রের বিকাশ এবং সেখানে যোগাযোগ, প্রযুক্তিগত সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো গড়ে তোলা দরকার।
- মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অধিক মনোযোগী হতে হবে। অবহেলিত মানুষদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা খাতসহ জড়িত সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পরিকল্পনা মাফিক এ কাজ যাতে হয় এবং এ কাজে দুর্নীতি বা প্রশাসনিক অবহেলা যাতে না আসে তা খেয়াল করতে হবে।
- সামগ্রিকভাবে দেশে প্রযুক্তি-জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ গড়তে শিক্ষা ও প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা নিতে হবে।
- দুর্নীতিমুক্ত জবাবদিহি, দায়িত্বশীল ও স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন কায়েম করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সততা ও দক্ষতা এবং নির্লোভ মানুষদের সামনে এগিয়ে দিতে হবে।
- বাজার ও সমাজকে নিয়ে একযোগে কাজ করার এবং সমস্যা ও সম্ভাবনা মুকাবেলার শক্তি সম্পন্ন মানবমণ্ডলী গড়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হবে হবে।
- জাতির নৈতিকতার মানকে উন্নত করার কাজে একটি মডেল সামনে আনতে হবে এবং পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার কুফলগুলোকে তুলে ধরে এ ক্ষেত্রে ইসলামের সৌন্দর্য ও কার্যকারীতাকে প্রয়োগ করতে হবে।
- জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিন্তায় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রাধান্য থাকতে হবে এবং তা হতে হবে জাতির জন্য নির্ধারিত নৈতিক শিক্ষার উপযোগী। এক্ষেত্রে পশ্চিমা বা প্রাচ্যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র বা বিপরীতধর্মী তৎপরতা মনিটর করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ইসলাম ও বাংলাদেশের মানবমুক্তি--এই দুই প্রসঙ্গকে এক সূত্রে গেঁথে নিতে হবে।
- দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন ও আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক আগ্রাসনের মাধ্যমে গোচরে ও অগোচরে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও জাতি স্বার্থবিরোধী আদর্শ ও লোকজনকে দ্রুত পরিশুদ্ধ ও সংস্কার করতে হবে।
- জাতির মুক্তির জন্য মানসিক শক্তি, প্রাজ্ঞ-সৎ-যোগ্য নেতৃত্ব, উদ্যোগী মানব সম্পদ ও ঐক্য ও কল্যাণ চিন্তা সঞ্চারিত করতে হবে।

অন্যভাবে বলা যায় যে, আমাদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক নকশা তৈরি করতে হবে-- যাতে রাজনৈতিক, স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও অপরাপর সাংগঠনিক বিষয়গুলো স্থান পাবে-- যার ফলে আমরা স্বল্প খরচে সম্পদ নিশ্চিত ও হস্তান্তর করতে পারবো এবং প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। এ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সুধী-চিন্তাশীল-বিবেকবান মানুষদের এগিয়ে আসা দরকার। তথাকথিত সিভিল সোসাইটি দিয়ে এ কাজ হবে। যে সিভিল সোসাইটি জনবিচ্ছিন্ন এবং তল্পীবাহক, এবং যারা শুধু কিছু সেমিনার ও প্রজেক্টের মাধ্যমে কোন বিশেষ পক্ষের হয়ে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজ করে, তাদের অকেজো করে দিতে হবে সমাজের নানা অনাচারে সংক্ষুব্ধ ও পরিবর্তনকামী সুধী সমাজের বিপুল উত্থানের মাধ্যমে। সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা মানুষের অগ্রসর অংশ, যাদের আমরা সুধী সমাজ বলছি, তাদের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হওয়াও দরকার, যাতে তারা খারাপের প্রতি ঘৃণা আর ভালোর প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে অন্তঃসারশূন্য রাজনীতিকে অর্থবহ পথের দিকে বদলে দিতে পারেন। তারা কোন নির্দিষ্ট এজেন্ডোর প্রতি জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতিকে নিজেদের দিকে টেনে আনতে পারেন; প্রয়োজনে ত্যাগ ও ঝুঁকির জন্য প্রস্তুত থাকেন; সামাজিক জীবনকে সুন্দর করতে তৎপর হন। তথাকথিত সিভিল সমাজ যা পারে নি, বা যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে প্রহসনের আশ্রয় নিচ্ছে, সে কাজ করতে এগিয়ে আসতে হবে। এবং এভাবেই তারা দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী হবেন, যখন তারা সমাজের ভেতরে অবস্থান করবেন এবং সমাজ ও মানুষের জন্য হীনকর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোর পরিবতনের জন্য সক্রিয় হবেন। আমাদের একাডেমিক বা শো পিছ বা তল্পীবাহক জনবিচ্ছিন্ন-উপরতলার প্যাসিভ বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন নেই, আমাদের দরকার সমাজ-ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অ্যাকটিভ বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে গঠিত দেশব্যাপী বিস্তারিত সুধী সমাজ। এদের সংখ্যা ও উপস্থিতি যত দ্রুত বাড়ানো যাবে, তত দ্রুত সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, সামর্থ বাড়বে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আগ্রাসন মুকাবেলার শক্তি দৃঢ়মূল হবে।

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলার প্রয়োজনে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের আপামর মানুষ উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে একদল সাহসী, দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী, সৎ, যোগ্য ও নির্লোভ নেতৃত্ব ও সুধী সমাজের জন্য, যারা আমাদের প্রিয় দেশ ও দেশবাসীকে একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার দিকে পথ দেখাবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে, বৈশ্বিক পরিবর্তনের তোপের মুখে জাতির অস্তিত্বের সাম্পানের কাণ্ডারী হয়ে হাল ধরবে।

৭. উপসংহার : আমরা কোন পথ ধরে এগিয়ে যাবো আমাদের অভীষ্ট উন্নয়নের লক্ষ্যে

উপসংহারে এসে আমরা প্রাথমিকভাবে বলতে পারি যে মুখ্যত মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণাটির বিকাশের মধ্য দিয়েই সার্থক হতে পারে একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে জেগে ওঠার প্রত্যয়টি। আর ব্যাপক দরিদ্র মানুষের জন্য সক্ষমতার ভ্রূণ লুকিয়ে থাকে শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের মাঝে। যে কোন একটি বিষয় বা বৃত্তির ওপর সঠিক জ্ঞান বা দখল মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে লড়াকু এক আশাবাদী প্রত্যাশা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভায় আলোকিত সৃজনশীল মানুষের পক্ষেই সম্ভব বিশ্বায়ন বা অন্য যে কোন ধরনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তাই প্রয়োজন মানবিক উন্নয়নের নবতর ধারা, যা মানুষের সক্ষমতার দিগন্তকে সুদূরের সন্ধানে প্রসারিত

www.pathagar.com

করবে; ইচ্ছা ও আগ্রহের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেবে; নিরাপত্তাহীনতা-বৈষম্যহীনতাকে ঘুচিয়ে ক্ষমতায়নের পরিধিকে দেবে বাড়িয়ে; সকল কাজে উদ্ভব হবে অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণের চেতনা; ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিবোধকে করবে সুদৃঢ়; সামাজিক উত্তরণের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃজন করে ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেবে ইতিবাচক প্রণোদনা। আর তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে শিক্ষা, জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা। কেবল ব্যক্তিগত নৈপূণ্যবিকাশী শিক্ষাই নয়, প্রয়োজন সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষারও। আর প্রয়োজন সেই শিক্ষাকে মানুষ ও সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা। সক্ষমতার ক্ষেত্রেও ব্যক্তি-মানুষের সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি আমাদের সামাজিক সক্ষমতার পরিবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। আর এভাবেই বিকশিত হবে বিপণনযোগ্য সামাজিক শক্তি। যে সমাজে সামাজিক শক্তি সঞ্চলন যত বেশী হবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে সমাজ তত অশুভ তৎপরতাগুলোকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে--সকল জাতীয় তৎপরতাও এভাবে হবে দেশপ্রেমজাত, গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক। এর ফলে ব্যক্তির পাশাপাশি উন্নয়ন ও কল্যাণ বয়ে আসবে সমষ্টির জন্যে, জাতির জন্যে। আর এভাবেই সৃষ্টি হবে নতুন মানুষ, নয়া শতাব্দীর উপযুক্ত মানুষ, তৃতীয় সহস্রাব্দের লাগসই মানুষ, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলার যোগ্য মানুষঃ বাংলাদেশের আশাবাদী সমর্থ মানুষ।

কিন্তু এমন আশাবাদী ও সমর্থ মানব সম্পদ তৈরির জন্য প্রতিশ্রুতিপত্র বানাবে কে? বানানো হবে কিভাবে?

ইতিহাসের আলোকে আমরা জানি জেনেছি যে, সংকটকালে বিরূপ পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ মুকাবেলার জন্য পৃথিবী এ যাবতকালে উত্তরণের লক্ষ্যে তিন ধরনের পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে:[২৯]

ক. ধর্মহীন যান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা করতে গিয়ে বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিকরা ব্যর্থ হয়েছে; ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষবাদী লিবারেল জাতীয়তাবাদীরাও। এক অদ্ভুত ভোগবাদী-যান্ত্রিক মানুষ তৈরি করেছিল তারা, যে মানুষ ভোগের অতলে তলিয়ে গেছে, নিজেকে বাঁচাতে পারে নি। রাষ্ট্র ও আইনের চোখ রাঙানিও ঠেকাতে পারেনি ধর্মহীন, ভোগবাদী-যান্ত্রিক মানুষের নৈতিক-মানবিক-প্রাতিষ্ঠানিক স্খলন-পতন। ভাঙা সোভিয়েটের সে সব হতভাগ্য মানুষের করুণ পরিণতির নির্মম চিত্র এখন তাজাভাবে আমাদের সামনে জ্বল জ্বল করছে। এখনও ইউরোপের নানা স্থানের বাতাস ভারী হয়ে আছে এ সব ভোগবাদী-যান্ত্রিক মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ হাহাকারে। মানবিক বিকাশের প্রত্যাশা ছিল এ ক্ষেত্রে সুদূরপরাহত।

খ. ধর্মের সমন্বয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা করতে ব্যর্থ হয়েছে মোঘল সম্রাট আকবর, স্পেনের শাসকরা ও বর্তমানের ভারত প্রজাতন্ত্রের কূশীলবরা। নিয়ত রক্তপাত, পারস্পরিক অবিশ্বাস, হানাহানি কলংকিত করে রেখেছে তথাকথিত সমন্বয়বাদী ধারাকে। মানবিক বিকাশের বদলে অকল্যাণই এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে।

গ. ধর্মের পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যর্থতা ও সাফল্যের মিলিত ফলাফল। যেমন প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দু ধর্ম মানুষকে মুক্তির বদলে কতিপয়

www.pathagar.com

উচ্চবর্ণের দাসে পরিণত করে তাদেরকে শৃংখলযুক্ত ভয়াবহ অমানবিক অজ্ঞানতার এক নিদারুণ অন্ধকার জগৎ ও জীবনের প্রকোষ্ঠে ঠেলে দিয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের সীমিত অথচ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেও ছিল সমাজের ব্যাপক অংশকে বঞ্চিত করে কতিপয় নাগরিকের স্বেচ্ছাচারের লাগামহীন উৎসব। মধ্যযুগের ইউরোপে একছত্র খৃস্টবাদের প্রবক্তরা মানুষের ইহ ও পরজাগতিক জীবনের প্রভু বনে গিয়েছিল। কাকে বেহেশতের সনদ দেওয়া হবে আর কাকে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হবে সে এখতিয়ারও কব্জা করেছিল কয়েকজন মানুষই।

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি-তাড়িত পৃথিবীতে বিশ্বায়নের নামে যে খৃস্ট-ইহুদি মোর্চা গড়ে উঠেছে তাতেও উত্তর প্রান্তের মানুষের আগ্রাসী থাবার নিচে দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষ কম্পমান। এ হলো ধর্মের পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যর্থতার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। পক্ষান্তরে ইসলামের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাফল্যের স্বর্ণালী ইতিহাস। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে ইসলামের দীক্ষায় অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অপাংতেয় মানুষগুলো এমন অনুপম জীবন-চরিত্রের অধিকারী হয়ে এতো সমৃদ্ধ মানব সম্পদে পরিণত হয়েছিলেন যে দুনিয়ার ইহজাগতিক বাদশাহী ছিল তাদের পদতলে আর আখেরাতের পরজাগতিক সাফল্য ছিল তাদের করতলগত। তাদের প্রযত্নে নিপীড়িত মানুষ ও মানবতা পেয়েছিল শান্তির সুশীতল সবুজ আশ্রয়। এমন কি, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অপার আকাশে নক্ষত্রের অমলিন উজ্জ্বল্য ধারন করে তারা দিক নিদের্শনার আলো ছড়াচ্ছেন।

স্বকীয় অস্তিত্ব ও আত্মপরিচিতির সংকট থেকে উদ্ধারের প্রয়োজনে বিশ্বায়ন বা অন্যান্য যে কোন আগ্রাসী চ্যালেঞ্জ মুকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে আমাদেরকে এখন বিবেক ও শুভবোধের মুখোসুখি হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা কোন দিকনিদের্শনার পথ ধরে এগিয়ে যাবো। ■

তথ্যপঞ্জি

১. মাহফুজ পারভেজ, একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ, ঢাকাঃ গতিধারা, ২০০০.

২. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-এর শ্রদ্ধেয় পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ আমাকে বিশ্বায়ন নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করার তাগিদ দেওয়ায় আমি এ লক্ষ্যে আরো কিছু সংশ্লিষ্ট সাহিত্য-তথ্য-তত্ত্বাদি অধ্যয়ন করি। পরে তিনি আমাকে এ বিষয়ে একটি সেমিনার-প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য বলেন এবং সে অনুযায়ী আমি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি) কর্তৃক ১০ এপ্রিল ২০০৪ সালে আয়োজিত সেমিনারে আমার প্রবন্ধটি উপস্থাপন করি। সেমিনারে উপস্থিত প্রাজ্ঞ আলোচকদের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রবন্ধটিকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে বর্তমান আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। তবে আমাদের অভিমত, চলমান এ বিষয়ে আরও গবেষণা ও আলাপ-আলোচনার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে পশ্চিমা শক্তির শাঠ্য-ষড়যন্ত্রকে বুঝার প্রয়োজনেই। আমাদের বিশ্বাস, আরও অনেক লেখক-ভাবুক-সমাজমনস্ক-সংগঠক বিষয়টিকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে জাতির মেধা ও মননশীলতার জগতকে গতিশীল রাখবেন। প্রসঙ্গত আমি এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত ও নানা পরামর্শ প্রদানের জন্য বিআইসি-এর পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ, রাজনীতিক-সাংবাদিক মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. উমার আলী, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রাবন্ধিক শোয়েব

www.pathagar.com

নাজির, মাসিক নতুন কলমের সম্পাদক কবি মোশাররফ হোসেন খান, ব্যাংকার-লেখক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলামসহ সেমিনারে উপস্থিত আলোচকদের ধন্যবাদ জানাই।

৩. বিস্তারিত দেখুন, Alan R. Ball, Modern Politics and Government, London: MacMillan, 1993.
৪. কবীর চৌধুরী, 'মৌলবাদঃ তার ইতিহাস ও প্রকৃতি', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), সেরা সুন্দরম, ঢাকাঃ ইউপিএল, ২০০৪, পৃ.: ৭৭।
৫. Peter F. Drunkar, Post Capitalist Society, New York: Harper Business, 1993, p. 214.
৬. গোলাম হোসেন (সম্পাদিত), বাংলাদেশঃ সরকার ও রাজনীতি, ঢাকাঃ একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯২।
৭. মার্কিন আধিপত্যের এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় ইরাক, আফগানিস্তানসহ উত্তর কোরিয়া কিংবা অন্য যে কোন স্বাধীনচেতা জাতি ও রাষ্ট্র কি ভয়াবহ আগ্রাসনের মুখে নিপতিত হয়েছে, সে তথ্য আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পাঠক/পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করছেন।
৮. দ্রষ্টব্য, কবীর চৌধুরী (২০০৪), প্রাগুক্ত।
৯. উপনিবেশিকতাবাদ কেবল ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্যকেই ধ্বংস করেনি, উন্নয়নের নামে সম্পদের সীমাহীন লুণ্ঠন করেছে; এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর লুণ্ঠিত সম্পদের ভিত্তিতেই ইউরোপের সৌন্দর্য, নির্মাণ ও সভ্যতার ভিত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিস্তারিত, দেখুন, Damien Kingsbury, Key Issues in Development, New York: Palgrave-Macmillan, 2004.
১০. এ বিখ্যাত উক্তি নক্রুমার।
১১. বিস্তারিত, দেখুন, মাহফুজ পারভেজ, প্রাগুক্ত।
১২. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিই টিও-এর সাম্প্রতিক প্রতিটি সম্মেলনে তীব্র জনবিক্ষোভ ও আন্দোলন উদ্যোক্তাদের কোণঠাসা করে ফেলেছে।
১৩. ইজাজ আহমেদ, 'পৃথিবীতে রাজত্ব কার', নতুন দিগন্ত, তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫
১৪. www.Encyclopædia Britannica.com.
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. বিস্তারিত, দেখুন, Jennifer Saba, 'The Free Market', Editor & Publisher, March 2005.
১৭. বন্দনা শিবা, 'বিশ্বায়ন, প্রাণ বৈচিত্র্য ও তৃতীয় বিশ্ব', মাসিক সংস্কৃতি, জানুয়ারি, ২০০০।
১৮. পৃথিবী ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায় সম্পর্কে জানতে, দেখুন, J.M.Roberts, History of the World, New York: Oxford University Press.
১৯. মাহফুজ পারভেজ ও সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ, 'পরিবর্তমান বিশ্ব ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নীতি', রাজনীতি-অর্থনীতি জার্নাল, ৫ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ১৯৯৯।
২০. বিশ্বায়ন নিয়ে আলাপ-আলোচনায় বাংলাদেশের প্রায় সকল বিশেষজ্ঞ এমন আশঙ্খাই করেছেন।
২১. মাহফুজ পারভেজ (২০০০)।
২২. বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে পশ্চিমা শক্তি ও দাতাদের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ ও অংশ গ্রহণের প্রেক্ষিতে এ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামী মৌলবাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা লড়াইয়ের ফলে লোকায়ত বা চিরায়ত ধর্মীয় সংস্কৃতি যে আক্রমণের মুখে পড়ছে, সে প্রসঙ্গটিও বিবেচনা করা হয়েছে।
২৩. বিস্তারিত, মাহফুজ পারভেজ (২০০০)।

www.pathagar.com

২৪. মাহফুজ পারভেজ, 'আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচঃ জীবন ও দর্শন', ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা ২০০৫।

২৫. সমাজবিজ্ঞানী ও ইসলামী চিন্তচিন্তাবিদদের সঙ্গে আলোচনা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।

২৬. সমাজবিজ্ঞানী ও ইসলামী ৷বিদদের সঙ্গে আলোচনা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত।

২৭. বাংলাদেশের উন্নয়ন এজেন্ডাঃ সুশীল সমাজের টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন ২০০১, ঢাকা : ইউপিএল, ২০০৩।

২৮. এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. এম. আসাদুজ্জামান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদের সঙ্গে আলোচনায় আমি প্রভূত উপকৃত হয়েছি।

২৯. ব্যক্তিগত ইতিহাস পাঠ ও সমাজ অধ্যয়নের আলোকে এমনটিই লক্ষ্য করেছি। তবে আমার এ মতের সঙ্গে সকলেই একমত হবেন, এমনটি আমি মনে করি না। আমি নিজে অন্য কারো ভিন্ন বিশ্লেষণকে বাংলাদেশের সমাজ ও ইতিহাস অধ্যয়নে স্বাগত জানাই।

লেখক-পরিচিতি : মাহফুজ পারভেজ– কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং অধ্যাপক রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১০ই এপ্রিল, ২০০৪ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

শিক্ষা দর্শন

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

■

১. শুরুর কথা

মানুষের শিক্ষার জন্য দর্শন বা Philosophy-ই শিক্ষা দর্শন। পশু পাখির শিক্ষার জন্য দর্শনের প্রয়োজন নেই। পশু পাখি যে শিক্ষা গ্রহণ করে, মানুষের কল্যাণেই তা ব্যবহৃত হয়। আর মানুষই তাদের শিক্ষক। এসব শিক্ষিত পশু বা পাখি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তার শিক্ষক মানুষের কল্যাণেই নিয়োজিত থাকে। এর ব্যতিক্রম করার কোনো ইখতিয়ার আল্লাহপাক পশু-পাখিকে দেননি। আল্লাহপাক বলছেন, হুয়াল্লাযী খালাকালাকুম মা ফিল আরদি জামীআ'– তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের (কল্যাণের) জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল বাকারা : ২৯) পশু পাখির শিক্ষা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হলেও মানুষের শিক্ষার সাথে গোটা মানব জাতি, আকাশ পানি ও স্থলের সকল প্রাণী ও গোটা পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে বিধায়, মানব জীবনে শিক্ষা দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার ক্ষেত্রে দর্শনের বিষয়টি এতই গুরুত্ব বহন করে যে কোনো কুশিক্ষা বা অশিক্ষা দর্শন ভেদে মূল্যবান শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয় আবার মানবিক শিক্ষা চিহ্নিত হয় অশিক্ষা বা কুশিক্ষা হিসেবে।

২. জীবন দর্শন ও শিক্ষা দর্শন

জীবন ও জগত সম্পর্কে লালিত যে ধারণা বা বিশ্বাস দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতি পরিচালিত হয় সেটাই সেই ব্যক্তি বা সে জাতির জীবন দর্শন। জাতিতে জাতিতে যেমন জীবন দর্শনের ভিন্নতা আছে তেমনি একই জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও জীবন দর্শনের ভিন্নতা রয়েছে। জীবন দর্শনের ভিন্নতার কারণেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দর্শনের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ জীবন ও জগতকে কোনো ব্যক্তি বা জাতি যেভাবে বুঝতে শিখেছে সেই ব্যক্তি বা জাতি তার প্রভাবান্বিত বলয়ে সেই শিক্ষাকেই তুলে ধরেছে।

www.pathagar.com

ফলে জীবন দর্শনের ভিন্নতা এবং তাকে ধারণ করার সামর্থ্যের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জীবন দর্শনে ধর্মকে আফিমতুল্য শেখানো হয়েছে। ফলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ মাত্রই যে কোনো ধর্মের শিক্ষাকে অশিক্ষা বা কুশিক্ষা বলে গণ্য করে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জীবন দর্শন অনুযায়ী শ্রেণী শত্রু হত্যার মাধ্যমেই কেবল এই বস্তুবাদী জীবন দর্শন সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

এতে করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী মানুষেরা উক্ত জীবন দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ ব্যতীত অন্য সকল মানুষকেই শ্রেণী শত্রু মনে করে এবং শ্রেণী শত্রু বিবেচনায় সেসব নিরীহ মানুষকে হত্যা করে উৎফুল্ল বোধ করে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জীবন দর্শনে শ্রেণী শত্রু চিহ্নিত করা এবং খতম করাই উক্ত দর্শনের মূল শিক্ষা।

অন্যদিকে ভোগবাদী জীবন দর্শনের অনুসারী মানুষেরা জীবন ও জগতের সবকিছুকেই ভোগের মানদণ্ডে বিচার করে। ফলে জীবনটা হয়ে পড়ে যান্ত্রিক এবং পণ্যতুল্য। মানুষও অন্যান্য পণ্যের মত বিবেচিত হয়। এই জীবন দর্শনে ভোগই চূড়ান্ত বিধায় এই জীবন দর্শনের অনুসারী কোন মানুষ বা জাতি ভোগের অন্তরায় সৃষ্টিকারী যে কোন কারণকে নির্মূল করতে যে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ নৈতিক কি অনৈতিক, তা কোনো বিবেচ্য বিষয়ই নয়। বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্বই এর দৃষ্টান্ত হিসেবে যথেষ্ট। সুনির্দিষ্ট কিছু কেস স্টাডি ছাড়া ভোগবাদী মানসিকতার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা সত্যিই অসম্ভব, বিশেষ করে বাংলাদেশের উদার নৈতিক জীবন ধারার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে। ভোগবাদী জীবন দর্শনের মূল শিক্ষা মানবিকতা নয়, সবকিছুকে ভোগ করা। এতে নৈতিক মূল্যবোধের ন্যূনতম কোনো গুরুত্ব নেই।

৩. জীবন দর্শনের ভিত্তি

মানুষের প্রথম পদচারণা যখন পৃথিবীর বুকে পড়লো, তখন মানুষ উজ্জ্বল প্রদীপরূপে যে সূর্য আর স্নিগ্ধ আলোর চাঁদ দেখেছিল, আজও তাই আছে। সাগর-নদী, গাছ-পালা, পশু-পাখি, বন-বনানী, সুউচ্চ পর্বতমালা, নয়নাভিরাম সুনীল আকাশের দিগন্তে একাকার হওয়া কিংবা শিহরিত করা শীতল বাতাসে রোমাঞ্চিত হওয়া সবই এখনও আছে যেমন ছিল শুরুতে। মানব জাতির সামনে এই একই বৈচিত্র্যময় জগত থাকা সত্ত্বেও কেন জীবন দর্শনে এত পার্থক্য সূচিত হল? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটা মনে আসে। বস্তুত গোটা প্রকৃতির মধ্যে মানুষ নিজেকে যেভাবে খুঁজে পেয়েছে সেভাবেই তার জীবন দর্শনকে গড়ে নিয়েছে আর এভাবেই তৈরী হয়েছে জীবন দর্শনের ভিন্নতা।

পৃথিবীর প্রথম মানব গোষ্ঠীকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলেন আল্লাহ নিজেই। কালক্রমে মানুষ যখন সেই পথের দিশা থেকে সরে গেলো তখন মানুষের সামনে একমাত্র প্রকৃতিই ছিল জীবন জিজ্ঞাসার সমাধানের উৎস। প্রকৃতির বিশালত্বের মাঝে নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্ব নিয়ে মানুষ নিজে খুবই অসহায় বোধ করেছে। ফলে সূর্য, আগুন, সাপ, বৃক্ষ, গরু, সাগর-নদীসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও প্রাণীর নিকট মানুষ মাথা নত করা শুরু করেছিল। এমনকি বিশাল তুষার স্তম্ভে দেবত্ব আরোপ করে লিঙ্গ পূজাও মানুষ

www.pathagar.com

করছে! এভাবে প্রাকৃতিক শক্তি বা প্রাণীর পূজা করার প্রবণতা থেকে মানুষ তার নিজ হাতে মূর্তি বানিয়ে সেই মূর্তির পূজা করার শিক্ষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে নিজের অসহায়ত্বকে অনুভব করে কিছু মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করার এক জীবন দর্শন দাঁড় করিয়ে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব লিখিত মুসলিম দার্শনিকদের স্বকীয়তা প্রবন্ধের একটি উক্তি তুলে ধরছি : 'এ কথা সত্য যে, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো বড় বড় দার্শনিক বিশ্বাস করতেন, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সব জ্যোতিময় দেবতা' (ইসলামী দর্শনের রূপরেখা। পৃষ্ঠা-১৬৩। ইফা প্রকাশনা নং-৩৯১) এ ধারার জীবন দর্শনের বিপরীত চিত্রও রয়েছে। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন তেমনি একজন মানুষ। যিনি মূর্তি পূজার দর্শনের বিপরীতে একাই সংগ্রাম করেছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে যিনি আব্রাহাম নামে পরিচিত। তাঁর বাবা ছিলেন একজন মূর্তিপূজক এবং তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় প্রধান পুরোহিত। ইব্রাহিম (আ) প্রকৃতি থেকে যেভাবে বিশ্বজগতের প্রতিপালককে খুঁজে পেলেন কুরআনের ভাষায় তার বর্ণনা শুনুন : অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন সে নক্ষত্র দেখে বললো, "এইতো আমার প্রতিপালক।" অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বললো, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না। (সূরা আল আনআম : ৭৬ আয়াত) অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখলো তখন বললো, "এইতো আমার প্রতিপালক"। যখন এও অস্তমিত হল তখন বললো, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো (সূরা আল আনআম : ৭৭ আয়াত) অতঃপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখলো তখন বললো, "এইতো আমার প্রতিপালক, এতো সর্ববৃহৎ। যখন এও অস্তমিত হলো, তখন সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যে সকল শক্তিকে আল্লাহর শরীক কর তার সাথে আমার কোনো সংশ্রব নেই। (সূরা আল আনআম : ৭৮ আয়াতা) আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আল আনআম : ৭৯ আয়াত) সুস্পষ্টভাবে ইব্রাহিম (আ) সকলপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তির যিনি উৎস তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলে তিনি তাঁর পিতার মতো মূর্তিপূজক হতে পারেননি। ইব্রাহিম (আ) ব্যক্তি হিসেবে সকলপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তির উৎস আল্লাহপাককে খুঁজে পেলেও সমসাময়িক মূর্তিপূজক সমাজের কাছে এর কোনো প্রমাণ ছিল না। তাই তৎকালীন নৃপতি বাদশাহ নমরুদ কর্তৃক ইব্রাহিম (আ)কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের ঘটনা দিয়ে আল্লাহপাক মানব জাতির কাছে সুস্পষ্ট করেছিলেন দুটো বিষয় :

এক. সকল প্রাকৃতিক শক্তি আল্লাহপাকের সৃষ্টি এবং তাঁরই অনুগত। মানুষের কোনো প্রয়োজনই নেই কোনো ধরনের প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করার বা বিমূর্ত প্রাকৃতিক শক্তির মূর্তরূপ কোনো মূর্তিকে পূজা করার। সকল প্রাকৃতিক শক্তির উৎস মূলত আল্লাহপাক। তাই পূজা বা নত শির পাবার অধিকার একমাত্র আল্লাহপাকেরই আছে।

www.pathagar.com

দুই. মানুষ আল্লাহপাকের এক অনন্য মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি। মানুষ অসহায় নয়। স্বয়ং আল্লাহপাক তার অভিভাবক। সুতরাং আল্লাহপাক ছাড়া আর কোনো শক্তিকে ভয় পাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ মানুষের নেই।

প্রায় একই ধরনের বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা আমরা অন্যান্য নবীদের জীবন থেকেও জানতে পারি। যেমন ধূ ধূ মরুভূমিতে যখন নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহপাকের হুকুমে নৌকা বানাচ্ছিলেন তখন তাঁকে এতদিন যারা পাগল বলেছিল তারা মোটামুটি Confirmed হয়েছিল যে তাদের পাগল বলাটা ঠিক আছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ছিল ভয়াবহতম। ধূ ধূ মরুভূমিতে প্লাবন এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকারী কেনানও (নূহ আলাইহিস সালাম-এর ছেলে) প্লাবনে তলিয়ে গিয়েছিল। এইতো আল্লাহপাক! একইভাবে লোহিত সাগরের মাঝখানে চলাচলের পথ তৈরী করে দিয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে নিরাপদে পার করে নিয়ে ফেরাউনকে সাগরে ডুবিয়ে মারা, সালেহ আলাইহিস সালামের দোয়ায় সাড়া দিয়ে আল্লাহপাক কর্তৃক কঠিন পর্বতের ভেতর থেকে গর্ভবতী উষ্ট্রিকে বের করে আনা, বাবার সংস্পর্শ ছাড়া ঈসা আলাইহিস সালামকে মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েই কথা বলানো, যৌন অনাচারে লিপ্ত (সমকামিতায় লিপ্ত) লূত আলাইহিস সালাম-এর জনগোষ্ঠীকে সালফার বা গন্ধক বৃষ্টি ঝরিয়ে সমূলে ধ্বংস করা (যা এখন ডেড সী নামে পরিরিত), ইউনুস আলাইহিস সালামকে বিশাল সামুদ্রিক মাছের পেট থেকে জীবন্ত বের করে আনা এবং নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করানো (সূরা আল কামার : আয়াত-১) এসব ঘটনা এ কথা প্রমাণ করছে যে, সকল ধরনের প্রাকৃতিক শক্তির উপর আল্লাহপাক তাঁর সর্বময় ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এরপর আর কি যুক্তি অবশিষ্ট থাকতে পারে যে মানুষ, আগুন, সূর্য, বৃক্ষ, সাপ, সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত কিংবা প্রাকৃতিক শক্তির মূর্তরূপ মূর্তি পূজা চালিয়ে যাবে? এর কোন যুক্তি নেই। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মানুষ তাই আল্লাহপাক ছাড়া আর অন্য কোন শক্তির নিকট নিজেকে অসহায় বোধ করে না এবং আল্লাহপাক ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নোয়াবার কোন কারণ খুঁজে পায় না। এসব বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখেও যারা বিমূর্ত প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির বা মূর্তির আকারে সে শক্তির মূর্তরূপের পূজা করে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহপাক বলছেন,

'তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারতো। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।' (সূরা আল হাজ্জ : ৪৬ আয়াত)

'যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, তারা এই ব্যাপারে সফলকাম হবে না। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' (সূরা আল মু'মিন : ৫৬, ৫৭ আয়াত)

www.pathagar.com

'আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযক; তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান!' (সূরা আল মু'মিন : ৬৪ আয়াত)
'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হও। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।' (সূরা আল মু'মিন : ৬৫ আয়াত)
'তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটনা এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, হও আর অমনি হয়ে যায়।' (সূরা আল মু'মিন : ৬৮ আয়াত)
'তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে? এভাবেই বিপথগামী করা হয় তাদের, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।' (সূরা আল মু'মিন : ৬২-৬৩ আয়াত)
'আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্রিকে এবং আলোকোজ্জ্বল করেছেন দিবসকে। আল্লাহ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।' (সূরা আল মু'মিন : ৬১ আয়াত)
'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর আলাক হতে তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু ঘটে এর পূর্বেই। যাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।' (সূরা আল মু'মিন : ৬৭ আয়াত)
এভাবে আল কুরআন এই জীবন ও জগতের পেছনে যে পরমসত্তা রয়েছে তাঁর পূর্ণ পরিচয় পেশ করেছে। তিনি আল্লাহ; রাব্বুল আলামীন। জগতসমূহের রব বা প্রতিপালক। যিনি মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন, যিনি আলোকে অন্ধকারে এবং অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করেন। (৩ : ২৭) যিনি অমর, চিরঞ্জীব, নিত্যবিরাজমান (২ : ২৫৫) যিনি চাঁদকে দ্বিখণ্ডনকারী (৫৪ : ১), কঠিন পর্বত থেকে গর্ভবতী উটকে পয়দাকারী (৯১ : ১৩), যিনি কুন ফা- য়্যাকুন- হও, বললে তা হয়ে যায়- এই শক্তির একচ্ছত্র মালিক (২ : ১১৭), যিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন (৪২ : ৪৯), যিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত (৫৫ : ২৭)। কোটি কোটি প্রাণ প্রতি মুহূর্তে তৈরী করা আবার কোটি কোটি প্রাণের মৃত্যু ঘটানো হচ্ছে তাঁরই নির্দেশে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত (৫৭ : ৩)। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই (৫৭ : ২)। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয় (৪২ : ১১)। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি একমাত্র নির্ভরস্থল। তাঁর কোন সন্তান সন্ততি নেই এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই (সূরা আল ইখলাস)। এই গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী সত্তাই কেবল মানুষের উপাসনা বা ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র অধিকারী বলে আল কুরআনে গোটা মানব জাতির নিকট প্রথম শিক্ষা

www.pathagar.com

হিসেবে পেশ করে। এছাড়া আল কুরআন গোটা মানব জাতির জন্য উপরে বর্ণিত জীবনদর্শনের ভিত্তিতে যে শিক্ষা দর্শন পেশ করেছে তা নিম্নরূপ :

১. তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না। (বস্তুত মানুষের মত মর্যাদাবান সত্তার ইবাদাত পাবার যোগ্যতা আল্লাহপাক ছাড়া আর কারো নেই।)

২. বাবা-মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকে ধমকের সুরে কথা বলা যাবে না। নম্র ভাষায় সম্মানের সাথে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। আর বার্ধক্যে, তাদেরকে 'উফ' কথাটিও বলা যাবে না।

৩. আত্মীয়, মিসকীন (গরীব-দুঃখী) ও মুসাফিরদের অধিকার আদায় করবে।

৪. যদি আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের ফিরিয়ে দিতে হয় তবে নম্র ভাষায় ফিরিয়ে দিতে হবে। কর্কশ ভাষায় বা দুর্ব্যবহার করে নয়।

৫. জীবন, সম্পদ বা সময় কোনটাই অপব্যয় বা অপচয় করবে না। অপব্যয়কারী মানুষ শয়তানের ভাই।

৬. কৃপণ হবে না কিংবা বেহিসেবী খরচ করবে না বরং অর্থ সম্পদ ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।

৭. ছেলে হোক বা মেয়ে হোক দারিদ্র্যের আশংকায় সন্তান হত্যা করবে না।

৮. ব্যভিচার করা তো দূরের কথা, ব্যভিচারের কাছেও যাবে না।

৯. আল্লাহপাকের বিধানসম্মত কারণ ব্যতীত (মনগড়া কারণ নয়) কাউকে হত্যা করবে না।

১০. ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না।

১১. ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পালন করবে।

১২. মাপ বা ওজনে কম বেশি করবে না।

১৩. জ্ঞান আহরণ না করেই কোন বিষয়ের পেছনে ছুটবে না।

১৪. যমীনে দম্ভভরে চলবে না।

সুন্দর ও আকর্ষণীয় চরিত্রের ব্যক্তি ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে, উন্নত সভ্যতার সূচনা করতে হলে বর্ণিত শিক্ষা দর্শনের বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। আল কুরআন ব্যতীত অন্য কোন জীবনাদর্শে এত সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দর্শন উপস্থাপিত হয়নি।

উপরে বর্ণিত ধারার জীবন দর্শন ছাড়াও বিগত শতাব্দীতে গ্রীক ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এ দুনিয়ার আদি কারণের স্বরূপ সম্বন্ধে ও পরিদৃশ্যমান জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এবং পরবর্তীতে মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মূল নিরূপণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। ফলে দুনিয়ার আদি কারণ, তার সাথে পরিদৃশ্যমান জগতের সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে তাদের মতামত বা দার্শনিক ধারণাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে পাশ্চাত্যে একটি জীবন দর্শন দাঁড় করিয়েছে। এসব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্লেটো, এ্যারিস্টোটল, ফ্রান্সিস বেকন, স্পিনোজা, ভল্টেয়ার, রুশো, রেনে ডেকার্ট, ইমানুয়েল কান্ট, শোপেনহাওয়ার, হার্বার্ট স্পেন্সার, ফেড্রিক, নীটশে (চার্লস ডারউইন পুত্র), বার্গস ক্রোচে, বার্ট্রান্ড রাসেল এবং জর্জ বার্ণাডশ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

স্পিনোজা ছিলেন একটি রক্ষণশীল ইহুদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মুক্ত বুদ্ধি তথা প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ১৬৫৬ সালে তাঁকে দলচ্যুত করা হয়। স্পিনোজা দুনিয়ার আদি কারণ ও তার সাথে পরিদৃশ্যমান জগতের সম্পর্ক বিষয়ে চিন্তার ফলশ্রুতিতে প্রকৃতিতে আইন ও শৃংখলার এক আশ্চর্য পরম্পরা লক্ষ্য করে দ্ব্যর্থকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, সমস্ত সত্তা এবং সৃষ্টির সমস্ত রহস্য একটি মহিমান্বিত পরম সত্তায় এসে মিলিত হচ্ছে। মন, বস্তু, কাল, তথা দৃশ্যমান সবকিছুই এই মহিমান্বিত এক– এরই অভিব্যক্তি (ইসলামী দর্শনের রূপরেখা, পৃষ্ঠা-৩৮)। লক্ষণীয় স্পিনোজা একটি মহিমান্বিত পরম সত্তার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিলেও সেই পরম সত্তার কোন পরিচয় তুলে ধরতে পারেননি। প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রেনে ডেকার্টকে বলা হয় আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক। দুনিয়ার আদি কারণ ও তার সাথে পরিদৃশ্যমান জগতের সম্পর্ক বিষয়ের চিন্তাধারাকে তিনি কিছুটা পরিমার্জিত করেন। তিনি কল্পনা করেন যে, ইন্দ্রিয় চেতন জড় বিশ্ব এবং মনের বিচার বুদ্ধিসজ্জাত জগতের মধ্যে পরম সত্তা হচ্ছে যোগসূত্র। (ইসলামী দর্শনের রূপরেখা, পৃষ্ঠা-৩৩)

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, স্পিনোজা এবং দার্শনিক ডেকার্টের বক্তব্য প্রায় একই এবং উভয়ের কেউই পরম সত্তার পরিচয় তুলে ধরতে পারেননি। ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও দার্শনিকদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা থেকে উদ্ভূত বা সৃষ্ট জীবন দর্শন মানুষকে জীবন ও জগত সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিতে পারেনি। আধুনিক ইউরোপীয় জীবন দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তই খৃষ্ট ধর্মের সারকথা বা নানাভাবে তারই সমর্থন এরকম ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরের কল্যাণে যীশুর (ঈসা আলাইহিস সালাম) আত্মদান, তাঁর ক্ষমা সুন্দর অপার্থিব প্রেমের শুভ প্রেরণা, জান্তেই হোক অজান্তেই হোক, আধুনিক যুগে ইউরোপীয় দার্শনিকদের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে (ইসলামী দর্শনের রূপরেখা' ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব লিখিত মুসলিম দার্শনিকদের স্বকীয়তা প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা-১৬৪।) এ জন্যই আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক রেনে ডেকার্ট সম্পর্কে বলা হয় যে, He remained a catholic long after he ceased to be Christian- তাঁর খৃস্টানত্ব ঘুচে যাবার বহু পরও তিনি ক্যাথলিকই ছিলেন। (ইসলামী দর্শনের রূপরেখা, পৃষ্ঠা-১৬৫)

৪. শিক্ষা দর্শনের ভিন্নতার কারণ

জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা না থাকার ভিত্তিতে জীবন দর্শনের যে ভিন্নতা তৈরী হয় তা একটু আগে আলোচনা করা হয়েছে। জীবন দর্শনের ভিন্নতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা দর্শনের ভিন্নতার সূচনা হয়। জীবন দর্শন, জীবনের জন্য দিক নির্দেশনার ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির উত্থান পতনের পেছনে রয়েছে এই জীবন দর্শন। আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান জীবন ও জগতের বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান যত নির্ভরযোগ্য হবে জীবনের জন্য দিক নির্দেশনা ততই ফলপ্রসু ও

www.pathagar.com

কল্যাণকর হবে। বর্তমান সময়, Micro বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়, Macro বা গণমানুষ কেন্দ্রিক। তাই জীবন ও জগত সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে নির্মিত জীবন দর্শনের প্রভাব এখন আর ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই বরং গণমানুষের কল্যাণ অকল্যাণ এর সাথে জড়িত আছে। যেহেতু সকল ধরনের শিক্ষা দর্শনের উৎস হচ্ছে সেই জাতির জীবন দর্শন, তাই শিক্ষা দর্শন কোন জাতির সার্বিক উন্নতি অবনতি বা কল্যাণ অকল্যাণের সাথে জড়িত। কোন জাতির মনন গঠনে শিক্ষা দর্শনের ভূমিকা অপরিসীম। একই জাতিতে দুই ধরনের শিক্ষা দর্শনের অনুসরণ শিক্ষা দর্শন ঐক্যবদ্ধ না করে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখবে আজীবন। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলে একই শিক্ষা দর্শন অনুসরণ করা অপরিহার্য।

জীবন দর্শনের ভেতরেই মানুষ খুঁজে ফেরে জীবন জিজ্ঞাসার জবাব। জীবন জিজ্ঞাসার যেন শেষ নেই। জীবনের সকল দিকের জিজ্ঞাসার জবাব সব জীবন দর্শনে নেই। যে জীবন দর্শন জীবনের সকল দিকের সুস্পষ্ট জবাব দিতে পেরেছে এবং জীবন ও জগত হতে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তও দেখাতে পেরেছে তা হচ্ছে আল কুরআনের জীবন দর্শন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন জীবন দর্শনের যে আলোচনা আমরা করেছি তাতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে আল কুরআন ব্যতীত অন্যান্য জীবন দর্শন আমাদের চার পাশের এই জীবন ও জগতের পেছনে এক পরম সত্তা রয়েছে এটা অনুভব করতে পারলেও তার পরিচয় দিতে পারেনি। এছাড়া জীবনের আরো জটিল ও নানামুখী প্রশ্ন যেমন– রূহ কি? পরলোক কি? ইহলোক ও পরলোকের মাঝে সম্পর্ক কি? জীবন মৃত্যু কি? জীবনের লক্ষ্যই বা কি? মৃত্যু কি জীবনের শেষ? জ্ঞান কি? পরম সত্তা কি? মানুষের সাথে মানুষেরই বা সম্পর্ক কি? আমানত কি? ইত্যাদি বিস্তারিত বিষয়ে জীবন জিজ্ঞাসার জবাব কুরআন ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আল কুরআনে জীবনের জন্য দিক নির্দেশনা যত ব্যাপক তা অন্য কোন জীবনাদর্শে নেই। সূরা আল ফুরকানের ৩৩নং আয়াতে এ বিষয়ে আল্লাহপাক বলছেন, 'ওরা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।" প্রসঙ্গত ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসারী এমন কিছু মনীষীর দেয়া শিক্ষার সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। যেমন– মহাকবি জন মিল্টন বলেছেন,

Education is the harmonious development of body, mind and soul. দেহ, মন ও আত্মার সুসমন্বিত উন্নয়নই শিক্ষা। নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, To develop the inner qualities of a man. অর্থাৎ মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর উন্নয়নের প্রক্রিয়াই শিক্ষা।

ড. জন পার্ক বলেছেন, শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন বা প্রদানের কলাকৌশল বা প্রক্রিয়া। আমেরিকার শিক্ষাবিদ জন ডিউই বলেছেন, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতাই শিক্ষা। সংজ্ঞাগুলোর বিশ্লেষণ যে প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়া যায় না তা হলো মন বা আত্মা কি? আত্মার উন্নয়নই বা কি? মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীগুলো কি? অমানবিক কোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে

www.pathagar.com

অমানবিক চারিত্রিক গুণাবলী বা অভ্যাস অর্জনই কি শিক্ষা? এ প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক জবাব উপরোক্ত শিক্ষার সংজ্ঞাগুলোতে নেই। অন্যদিকে আল কুরআনে এ বিষয়গুলোর যে বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে তা এক কথায় অনবদ্য। যেমন– রূহ বা আত্মা সম্পর্কে আল কুরআনে আল্লাহপাক বলছেন, 'তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।' (সূরা বনী ইসরাইল : ৮৫ আয়াত)।

রূহ বা আত্মার উন্নয়ন ও অধঃপতন কী? এ বিষয়ে কুরআনে আল্লাহপাক বলছেন, 'আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে (দৈহিক ও আত্মিক উভয়দিকে) অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি (অসৎ কর্মনীতি ও তার বাস্তবায়নের কারণে) কিন্তু তাদেরকে নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎ কর্মপরায়ণ।' (সূরা আত্ তীন-৯৫ : ৪, ৫, ৬ আয়াত)

আল্লাহপাক আরো বলেন, 'যারা বিশ্বাসী ও সৎ কর্ম করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।' (সূরা আল আরাফ-৭ : ১৭১ আয়াত)

'শিক্ষা' বিষয়ে আল কুরআনে আল্লাহপাক বলছেন, 'যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।' (সূরা আল আলাক, ৯৬ : ৫ আয়াত)

'তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না' (সূরা আল বাকারা, ২ : ২৩৯)

আল্লাহপাক আরো বলছেন, 'তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।' (সূরা আল বাকারা : ২২১ আয়াত)

আল্লাহপাক আরো বলছেন, 'সত্য তা-ই যা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রাপ্ত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' (সূরা আল বাকারা-২ : ১৪৭)

এভাবে মানুষ ও তার মনের পরিচয় এবং সত্য কি, শিক্ষা কি এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিভাবে আল কুরআনে যে বক্তব্য এসেছে অন্য কোন জীবনাদর্শে তা আসেনি।

মার্কিন বিজ্ঞানী লিনাস পলিং– (Linus Pauling)-এর মতে সত্য জানার তীব্র আকাংখাই জন্ম দিয়েছে Science বা বিজ্ঞানের। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যা বলেন সবই সত্যি নয়। এ বিষয়ে ব্রিটিশ গণিতবিদ, পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ স্যার জেমস জিনস (Sir James Jeans) তাঁর The New Background of Science নামক গ্রন্থে বলেছেন 'We can never say that any theory is final or corresponds to absolute truth, because at any moment new facts may be discovered and compel us to abandon it'– কোন তত্ত্বকেই পরম সত্য বলে ধরে নেয়া যায় না। কারণ যে কোন সময় ওই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

জার্মান পদার্থবিদ Max Plank বলেছেন, 'We have no right to assume that any physical laws exist or if they have existed upto now, that they will continue to exist in a similar manner in the future'– জগতে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্রের অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নেয়ার কোন

www.pathagar.com

অধিকার আমাদের নেই। বর্তমানে যদি তেমন কোন সূত্র থেকেও থাকে, তা ভবিষ্যতেও একই রকম থাকবে– এমনটি বলা যায় না। ফরাসি বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি (Maurice Bucaille) তাঁর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ The Bible, The Quran and science- এ বলেছেন, 'কুরআনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিরোধের নয় বরং বিস্ময়করভাবে মিল–মিছিলের।' এসব বক্তব্যকে যদি আমরা আল কুরআনের সেই আয়াতটির সাথে মিলিয়ে নিই যা একটু আগে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, 'সত্য তা-ই যা তোমার প্রতিপালকের সাথে হতে প্রাপ্ত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না'। (সূরা আল বাকারা : ১৪৭ আয়াত) তাহলে বিজ্ঞানীদের উক্ত বক্তব্যগুলোতে মূলত আল কুরআনের উদ্ধৃত আয়াতেরই প্রতিফলন দেখতে পাবো। ইসলামের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন দ্বন্দ্ব নেই। বরং ইসলাম বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত করেছে। আল কুরআনের এক অষ্টমাংশ জুড়ে আছে বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াত। আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীনভাবে আল কুরআন সম্পর্কে বলেছেন, যালিকাল কিতাবু লা রাই বাফীহ'– আল কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যার পুরোটাই সত্য। (সূরা আল বাকারা-২ : ২ আয়াত)

আল্লাহপাক আরো বলেছেন, 'আল কুরআন সকলের (শিক্ষার) জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যার ইচ্ছা সে আল কুরআন হতে উপদেশ (শিক্ষা) গ্রহণ করুক।' (সূরা আল মুদ্দাচ্ছির : ৫৪)

গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহপাক বলছেন, 'হে মানুষ। তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে উপদেশ এসেছে এবং যা তোমাদের অন্তরে আছে তার আরোগ্য আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।' (সূরা ইউনুস : ৫৭ আয়াত)

আল্লাহপাক আল কুরআনে যা বলেছেন, শতাব্দীব্যাপী গবেষণায় তাকেই সত্য হিসেবে পেয়েছেন

বিজ্ঞানীরা। সুতরাং বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত আপাতঃ সত্য নয় বরং আল কুরআনের বিধৃত চূড়ান্ত সত্যই মানব জাতির শিক্ষার দর্শন হওয়া, বিবেকের রায়।

৫. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

জীবন দর্শন শিক্ষা দর্শনের উৎস। তেমনি শিক্ষা দর্শন শিক্ষার উৎস। আর প্রশিক্ষণ হচ্ছে শিক্ষা দর্শন অনুযায়ী কোন শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। মানুষ কেবল মানুষকেই প্রশিক্ষণ দিয়েছে তা নয় পশু, পাখী, এমনকি জলজ প্রাণীকেও মানুষ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সাম্প্রতিক ইরাক আগ্রাসনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানিমাইন চিহ্নিত করতে প্রশিক্ষিত ডলফিনদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। এ ছাড়া পশু ও পাখীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষ নিজেদের কল্যাণে ব্যবহার করার পর্যাপ্ত দৃষ্টান্ত আমাদের জানাই আছে। এসব বাস্তব দৃষ্টান্ত এ কথাই প্রমাণ করে যে, গোটা বিশ্ব জগতের সবকিছুকেই নিজেদের কল্যাণে ব্যবহার করার প্রবণতা মানুষের রয়েছে। একমাত্র অপ্রকৃতিস্থ মানুষ ছাড়া এই প্রবণতার বাইরে কেউ থাকতে পারে না। অর্থাৎ মানুষ গোটা বিশ্ব জগতকে ব্যবহারকারী আর বিশ্ব জগতের সবকিছুই মানুষ দ্বারা ব্যবহৃত হবার জন্যই সৃষ্ট। এই চিরন্তন সত্যটিই আল কুরআনে আল্লাহপাক এভাবে তুলে ধরেছেন :

www.pathagar.com

"তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তাঁর দিকেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল বাকারা : ২৮ ও ২৯ আয়াত)
বিশ্ব জগত থেকে কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, আল্লাহ পাকের এই চিরন্তন সত্যেরই অনুসরণ করে যাচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে। জীবন দর্শন ভেদে শিক্ষা দর্শনের ভিন্নতা থাকায় কোনো কোনো জীবন দর্শন হতে উদ্ভুত শিক্ষা দর্শন মানুষকে প্রকৃত সত্য হতে বিভ্রান্ত করে আল্লাহবিমুখ করে গড়ে তুলেছে। আল কুরআনের সত্য জীবন দর্শন হতে উদ্ভুত নয় এমন সকল শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানুষ এক অপূরণীয় ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে।
আল কুরআনে আল্লাহপাক এ চিত্র তুলে ধরেছেন সূরা আল আসরে। তিনি বলেছেন– 'সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে। কেবল তারা ছাড়া– যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, পরস্পরকে (ঈমানের পথে) সত্য নিষ্ঠার উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে (ঈমানের পথে) ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।' (সূরা আল আসর)

৬. উপসংহার

পৃথিবীর বুকে বহু জাতির এবং সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল। এসব জাতিগুলোর মধ্যে আল্লাহর বিধানবিমুখ জাতিগুলো তাদের গড়া সভ্যতাসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। যদিও তাদের বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ ও ঈর্ষণীয়। এই ঐতিহাসিক সত্য একথা সুস্পষ্টভাবে মানব জাতিকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, জাতিসমূহের টিকে থাকার জন্য বস্তুগত বা প্রযুক্তিগত ব্যুৎপত্তি অর্জন শর্ত নয়। বরং পরম সত্তা আল্লাহপাকের পছন্দনীয় সদগুণাবলী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠন এবং গোটা বস্তু জগতকে তারই আলোকে ব্যবহার করার যোগ্যতা অর্জনই কোন জাতির বেঁচে থাকা ও উন্নতির শিখরে যাবার একমাত্র গ্যারান্টি।
আল্লাহপাক বলছেন, 'আমি তাদের আগেও অনেক মানব গোষ্ঠিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা ছিল শক্তি সামর্থ্যে এদের চাইতে অনেক বেশী বড়, (দুনিয়ার) শহর বন্দরগুলো এরা চষে বেড়িয়েছে, কিন্তু (আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য তাদের) কোনো আশ্রয়স্থল ছিল কী?' (সূরা ক্বাফ-৫০ : ৩৬ আয়াত)
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, জাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকা এবং পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে থাকার প্রয়োজনে আমাদের শিক্ষা দর্শনে আল কুরআনে ঘোষিত শিক্ষা দর্শনের প্রতিফলন থাকা খুবই জরুরী এবং আল কুরআন প্রদর্শিত মানবিক গুণাবলী অর্জনের পাশাপাশি আমাদেরকে প্রযুক্তিগত দক্ষতাও অর্জন করতে হবে। ■

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২২শে নভেম্বর, ২০০৪ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

লেখক-পরিচিতি : লেখকের 'আমরা কলম সৈনিক' প্রবন্ধের লেখক-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতি

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

■

সাধারণত অঞ্চল, ভাষা জাতি বা উপজাতি ভিত্তিক সংস্কৃতির কথা আমরা শুনে থাকি। সমাজতাত্ত্বিকগণ বিশেষ অঞ্চল, আবহাওয়া, ভাষা ও স্থানিক বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতেই বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিচয় নির্ণয় করে থাকেন। কিন্তু বিশ্বাস, জীবনদৃষ্টি ও আদর্শগতভাবে যে বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সংস্কৃতির জন্ম হয়, সে বিষয়টি তারা বিবেচনায় আনতে রাজী নন। অথচ পৃথিবীর আদিকাল থেকে এ ধরনের সংস্কৃতি বিদ্যমান এবং এখনো বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় তা পরিদৃষ্ট হয়। এ ধরনের সংস্কৃতি কোন বিশেষ ধর্ম, দর্শন বা মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিগঠিত হয়ে থাকে। এ ধরনের সংস্কৃতির সাথে স্থানিক উপাদানের সংশ্লেষ থাকলেও এর মূল ভিত্তি বা উপাদান হলো ধর্ম বা কোন বিশেষ মত ও আদর্শ। যেমন হিন্দু সংস্কৃতি, খৃস্টান সংস্কৃতি, ইহুদী সংস্কৃতি, কমিউনিস্ট সংস্কৃতি, ইসলামী সংস্কৃতি ইত্যাদি কোন না কোন ধর্ম বা আদর্শের ভিত্তিতেই বিনির্মিত।

এ ধরনের সংস্কৃতি কখনো দেশ বা অঞ্চলভিত্তিক হয় না। একই দেশে এ ধরনের বিভিন্ন সংস্কৃতি পরিদৃষ্ট হতে পারে আবার এ ধরনের কোন সংস্কৃতি একাধিক দেশের বৃহত্তর পরিমণ্ডলেও গড়ে উঠতে পারে। যেমন বাংলাদেশের সংস্কৃতি বলতে প্রধানত আঞ্চলিক উপাদানের ভিত্তিতে পরিগঠিত সংস্কৃতি বুঝায়। তবে সেখানে ধর্মীয় উপাদানও অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে। আবার ধর্ম বা মতাদর্শগতভাবে এখানে ইসলামী সংস্কৃতি, হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ইত্যাদি সংস্কৃতিও বিদ্যমান। আবার এসব সংস্কৃতি যে শুধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ তা নয়, বাংলাদেশের বাইরে বহির্বিশ্বের যেসব অঞ্চল বা দেশে এসব ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে, সেসব এলাকায়ও এসব সংস্কৃতি পরিদৃষ্ট হয়।

www.pathagar.com

যেমন হিন্দু সংস্কৃতি বাংলাদেশের বাইরে ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত। বৌদ্ধ সংস্কৃতি বাংলাদেশের বাইরে সর্বত্রই কমবেশী বিরাজমান।

এখানে আমরা বিশেষভাবে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব। ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি ইসলাম। এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে পরিগঠিত যে সংস্কৃতি মূলত সেটাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলাম যেমন স্থান-কাল-আবহাওয়া-বর্ণ-গোত্র নিরপেক্ষ সর্বজনীন ও সর্বকালীন সম্পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, ইসলামী সংস্কৃতিও তাই। ইসলামী সংস্কৃতি বিনির্মাণে ইসলামী আদর্শ ও জীবন-চেতনাই প্রধান, স্থান-কাল-আবহাওয়া-বর্ণ-গোত্রের প্রভাব সেখানে আদৌ নেই তা নয়, কিন্তু তা অতিশয় গৌণ। আদর্শগত জীবন-চেতনাই সেখানে সাংস্কৃতিক জীবন ধারা বিনির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

মানুষের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষ ছাড়া সংস্কৃতির কল্পনা করাই অসম্ভব। গাছের সাথে ফুলের যেমন সম্পর্ক, জীবনের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্কও অনুরূপ। ফুল যেমন গাছের রসে পল্লবিত, কুসুমিত, সুরভিত হয় জীবনের রসেও তেমনি প্রাণ পায় সংস্কৃতি। জীবনের উদ্ভব যখন থেকে, সংস্কৃতির উদ্গমও ঘটেছে তখন থেকেই। প্রথম মানুষ হযরত আদমকে (আ) সৃষ্টির পর আল্লাহ তাঁর মনের অবস্থা উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গিনী রূপে হযরত হাওয়াকে (আ) সৃষ্টি করলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন : "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর রূম : ২১ আয়াত)

সুরুচি, সৌন্দর্য ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই সংস্কৃতির বীজ অংকুরিত হয়, উপরোক্ত আয়াতে তারই ইংগিত রয়েছে। হযরত আদমকে (আ) সৃষ্টির পর তাঁর মধ্যে শান্তি, স্বস্তি নর-নারীর এ মিলিত জীবন-যাত্রার সংঘাত-বৈচিত্র্য ও প্রেম-ভালবাসা-সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবনেই মানব সংস্কৃতির প্রথম উদ্গাম ও বিকাশ। এ সম্পর্কে আরো ইরশাদ হয়েছে :

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা আন নিসা : ১ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে একজন মানুষ থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি, তা থেকে বহু মানব-মানবী সৃষ্টি, তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন তৈরি, স্বজন-জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-প্রতিবেশি তথা ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর মানব সমাজের বিস্তার এবং অতঃপর সমগ্র মানবজাতির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, লেন-দেন, আদান-প্রদান, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত রয়েছে এর সব কিছুই সংস্কৃতির মূল উপাদান। এভাবে সর্বপ্রথম যে মানব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা ছিল অবশ্যই ইসলামী সংস্কৃতি। কেননা প্রথম মানব হযরত আদম (আ) ছিলেন

www.pathagar.com

মুসলমান এবং আল্লাহর প্রেরিত প্রথম নবী। তাঁর মাধ্যমে মানব সমাজে প্রথম যে সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে রূপ ও প্রকৃতিতে তা ছিল অবশ্যই ইসলামের প্রাণ-রসে জারিত ও সঞ্জীবিত। এদিক দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতি হলো সর্বপ্রাচীন সংস্কৃতি। অন্য সকল সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে পরবর্তীকালে। বরং বলা যায়, ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবার ফলে পরবর্তীতে যেমন বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, অন্য সংস্কৃতিও তেমনি ইসলামী সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুতিরই ফল। তাহলে কথা দাঁড়ালো এই যে, প্রথম মানব-মানবী সৃষ্টির পর মহান স্রষ্টা তাঁদের জীবন পরিচালনার জন্য যে বিধান প্রদান করেন তার নাম ইসলাম। প্রথম মানব-মানবী ও তাঁর বংশধরদের জীবন যাপন পদ্ধতি, সামাজিক রীতি-নীতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান, জীবিকার্জন, গৃহাদি নির্মাণ, রন্ধন-পদ্ধতি, খাদ্য-খাওয়া, পোশাক-আশাক, জীবনের সাধ-আহ্লাদ ও আশা-অভীপ্সার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে প্রথম মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি। অতএব, মানুষের আদি, অকৃত্রিম ও শাশ্বত-সনাতন দীন যেমন ইসলাম মানুষের আদি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশও ঘটেছে তেমনি ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রভাবে, প্রথম মানুষ ও প্রথম নবীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে। পরবর্তীতে মানুষ যেমন তাদের ধর্ম পরিবর্তন করে নতুন নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছে, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিও তেমনি নানা বর্ণ-সুষমায় বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিও বহুমাত্রিক ও বহুবর্ণিল হয়ে উঠেছে। যদিও এ বহুমাত্রিকতা ও বহুবর্ণিলতার মূল কারণ হলো বিচ্যুতি তবু মানবেতিহাসের এ মূল চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য যা বহুমাত্রিকতা ও বহুবর্ণিলতার জন্ম দিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সুন্দরভাবে, শালীনভাবে, রুচিসম্মতভাবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা থেকেই সংস্কৃতির উদ্ভব। এ আকাঙ্ক্ষার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল প্রথম মানব-মানবীর মধ্যেই। আল কুরআনেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। ইরশাদ হয়েছে :

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?' অতঃপর তারা সেটা (নিষিদ্ধ ফল) থেকে ভক্ষণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলো, ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো।" (সূরা আত ত্বহা : ১২০-১২১ আয়াত)

শয়তানের কুমন্ত্রণায় হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) আল্লাহ তাআলার হুকুম বিস্মৃত হয়ে যে অন্যায় কাজ করলেন তার ফলে তাঁদের লজ্জাস্থান নিজেদের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়লো, কারণ জান্নাতে তাঁরা ছাড়া অন্য কোন লোক ছিল না। এর পরেই জান্নাতের বৃক্ষ পত্র-পল্লব দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করে নিলেন। লজ্জা নিবারণের জন্য এ আচ্ছাদনের আশ্রয় নেয়ার মধ্যে যে সুরুচি, শালীনতা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, সংস্কৃতির প্রথম উদ্ভব তার মধ্যেই নিহিত। কুরুচি, অসুন্দর ও অশালীনতার বিরুদ্ধে মানুষের যে আদিতম ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগত সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষার বিকাশ, সংস্কৃতির বিকাশ সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত থেকেই।

www.pathagar.com

সংস্কৃতির আদি বিকাশ ও ইসলামী সংস্কৃতির আসল পরিচয় সংক্ষেপে প্রদানের পর এবার ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি বা উপাদান সম্পর্কে আলোচনা পেশ করার প্রয়াস পাব।

ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি বা উপাদান

ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি বা উপাদান হলো তিনটি : তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিনটি মূল ভিত্তি বা উপাদানই হলো আকীদা-বিশ্বাসগত। বাহ্যিক ও বস্তুগত কোন বিষয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। তাহলে বাহ্যিক বা বস্তুগত কোন উপাদান ইসলামী সংস্কৃতির বিনির্মাণে কার্যকর কোন ভূমিকা রাখে কি না সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। নিঃসন্দেহে এর উত্তর হাঁ-বাচক। তবে সেটা মুখ্য নয়, গৌণ।

উপরোক্ত তিনটি মূল ভিত্তি বা উপাদানের মাধ্যমেই ইসলামী সংস্কৃতি তথা পৃথিবীর আদিম মানব-সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ এবং এ তিনটি মূল ভিত্তির উপর নির্ভর করেই যুগে যুগে এক স্বতন্ত্র জীবনধারা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানব সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি যা ইসলামী সমাজ ও ইসলামী সভ্যতা নামে পরিচিত হয়েছে। তাই ইসলামী জীবনাদর্শ, সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হলে উপরোক্ত তিনটি মূল ও উপাদান সম্পর্কে প্রথমেই অবহিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাওহীদ

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, হুকুমকর্তা, পালনকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মালিক, সকল কিছুর নিয়ন্তা। তাঁর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। তিনি সকল অভাব ও দুর্বলতার উর্ধ্বে। তিনি জীবন-মৃত্যু, কিয়ামত-আখিরাত, আসমান-যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর কোন শরীক নেই, বিশ্বজগতের সৃষ্টিও তাঁর নিয়ন্ত্রণে, তাঁর কোন সাহায্যকারীই প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ বলেন :

"আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (সূরা আল মায়িদা : ১২০ আয়াত)

ইরশাদ হয়েছে :

"বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন– সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকেই জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস)

এ সম্পর্কে আরো কয়েকটি আয়াত :

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।" (সূরা আত তাওবা : ১১৬ আয়াত)

www.pathagar.com

"এই যে তোমাদের জাতি (মানব জাতি), এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমার ইবাদাত কর।" (সূরা আম্বিয়া : ৯২ আয়াত)

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা।" (সূরা আল বাকারা : ১১৭ আয়াত)

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধীষ্ঠ-বিশ্ববিধাতা। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর।" (সূরা আল বাকারা : ২৫৫ আয়াত)

আশরাফুল মাখলুকাত হবার ফলে অন্য সকল সৃষ্টির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অন্য সকল সৃষ্টিকে আল্লাহর মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। এটা মানুষের প্রতি আল্লাহ এক অপরিসীম রহমত ও নিয়ামত। ইরশাদ হয়েছে :

"তিনি আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যেন তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ কর এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী হয়ে (নিজ নিজ কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করছে) এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে।" (সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৩ আয়াত)

"তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয়কে।" (সূরা হজ্জ : ৫৬ আয়াত)

অতএব, এটাই সঙ্গত যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করবে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে। তাই ইরশাদ হয়েছে :

"তারা আদিষ্ট হয়েছে আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে, সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দীন।" (সূরা আল বাইয়েনা : ৫ আয়াত)

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।" (সূরা বাইয়েনা : ৭ আয়াত)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, আল্লাহ সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করেছেন এই শর্তে যে, মানুষ যখন ঈমান এনে সৎকর্ম করে কেবল তখনই তার মধ্যে এই শ্রেষ্ঠত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়। অন্যথায় এ মানুষই নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হতে পারে। সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে (দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়ে), অতঃপর আমি তাকে হীনগ্রস্তদের মধ্যে হীনতমে পরিণত করি– (কর্মদোষে তাদের এরূপ পরিণতি ঘটে) কিন্তু তাদের নয়, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, এদের জন্য আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।" (সূরা আত তীন : ৪-৬ আয়াত)

এতসব যুক্তির অবতারণা করার পর আল্লাহ সহজ-স্বাভাবিকভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির নিকট প্রশ্ন রাখেন :

www.pathagar.com

"তারা কি চায় আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কোন দীন? যখন আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছু স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তার নিকট আত্মসমর্পণ করছে! আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ৮৩ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা তাঁর একত্ববাদ (তাওহীদ), সার্বভৌমত্ব ও জাত-ছিফাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কিত আরো অনেক সূরা, আয়াত উদ্ধৃত করা যায়। তবে কলেবর বৃদ্ধি না করে নিম্নোক্ত কয়েকটি আয়াতের প্রতি আগ্রহী পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেই এ প্রসঙ্গে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই : সূরা আল আন্‌আম : ৭৩, ১০২, সূরা আল আ'রাফ : ৪৫, সূরা আল বাকারা : ১৫, সূরা মরিয়ম : ৬৫, সূরা হাশর : ১২, সূরা ফাতির : ৪০-৪১, সূরা যুমার : ৬২-৬৩, সূরা মুমিন : ৬২-৬৮ প্রভৃতি। এসব আয়াতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্নভাবে তাওহীদ বা একত্ববাদের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা। তাঁর এ সৃষ্টি কর্মে ও তাঁর নিয়ন্ত্রণে তিনি সার্বভৌম ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন সাহায্যকারীরও প্রয়োজন নেই। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশীল, সকলেই তাঁর অধীন, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। অতএব, আমাদের সকল ইবাদাত, প্রশংসা ও মুনাজাত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষ ব্যতীত অন্য সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর হুকুম মেনে চলে। মানুষের জন্য আল্লাহ এক পরিপূর্ণ, নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন সে বিধান মত চলার অথবা না চলার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। তবে আল্লাহর বিধান মানলে কী শুভ পরিণতি আর না মানলে কী মন্দ পরিণতি তাও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের জন্য এটাই পরীক্ষা। ভাল অথবা মন্দ পরিণতির কথা ভেবে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মানুষের। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা আকল আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। এ জ্ঞান কতটুকু সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে– এ জ্ঞানের পরীক্ষাতেই ফেরেশতাকুল আদি মানব হযরত আদমের (আ) নিকট হেরে গিয়েছিলেন। সেই জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্ব পেয়েই মানবজাতি আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত। এ আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা মানব জাতির জন্য আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন, তার নাম ইসলাম। এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ :

"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯ আয়াত)

এ সম্পর্কে আল্লাহ আরো সুস্পষ্টভাবে বলেন :

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আলে ইমরান : ৮৫ আয়াত)

এভাবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার নামই তাওহীদ বা একত্ববাদ। এ তাওহীদে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত জীবনায়নের ফলে যে সংস্কৃতির জন্ম হয়, সেটাই ইসলামী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি নির্মাণে তাওহীদে বিশ্বাস ও সে বিশ্বাসানুগ জীবন যাপন একান্ত অপরিহার্য।

www.pathagar.com

রিসালাত

দ্বিতীয়ত: সৃষ্টির প্রদোষকাল থেকে পৃথিবীতে যুগে যুগে স্রষ্টার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান সংবলিত ঐশী কিতাব নাযিল হয়েছে। রিসালাতের এ ধারা প্রথম মানব হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আখিরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। নবী-রাসূলগণ শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, সেই বিধান অনুযায়ী তাঁরা নিজেরা এবং তাঁদের অনুসারীদের জীবন পরিচালনা ও সে বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ও কেউ কেউ রাষ্ট্র পরিগঠন ও পরিচালনা করেছেন। তার ফলে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ওহীভিত্তিক সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার পত্তন ঘটেছে যুগে যুগে দেশে দেশে। বিশেষ করে আখিরী নবী তাঁর উপর নাযিলকৃত আল কুরআনের ভিত্তিতে এক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সামজ ও রাষ্ট্র গঠন করে এক নতুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি জগদ্বাসীকে উপহার দেন। মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজ বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এ পরিবর্তন জীবন ও সমাজের সকল দিককে স্পর্শ করেছে। এর ভিত্তিতে পরিগঠিত যে সংস্কৃতি তাই ইসলামী সংস্কৃতি। এ সমাজ ও সংস্কৃতি পরিগঠনে রাসূলের (সা) ভূমিকা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

"আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি আমাদের আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেন।" (সূরা আল বাকারা : ১৫১ আয়াত)

আল্লাহ্ আরও বলেন :

"তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩২ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা) আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। কথাটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা রাসূলের (সা) মাধ্যমেই আল্লাহকে চিনেছি, রাসূলের (সা) মাধ্যমেই আল্লাহর দীন তথা আল কুরআন মানব জাতির নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর মনোনীত বান্দা রাসূলই (সা) কীভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, তা শিখিয়েছেন। অতএব রাসূলের আনুগত্য অপরিহার্য। অন্য কথায়, রাসূলের আনুগত্য অর্থই প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মুসলমানের যিন্দেগী। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, রাসূলের (সা) আনুগত্য ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য, ইসলামের অনুসরণ বা প্রকৃত মুসলমান হওয়া সম্পূর্ণ কল্পনা-বিলাস মাত্র। কেননা, আল্লাহর অস্তিত্ব, ইসলামের বিধান, মুসলমানিত্ব ও রিসালাত এসবকিছু এক ও অবিভাজ্য বিষয়।

নবী-রাসূলগণ আল্লাহর মনোনীত বান্দা। তাঁদের একমাত্র কাজ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেয়া এবং সেই দীন অনুযায়ী মানুষের জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাই আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত নিজের মনগড়া কোন কথা বলার বা কাজ করার কোন অধিকার তাদের দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ বলেন :

www.pathagar.com

"তোমরা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রতি যা ওহী হয় তারই অনুসরণ কর।" (সূরা আনআম : ১০৬ আয়াত)

আল্লাহ বলেন : "তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি এর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন (দীনের বিধানসমূহ) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।" (সূরা আল মায়িদা : ৪৮ আয়াতের আংশিক)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ রয়েছে তাওরাত ও ইনজীলে, যা তাদের লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয়, যা তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার উপর ঈমান আনে, তাকে সম্মান দেয়, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর (আল কুরআন বা ইসলাম) তার সাথে নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।" (সূরা আল আ'রাফ : ১৫৭ আয়াত)

আল্লাহ তাঁর মনোনীত এই মহান রাসূল (সা) সম্পর্কে বলেন :

"তুমি অবশ্যই সর্বোত্তম চরিত্র বিশিষ্ট।" (সূরা আল কালাম : ৪ আয়াত)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন : "হে রাসূল! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সারা জাহানের জন্য রহমতস্বরূপ।" (সূরা আল আ'রাফ : ১৫৮ আয়াতের আংশিক)

রিসালাতের অর্থ ও তাৎপর্য এবং রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্যই নজীর হিসাবে উপরোক্ত কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো। রিসালাতের উপর বিশ্বাস এবং নবীর অনন্য জীবনাদর্শের প্রভাব এত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী যে, এর ফলে পৃথিবীতে এক নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও যুগান্তকারী কল্যাণময় জীবন ধারা ও মানব সমাজের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়েছে। সন্দেহ নেই, এর রূপ ও পরিচয় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকেনি; ইতিহাসের গতিধারায় তা দেশে-দেশে, কালে-কালে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার মৌল শিক্ষা, রূপ ও পরিচয়ের উৎসধারা ইতিহাসের টানা-পোড়েন উপেক্ষা করে আজো সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রয়েছে। এ মূল উৎস হলো আল কুরআন ও আল হাদীস।

অতএব, তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের সাথে সাথে রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও ফরয এবং তা ইসলামী সংস্কৃতি পরিগঠন ও তার রূপায়ণে অপরিহার্য ভিত্তি রূপে গণ্য।

আখিরাত

তৃতীয়তঃ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ইসলামী জীবন ধারা তথা ইসলামী সংস্কৃতি পরিগঠনে অন্যতম অপরিহার্য ভিত্তি। জীবনের দুটি পর্যায়– ইহকাল ও পরকাল। ইহকালীন জীবন ক্ষণস্থায়ী, পরকালীন জীবন অনন্ত। মৃত্যুর মাধ্যমেই পরকালীন

www.pathagar.com

জীবনের শুরু। ইহকালীন জীবনের কর্মফল অনুযায়ী পরকালীন জীবনে অপরিমেয় সুখ-শান্তি অথবা সীমাহীন আযাব ভোগ করতে হবে। মুমিনরা এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বলেই তাদের কাজ-কর্ম-আচরণ হয় সংযত। এ বিশ্বাস তাদের সমগ্র জীবনায়নকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে। আখিরাত বিশ্বাসী মুমিনের এ নিয়ন্ত্রিত, সংযত জীবনায়নের বিশিষ্ট দিকই ইসলামী সংস্কৃতির মৌল পরিচয়।

পরকালে অবিশ্বাসীরা দুনিয়ার জীবনকেই সবকিছু মনে করে– 'খাও, দাও এবং স্ফূর্তি কর'– এই নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুনিয়ার নানারূপ অনাচার করে বেড়ায়। যেহেতু তারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাই তারা দুনিয়ার কোন কাজ, কথা বা আচরণের জন্য সেখানে কোনরূপ জবাবদিহি করতে হবে বলেও মনে করে না। ফলে তাদের মধ্যে এক চরম দায়িত্বহীনতা ও বেপরোয়া মনোভাবের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এ ধরনের মনোভাবের কারণেই আজ সারা বিশ্বে অশান্তি, যুলুম-নির্যাতন, মারামারি, হানা-হানি, চুরি-ডাকাতি-লুণ্ঠন-অপহরণ, ঘুষ-দুর্নীতি, যেনা-ব্যভিচার, বেহায়াপনা-অশ্লীলতা, মানবতাহীন অনৈতিক কার্যকলাপ চলছে এবং দিন দিন তা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আখিরাতে জবাবদিহিতার চেতনা না থাকার কারণেই মানুষ এত দ্বিধা-সংকোচহীন বেপরোয়াভাবে এসব অমানবিক, অনৈতিক ও সমাজ-বিধ্বংসী কার্যকলাপ অবাধে পরিচালনা করতে পারছে।

অন্যদিকে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস মানুষের মধ্যে জবাবদিহিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করে। দুনিয়ার জীবনের সকল কাজ, কথা ও আচরণের জন্য আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে, তার পুংখানুপুংখ হিসাব হবে এবং এরপর বদলা হিসাবে অনন্ত সুখ-শান্তি পূর্ণ জান্নাত অথবা অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টপূর্ণ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে, এ বিশ্বাস ও ধারণা মানুষকে অবশ্যই দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করতে শেখায়, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে ও ভাল কাজে কাজে উদ্বুদ্ধ করে। আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা অবশ্যই তাদের কথা-কাজে-আচরণে হয় দায়িত্বশীল, সংযমী, নৈতিক বোধসম্পন্ন, অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল, ইনসাফপূর্ণ ও মহত্তম মানবিকবোধসম্পন্ন। প্রকৃতপক্ষে এরাই 'আশরাফুল মাখলুকাত' আর অন্যরা 'আসফালা সাফেলীন' বা হীনতমদের মধ্যে হীন-এর পর্যায়ভুক্ত হয়। বাহ্যিকভাবে তারা মানুষরূপী হলেও আমল-আখলাকের দিক থেকে তারা মানবতাহীন চরম অমানুষ। দুনিয়ার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে, আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে তারা ছলে-বলে-কৌশলে ফাঁকি দিয়ে নিজেদেরকে চরম সফল ও ভাগ্যবান মনে করে। কিন্তু আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে জানে দুনিয়ার কোন ব্যবস্থায়, আইন বা আদালতে সে অপরাধী সাব্যস্ত না হলেও আদালতে-আখিরাতে তার কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি তাকে পেতেই হবে। সর্বোচ্চ আল্লাহর চোখকে সে কখনো ফাঁকি দিতে পারবে না। তাই আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ নিজে থেকেই সতর্ক থাকে, আত্মসংযমী হয়, নৈতিক-চেতনায় সমৃদ্ধ উন্নত চরিত্রের অধিকারী বিবেকবান মানুষে পরিণত হয়। এ আখিরাতের বিষয়ে আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

"বস্তুত যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করতো।" (সূরা আল আ'রাফ : ১৪৭ আয়াত)

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন : "তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন, তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।" (সূরা আল বাকারা : ২৮ আয়াত)

আখিরাতের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন :

"হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী– সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (সূরা আল বাকারা : ৮১-৮২ আয়াত)

এভাবে আল্লাহ্ তাআলা আখিরাতের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আখিরাতে বিশ্বাসী লোকেরা আখিরাতের কথা স্মরণ করে দুনিয়ায় অনেক পাপ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকে, ভাল কাজে সচেষ্ট হয়, জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলে। আর সুন্দর ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার মধ্যেই তো সুস্থ-সুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতির জন্ম ও বিকাশ ঘটে থাকে। তাই এ সৌন্দর্যবোধ, সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-চেতনা ও কল্যাণকামিতা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হলো তিনটি– তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। সংক্ষেপে এ তিনটি মূলনীতি বা মূলভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এ মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি। তবে মূলনীতি ছাড়া ইসলামের আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় এবং শরীয়তেরও একটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে ইসলামী সংস্কৃতি পরিগঠনে। সংক্ষেপে এগুলো সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো।

ইসলামী সংস্কৃতি পরিগঠনে অন্যান্য উপাদান

এক. আল্লাহর প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণ

আল্লাহর প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ও সামষ্টিক জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও শৃঙ্খলাবোধ জন্মে। ফলে ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে তার ইতিবাচক প্রভাব ও প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। মুমিন জীবনের তথা মুসলিম সমাজের এ ইতিবাচক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ বা তাওহীদে বিশ্বাসের কারণে মানুষে মানুষে একাত্মবোধ, ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব, সাম্য-সংহতি ও সম্প্রীতির উদার, মানবিক ভাব সৃষ্টি হয়। ইসলামী সংস্কৃতির এটা এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর ফলে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির তথা আল্লাহর প্রতি মানুষের, মানুষের প্রতি অন্য মানুষের তথা অন্য সকল সৃষ্টি, জীব জগত, প্রাণী জগত, প্রকৃতি জগত, এমনকি সৌর জগতের প্রতি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি মানুষকে অত্যন্ত দায়িত্বশীল মাখলুকাতের মর্যাদা

www.pathagar.com

দান করেছে। মানুষকে সকল ক্ষুদ্রতা, নীচতা ও সংকীর্ণতা থেকে অনেক উর্ধ্বে তুলে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলামী সংস্কৃতি বিনির্মাণে এটা মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

দুই. শুচিতা বা পবিত্রতা

ইসলামী সংস্কৃতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বা উপাদান হলো শুচিতা বা পবিত্রতা। আল্লাহ নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। পবিত্রতা বলতে বাহ্যিক বা দৈহিক, অন্তরের বা মনের-এ উভয় প্রকার পবিত্রতাই বুঝায়। ইসলাম এ উভয় প্রকার পবিত্রতার উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। ইবাদতের জন্য যেমন পবিত্রতা দরকার তেমনি খাদ্য-খাওয়া, পোশাক-আশাক, জীবিকার্জন, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পবিত্রতা বা বিশুদ্ধিতার উপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

সূরা আল আ'রাফের ২৮-২৯, ৩২-৩৩ নম্বর আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ পবিত্রতা সাধন ও অশ্লীলতা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া, অন্যান্য আরো বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াতে পবিত্রতা সাধনের উপর জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূলের (সা) শিক্ষায়ও তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে। এখানে দু'টি হাদীসের উল্লেখ করা হলো :

হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বর্ণিত অন্য একটি হাদীসের প্রথম বাক্যটি এরূপ : 'পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।' (সহীহ মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে : 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামাযই কবুল হয় না।' (জামে আত তিরমিযী)

অনুরূপ আরো বহু হাদীসে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হাসিলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অতএব, আল্লাহর কালাম ও রাসূলের (সা) শিক্ষা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম মানুষকে সব রকম অপবিত্রতা, অশ্লীলতা, কদর্যতা, গর্হিত ও অরুচিকর বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়। ফলে ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শুচি-শুভ্র, পাক-পবিত্র, শ্লীল ও সুরুচিসম্পন্নতা, যা সুস্থ, স্বাভাবিক, মানবিক মহত্তম প্রবৃত্তির পরিপোষক। অন্য কথায়, যা অপবিত্র, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ইসলাম তা কখনো অনুমোদন করে না, ইসলামী সংস্কৃতিরও তা অংশ হতে পারে না।

তিন. সংস্কারমুক্ত সত্যসন্ধিৎসা

ইসলামী সংস্কৃতি সকল কুসংস্কার, কুপ্রথা, অন্ধবিশ্বাস, কূপমণ্ডুকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাওহীদ বা একত্ববাদের বিপ্লবী ঘোষণা দুনিয়ার ছোট-বড় সকল মিথ্যা, বানোয়াট খোদায়ী ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সকল মিথ্যা, কুসংস্কার, কুপ্রথা ও অন্ধ-বিশ্বাসের বিবরণ থেকে মানবতাকে শাশ্বত, চিরন্তন মুক্তির আলোকিত দিগন্তে নিয়ে এসেছে। তাওহীদের বিশ্বজনীন, চিরন্তন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ তার আপন সত্তা বিকাশে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু এ স্বাধীনতার সাথে একটি দায়িত্ববোধও জড়িত। দুনিয়ায় মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করার সাথে সাথে তাকে

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের বা খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন :

"আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করতে চাই।" (সূরা আল বাকারা : ৩০ আংশিক)

মহান স্রষ্টার এ ঘোষণা মানুষের জন্য একদিকে যেমন অত্যন্ত গৌরব ও মর্যাদার অন্যদিকে, তেমনি গুরু দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। গৌরব ও মর্যাদা এজন্য যে, সমগ্র আসমান-যমীনের যিনি স্রষ্টা, মালিক ও নিয়ন্ত্রক তাঁর খলীফা হবার মত গৌরব ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে অন্য কোন সৃষ্টিকে এ মর্যাদা দেয়া হয়নি। এ মর্যাদাপ্রাপ্তির সাথে সাথে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার প্রশ্নও জড়িত। প্রতিনিধিত্বের অর্থই হলো যাঁর প্রতিনিধিত্ব করা হয় তাঁর নির্দেশের বাইরে কিছু না করা এবং সে নির্দেশ যথাযথভাবে এবং যোগ্যতার সাথে পালন করা এবং সে ব্যাপারে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

"যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎ পথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।" (সূরা আল বাকারা : ৩৮ আয়াত)

আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাবের মাধ্যমেই এসব নির্দেশাবলী এসেছে, যারা তা অনুসরণ করেছে তারাই সফলকাম হয়েছে। আর যারা তা অনুসরণ করেনি তারাই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারা ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আল বাকারা : ২৭ আয়াত)

আল্লাহ দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি হবার দায়-দায়িত্ব এবং এর পরিণতি সম্পর্কে বলেন :

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।" (সূরা আল আনআম : ১৬৫ আয়াত)

আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেন :

"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (সূরা আল ফাতির : ৩৯ আয়াত)

অতএব, মানুষের কাজ হলো আল্লাহর খলীফা হিসেবে নিজের জীবনে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান বা নির্দেশ পালনের মাধ্যমে জীবন ও জগতকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তোলা। আল্লাহর বিধানে কোন অন্যায়, অসুন্দর, বিশৃঙ্খল, অরুচিকর ও অশ্লীল কিছু নেই। তাই আল্লাহর বিধান মান্যকারীরা তাদের পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের মাধ্যমে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতিরই জন্ম দিয়ে থাকে। অতএব, ইসলামী

www.pathagar.com

সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সুস্থ-সুন্দর, পূত-পবিত্র, শ্লীল ও সুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও জীবনধারা বিনির্মাণ ও পরিনিয়ন্ত্রণ যা সমগ্র মানব সমাজে শুভ ও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

চার. সৃষ্টি জগতের অন্তর্নিহিত সংহতি ও ঐক্য

তাওহীদ বা একত্ববাদ শুধু মানব জাতির মধ্যেই নয়, সৌর-জগত, প্রাণী জগত প্রকৃতি জগত তথা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে এক গভীর অন্তর্নিহিত সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টি করেছে। সকল সৃষ্টিই যেহেতু আল্লাহর, সবকিছুর পালন ও নিয়ন্ত্রক যেহেতু তিনি, সেহেতু সকল সৃষ্টির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক, পরস্পর নির্ভরশীলতা ও শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। এ পারস্পরিক সম্পর্ক, নির্ভরশীলতা ও শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে যে কোন সময় সমগ্র সৃষ্টি জগতে বিপর্যয় হতে পারে। তাই অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং পুংখানুপুংখভাবে এর নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা। সৃষ্টি, পালন ও নিয়ন্ত্রণ সবই এক, অদ্বিতীয়, অসীম ক্ষমতাধর মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর হাতে। এতে তাঁর শরীক নেই। অতএব, আনুগত্যও হবে একমাত্র তাঁরই প্রতি।

অতএব, সুস্পষ্ট হলো যে বিশ্ব জগত ও মানব জাতি মহামহিম স্রষ্টার এক সুপরিকল্পিত সৃষ্টি। এর একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করা যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, অন্য সকল সৃষ্টিকে মানুষের খিদমত বা কল্যাণে নিয়োজিত করাও তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। এ সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা, মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হওয়া, মানুষের প্রতি পরম দয়ালু ও দাতা রাব্বুল আলামীনের অপিরসীম অনুগ্রহের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা, সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল সৃষ্টি বিশেষত প্রকৃতি জগত ও প্রাণী জগতের প্রতি দয়াশীল ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য। এটা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা নিজের ইচ্ছায় মানুষ হয়ে জন্মাইনি, আমাদের ইচ্ছামত অন্য সকল সৃষ্টি আমাদের কল্যাণ সাধন ও প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত হয়নি। এসব কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা মত সম্পন্ন হয়েছে। তাই আল্লাহর প্রতি সকৃতজ্ঞ থেকে তাঁর দেয়া নিয়ামতের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা আমাদের কর্তব্য। আর এ কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায়ের পথ হলো আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করা ও অন্য সকল সৃষ্টির প্রতি যথাযথ আচরণ করা। এ আচরণের ফলশ্রুতিতেই গড়ে ওঠে ইসলামী সংস্কৃতি।

পাঁচ. ইসলামী শরীয়ার ভূমিকা

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ, পরিগঠন ও রূপরেখা নির্মাণে ইসলামী শরীয়াহ বা সামাজিক অনুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচার-শাসন ইত্যাদি সামগ্রিক জীবনের বিধান বা নীতিমালা প্রদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে এসবের ফলিত রূপই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী শরীয়াহ বা সামাজিক অনুশাসনের মূলভিত্তি হলো আল

www.pathagar.com

কুরআন ও রাসূলের (সা) সুন্নাহ। আল কুরআনের ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূল (সা) যে আদর্শ সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, সেটাই হলো ইসলামী সমাজের মডেল এবং সে সমাজে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল সেটাই ইসলামী সংস্কৃতির আদর্শ রূপরেখা।

ছয়. ঈমান ও আমলের গুরুত্ব

ইসলামে ঈমান এবং আমল পরস্পর সম্পূরক। এর একটি ব্যতীত অন্যটি অর্থহীন। ঈমানের স্থান অবশ্য সর্বাগ্রে। ঈমান আনার পর সে অনুযায়ী আমল করা ঈমানের দাবি। ঈমান অনুযায়ী আমলের দ্বারাই মানুষ হয় সৎকর্মশীল, সদাচারী, ইনসানে কামিল বা প্রকৃত মানুষ। ঈমানদারকে আল্লাহ সৎকর্মশীল হওয়ার তাকিদ দিয়েছেন। আল কুরআনের সূরা বাকারার ২৫, ৮২, ১৩৭ ও ২৭৭ নম্বর আয়াতসমূহ এবং অন্যান্য সূরার বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ ঈমান আনার পর বান্দাকে সৎকর্ম করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার শুভ পরিণামেরও সুসংবাদ দিয়েছেন। এতে ব্যর্থ হলে তার মন্দ পরিণতির কথাও কোথাও কোথাও উল্লেখ করেছেন। সৎকর্ম, সুচিন্তা, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি ঈমানদারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুধু নিজে এগুলোর অনুশীল করাই যথেষ্ট নয়, অন্যদেরকেও এসব ব্যাপারে উপদেশ দেয়া ও উদ্বুদ্ধ করা কর্তব্য। ইরশাদ হয়েছে :

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ (জাতি), মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।" (সূরা আলে ইমরান : ১১০ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো : সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি, অসৎকর্মের প্রতি বিরাগ সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি অবিচল ঈমান– এই হলো মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় কর্তব্য আর এ জন্যই তারা শ্রেষ্ঠ জাতি। অন্য সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি এটাই। এ সৎকর্মশীল, ঈমানদার জাতিকে আল্লাহ আল কুরআনের এক স্থানে 'মধ্যপন্থী' জাতিরূপে আখ্যায়িত করেছেন। (সূরা আল বাকারা : ১৪৩) এ মধ্যপন্থী, সত্যনিষ্ঠ, সৎকর্মশীল, যুক্তিনিষ্ঠ (rational) ও জ্ঞানান্বেষী জাতি সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

"দীন সম্পর্কে জবরদস্তি নেই; সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট।" (সূরা আল বাকারা : ২৫৫ আয়াত)

আল্লাহর দীনের সত্যতা সূর্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের পক্ষেই তা উপলব্ধি করা সহজ। কিন্তু এরপরও যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃতি জানায় তবে তার উপর জবরদস্তি করা অর্থহীন। তাই আল্লাহ বলেন :

"দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলো না।" (সূরা আন নিসা : ১৭১ আয়াত)

এসব শিক্ষার দ্বারা মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে যে নৈতিক মান, সত্যনিষ্ঠ, সামাজিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তার সমন্বয়েই গড়ে ওঠে ইসলামী সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

অর্থাৎ ইসলামী সংস্কৃতি পরিগঠনে সৎকর্মশীলতা, সত্যনিষ্ঠা এবং উন্নত নৈতিক দৃষ্টিকোণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর বিপরীতে যা কিছু রয়েছে, তাকে অন্য যাই কিছু বলা যাক, ইসলামী সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা যায় না।

সাত. ইসলামী সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

ইসলামী সংস্কৃতির একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) যে জীবন বিধান মেনে চলতেন, তার ভিত্তিতে যে জীবনধারা গড়ে ওঠে ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে, যুগ-যুগান্তের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে বিশ্বের দেড়শো' কোটি মুসলমানের জীবন সেই একই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ধারণা ভিত্তিক জীবনবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারার অনুবর্তন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থান ও গোত্রের জন্য অসংখ্য নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁদের মাধ্যমে আসমানী কিতাব ও নির্দেশনা অবতীর্ণ হবার ফলে এ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থেকেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন নবী-রাসূলের যমানায় স্থানিক ও কালিক প্রয়োজনে শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছুটা তারতম্য ঘটলেও তাঁদের সকলের প্রচারিত দীন বা মূল শিক্ষা ছিল অভিন্ন। আখিরী নবী হযরত মুহাম্মাদের (সা) মাধ্যমে সে দীনকে পরিপূর্ণ, সংহত, সর্বকালীন, সর্বজনীন শাশ্বত রূপ দেয়া হয়েছে। আখিরী নবীর (সা) শরীয়তকে সর্বজনীন ও সর্বকালীন করা হয়েছে। তবে স্থানিক ও কালিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে ইজতিহাদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে ইসলামী জীবনধারা ও সংস্কৃতির মধ্যে দেশ-কাল-বর্ণ-গোত্রের পার্থক্য সত্ত্বেও এক অবিভাজ্য জীবন-চেতনার রূপায়ণ ঘটেছে। একে ইসলামী সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক, চিরন্তনত্ব ও বিশ্বজনীনতা বলা যায়, যেটা বিশ্বের অন্য কোন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অন্য সকল সংস্কৃতি কম-বেশী আঞ্চলিকতা, ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও কালিক প্রভাবে আক্রান্ত।

তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী সংস্কৃতি আর মুসলমানদের সংস্কৃতি সর্বদা এক নয়। ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি ও উপাদান সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তার নিরিখেই ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তি নিরূপিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। অন্যদিকে, ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা লক্ষ্য করি যে, মুসলমানদের মাঝে-মধ্যে পদস্খলন ঘটেছে। পদস্খলিত মুসলিম সমাজ ইসলামী আদর্শ থেকে যতটুকু বিচ্যুত হয়েছে, ঐ পরিমাণেই তাদের সংস্কৃতিও ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন। অনেকে এ ধরনের সংস্কৃতিকে তাই ইসলামী সংস্কৃতি না বলে মুসলিম সংস্কৃতি নামে অভিহিত করতে চান। সেটা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

আট. ইসলামী সংস্কৃতির গতিশীলতা

ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটা এক স্বচ্ছ, উদার, গতিশীল জীবন-চেতনার প্রাণবন্ত বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিণতির কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। ইরশাদ হয়েছে :

www.pathagar.com

"তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান (অর্থাৎ প্রথমে মাতৃগর্ভে, এরপর দুনিয়ার জীবন, অতঃপর কবরের জীবন– এগুলি সবই নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য বা স্বল্পকালীন বাসস্থান, এরপর কর্মফল অনুযায়ী জান্নাত বা জাহান্নাম হলো মানুষের দীর্ঘকালীন স্থায়ী বাসস্থান) রয়েছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি বিশদভাবে বিবৃত করি।" (সূরা আল আনআম : ৯৮ আয়াত)

অপর একটি আয়াতে :

"আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজরাত : ১৩ আয়াত)

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমগণ্য করবো? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করবো?" (সূরা সাদ : ২৮ আয়াত)

মানবজাতির সৃষ্টি, সম্প্রসারণ, মর্যাদা ও পরিণতি সম্পর্কে আল কুরআনে উপরোক্ত আয়াতসমূহ ইসলামী জীবনধারা ও সংস্কৃতি পরিগঠনে একান্ত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ইসলামী সংস্কৃতি এমন একটি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত, যার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ-ভীতিপূর্ণ সদাচার। ইসলামে বর্ণ-গোত্র-পদ-সম্পদ ইত্যাদির দ্বারা সামাজিক বা মানবিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় না, তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতিই সেখানে মর্যাদার মাপকাঠি। এ সম্পর্কে আল কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূলও এর প্রতিধ্বনি করেছেন। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক বাণীতে তিনি বলেন : "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে চলে এবং তাঁর কথা বেশী স্মরণ রাখে। অতএব, কোন আজমীর উপর আরবের এবং কোন আরবের উপর আজমীর প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

ইসলাম তাকওয়াকে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি গণ্য করে বংশ-গোত্র-বর্ণ-অঞ্চলের ভেদাভেদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেছে। কুরআন ও সুন্নাহর এই বিপ্লবী ও সর্বজনীন মানবিক শিক্ষাই ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম বুনিয়াদ।

নয়. হালাল-হারামের বিধানই ইসলামী সংস্কৃতির সীমারেখা

ইসলামী সংস্কৃতির অন্য একটি প্রধান বুনিয়াদ হলো ইসলাম নির্দেশিত হালাল হারামের সীমারেখা। ইসলামে হালাল বা বৈধতার সীমারেখা যেমন সুস্পষ্ট, হারাম বা নিষেধাজ্ঞার সীমারেখাও তেমনি সুস্পষ্ট। এটা একটি ব্যাপক বিষয় জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় হতে বৃহত্তর সকল ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সমষ্টিগত সকল পর্যায়ে এই বিধি-বিধানের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের জীবন কম-বেশী এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ

www.pathagar.com

বিধি-নিষেধের গণ্ডী অত্যন্ত ব্যাপক বা সমগ্র জীবনকে কেন্দ্র করে এর মূল লক্ষ্য জীবনকে পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও শালীন করে তোলা। তাই সংস্কৃতির সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মুসলমানের খাদ্য-খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ-শাদী, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, নারী-পুরুষের চাল-চলন, আনন্দ-উৎসব, সামাজিক রীতি-নীতি, ইবাদাত-বন্দেগী ইত্যাদি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই হালাল হারামের বিধান বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

হালাল খাদ্য গ্রহণ ও হারাম খাদ্য পরিহারের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট নির্দেশ :
"হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর।" (সূরা আল বাকারা : ১৬৮ আয়াত)
ইরশাদ হয়েছে : "তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎকর্ম কর।" (সূরা আল মুমিন : ৫১ আয়াত)
এধরনের সাধারণ নীতিমালা বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যবস্তুর মধ্যে কোন্‌টি হালাল ও কোন্‌টি হারাম তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : সূরা আল বাকারা ১৭৩, সূরা আন'আমের: ১৪১-১৪২, ১৪৫-১৪৬, সূরা আল আ'রাফের : ১৫৭, সূরা আন নাহলের : ১১৪-১১৫, সূরা মায়িদার : ৩-৫, সূরা তা'হার : ৮১ নম্বর আয়াতসমূহ। এছাড়া, মহানবীর (সা) অসংখ্য হাদীসে খাদ্যবস্তুর হালাল হারাম হওয়ার বিষয়, বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটা ইসলামী সংস্কৃতির এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান। খাদ্য-খানার ব্যাপারে হালাল হারামের বিধান মানা মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। ফলে অমুসলমানের খানা থেকে মুসলমানের খানা বহুক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের। এমনকি, পরিবেশনা ও খাদ্যগ্রহণ রীতির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এগুলোও সংস্কৃতির অপরিহার্য বিষয়।

দশ. পোশাক-পরিচ্ছদ ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

পোশাক-পরিচ্ছদ সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অংশ। পোশাক-পরিচ্ছদ সভ্যতারও অঙ্গ। নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের পর প্রথম মানব-মানবী জান্নাতে বৃক্ষের পত্র-পল্লব দ্বারা লজ্জা নিবারণের যে ব্যবস্থা করেন, যুগে যুগে দেশে দেশে সে প্রক্রিয়ায় অনেক পরিবর্তন-বিবর্তন-নতুনত্ব এসেছে। কিন্তু তার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় রয়েছে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এ মূলনীতি অনুযায়ী পোশাক-আশাকের উদ্দেশ্য কেবল লজ্জা নিবারণই নয়, মার্জিত রুচিবোধ, সুস্থ-স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাবের বিকাশোপযোগী পোশাক-আশাক ইসলাম অনুমোদন করে থাকে। এ সম্পর্কে আল কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ :
"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং পরহিজগারীর পোশাক, এটা সর্বোত্তম।" (সূরা আল আ'রাফ : ২৬ আয়াত)
এখানে পোশাকের তিনটি প্রয়োজন ও গুরুত্বের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ

www.pathagar.com

নারী-পুরুষ উভয়ের লজ্জাস্থান আচ্ছাদন। দ্বিতীয়তঃ সাজ-সজ্জা বা বাহ্যিক দেহাবয়বকে রুচিকরভাবে সুসজ্জিত করা। এর দ্বারা একদিকে যেমন শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ইত্যাদি ঋতু বা প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে দেহকে রক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, অন্যদিকে তেমনি এর দ্বারা সুরুচি-শালীনতারও পরিচয় ফুটে ওঠে। তৃতীয়তঃ তাকওয়া বা পরহিজগারীর পোশাককে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

তাকওয়া বা পরহিজগারী সাধারণত মানবীয় স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাকওয়া যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণ ও আল্লাহর নিকট তা অতিশয় পছন্দনীয় তা আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তাকওয়ার পরিচ্ছদ বা স্বভাব-বৈশিষ্ট্য যে সর্বোত্তম তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ পোশাকের সাথে একে সম্পর্কযুক্ত করার অর্থ আপাতঃদৃষ্টিতে উপলব্ধি করা কঠিন। মূলত এটা এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করে। তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি মানবীয় স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, চিন্তা-চেতনা ও আমলের সাথে এমনভাবে জড়িত যে, পোশাক-পরিচ্ছদের মতই তা জরুরী ও যার দ্বারা মানুষের বাহ্যিক পরিচয় ফুটে ওঠে। পোশাক-পরিচ্ছদের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বভাব-বৈশিষ্ট্য এমনকি, আমল-আখলাকের পরিচয়ও বহুলাংশে ফুটে ওঠে। তাই এর সাথে তাকওয়াকে সম্পর্কিত করা একান্ত সঙ্গত রয়েছে। কেননা তাকওয়া অন্তরের ক্ষেত্রে যেমন, বহিরঙ্গ ক্ষেত্রে তেমনি গুরুত্ব বহন করে। সূরা আল আ'রাফের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন :

"হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমন অবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলে দিয়েছে– যাতে তাদের লজ্জাস্থান প্রদর্শিত হয়।" (সূরা আল আ'রাফ : ২৭ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, লজ্জাস্থান প্রদর্শন অত্যন্ত গর্হিত ও অবমাননাকর। এটা শয়তানের প্ররোচনার ফল। পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে কখনো অশিক্ষা-অসভ্যতার কারণে, আবার কখনো ধর্ম এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে মানুষ নগ্নতার শিকার হয়েছে। হিন্দু ধর্মের অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি, পৌরাণিক গ্রীক ও ইউরোপীয় দেব-দেবী, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ইত্যাদির মধ্যে এই নগ্নতাকে কখনো ধর্মীয় আবার কখনো শৈল্পিক নিদর্শন হিসেবে অন্ধ বিশ্বাস বা নান্দনিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মূলত এর মধ্যে না আছে ধর্মীয় মহিমা, না আছে কোন উন্নত রুচিবোধের প্রকাশ, যা নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিতে আদৌ গ্রাহ্য হতে পারে। একদিকে, সংস্কৃতির নামে নাচ-গান, সামাজিক অনুষ্ঠান, নাটক-সিনেমা ইত্যাদিতে নগ্নতা ও উলঙ্গপনার বেপরোয়া প্রতিযোগিতা চলছে, অন্যদিকে, আধুনিক ফ্যাশন ও পোশাকের নামে যে উলঙ্গপনা ও নির্লজ্জ বেহায়াপনার সগর্ব আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শনী চলছে তা সবই মূলত সেই ইবলিসী প্ররোচনারই আদিম ধারাবাহিকতা।

পক্ষান্তরে, ইসলাম শালীন ও ভদ্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ দেয়। ইসলাম পুরুষ ও নারী উভয়ের দৈহিক প্রয়োজন ও যথাযথ আব্রুর উপযোগী স্বতন্ত্র পোশাক পরিধানের

www.pathagar.com

নির্দেশ দিয়েছে। পোশাক থেকে যেন নারী-পুরুষের পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হয়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই পোশাক অর্থ 'সতর' ঢাকা। নারী ও পুরুষ উভয়ের সতরও ভিন্ন। নারীর সতর ঢাকার পরও তাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ :

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল আহযাব : ৫৯ আয়াত)

উপরোক্ত আয়াত থেকে পর্দার নির্দেশ পাওয়া যায়। পুরুষের সতর সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন :

নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান পুরুষের আওরাহ্ বা সতর।" (দারুল কুত্নী, বায়হাকী)

নারীর সতর সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন : "কব্জী থেকে হাতের অগ্রভাগ এবং মুখাবয়ব ব্যতীত দেহের সকল অংশ একজন মহিলার আওরাহ্ বা সতর।"

পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাসে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। পর্দার ব্যাপারে আরও দ্রষ্টব্য সূরা আহযাবের ৫৩-৫৫ আয়াতসমূহ এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বিভিন্ন হাদীস।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। বৈবাহিক বন্ধন ব্যতীত পর-নারী বা পর-পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা ইসলাম সমর্থন করে না। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ইসলাম সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও স্ত্রীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামপূর্ব যুগে যে সকল অমানবিক, অশ্লীল ও অনৈতিক কার্যকলাপ সংঘটিত হতো সূরা আন নিসার ১৯-২২নং আয়াতসমূহে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর সূরা আন নিসার ২৩নং আয়াতে যে সকল নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সঙ্গত নয় তার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী ২৪ ও ২৫নং আয়াতসমূহেও এর বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। এরপর সূরা আল আহযাবের ৪৯-৫০নং আয়াতসমূহেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, বৈবাহিক ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশের কারণে মুসলমানদের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যে স্বতন্ত্র, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং পাস্পরিক সম্ভ্রমপূর্ণ পরিচ্ছন্ন জীবনধারা সৃষ্টি হয়, তার ফলে যে সুস্থ সংস্কৃতির জন্ম হয়, প্রকৃতপক্ষে সেটাই ইসলামী সংস্কৃতি।

হাদীসে বলা হয়েছে :"আল-হায়াউ শু'বাতুম মিনাল ঈমান"– অর্থাৎ 'হায়া বা লজ্জা ঈমানের অংশ। (সহীহ আল বুখারী)

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয় যে, বেহায়াপনা বা লজ্জাহীনতা কোনভাবেই ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। ইসলাম সর্বদা এধরনের অনৈতিক বিষয় পরিহার করার নির্দেশ দেয়। লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা ক্রমান্বয়ে নৈতিক অধঃপতন ঘটায় এবং নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্ভ্রমের পর্দা উন্মোচন করে ব্যভিচারের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট

www.pathagar.com

করে। তাই আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে মুমিনদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন : "আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে।" (সূরা আন নূর : ৩০-৩১ আয়াত)

আল্লাহর এ নির্দেশ অমান্যকারীদের জন্য আল্লাহ কঠোর হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করেছেন : "যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ও যিনা প্রসার লাভ করুক তাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আন নূর : ১৯ আয়াত)

শরীরে উল্কি লাগানো, পরচুলা ব্যবহার, বিভিন্নভাবে শারীরিক বিকৃতি ঘটিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন ইত্যাদি বিষয় ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কিত একটি সহীহ হাদীস : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন সেসব নারীর উপর যারা অন্যের শরীরে উল্কি করে এবং যারা নিজেদের দেহে উল্কি করে। আর যারা ভ্রূ'র পশম উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাঁত সরু করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীস : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "সেই মহিলার প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে, যে নিজের মাথায় অন্যের চুল লাগায়, যে অন্য নারীর ভ্রূ'র পশম উপড়ায় এবং যে নিজের ভ্রূ'র পশম উপড়ায়।" (সুনানু আবী দাঊদ)

অন্য আরেকটি হাদীসে নবী করীম (সা) মহিলাদের মাথা ন্যাড়া করতে নিষেধ করেছেন। (সুনানু নাসাঈ)

উৎসব-আনন্দের ব্যাপারেও ইসলামের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। দুই ঈদ মুসলমানদের জন্য জাতীয় উৎসবের দিন। শবে কদর, শবে বরাত, ঈদে মিলাদুন্নবী ইত্যাদি ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনও বিশ্বব্যাপী মুসলমানগণ উদযাপন করে থাকে। কিন্তু এ সকল অনুষ্ঠান কখনো বল্গাহীন, অশ্লীল, বেপরোয়া, যৌন-উন্মাদনাকর পাশবিক আনন্দ-উৎসবে পরিণত হতে পারে না। বরং এসবই হয় স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, তাঁর প্রতি ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের ওছিলা। এগুলো সংযম, সুরুচি, শিষ্টাচার, মানবিক প্রেম-প্রীতি, সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং সর্বোপরি আল্লাহ-ভীতিপূর্ণ ঈমানী তাকাওয়ার প্রাণবন্ত প্রকাশ। ইসলামী সংস্কৃতির এটা এক উজ্জ্বল দিক।

অধুনা একশ্রেণীর মুসলমানের উৎসব-আনন্দ উদ্‌যাপন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রে নানারূপ বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এসবের নামে তারা যা করে তা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার অনেক সময় মুসলমানরা অমুসলিমদের অনুষ্ঠানাদির অনুকরণে নানারূপ উৎসব-আনন্দের ব্যবস্থা করে থাকে। এটা সম্পূর্ণ হারাম। মুসলমানদের উৎসব-আনন্দ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে, তার বিপরীত বা অন্যথা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের গোটা জীবনের কার্যকলাপ ও উৎসব-আনন্দ সবই ইবাদাতের পর্যায়ভুক্ত– যদি তা আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও শিক্ষা অনুযায়ী করা হয়। অন্যথায় এসবই জাহান্নামে যাবার পথকেই প্রশস্ত করে। অন্যদিকে,

www.pathagar.com

অমুসলিমদের রীতি-নীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী উৎসব-আনন্দ করলে বা যে কোন কিছু করলে তখন মুসলমান হিসাবে দাবি করারই কোন যুক্তি থাকে না। এ সম্পর্কে নীচে দু'টি হাদীস পেশ করছি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি অন্য জাতির তাশাবুহ (সাদৃশ্য) ধারণ করলো, সে তাদেরই দলভুক্ত হলো।" (সুনানু আবী দাউদ ও মুসনাদে আহমদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তিন প্রকারের লোক আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত। হারাম শরীফের পবিত্রতা বিনষ্টকারী, ইসলামে বিজাতীয় রীতি-নীতির প্রচলনকারী এবং কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যার প্রচেষ্টাকারী।" (সহীহ আল বুখারী)

ইসলাম যেমন ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিক ও বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, তেমনি পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে নীতিমালা বা দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলাম ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, লেন-দেন, অর্থনৈতিক কায়কারবার, সামাজিত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিচার-শালিশ, প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পালন, অমুসলিম ও পররাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এক কল্যাণকর, সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ মানবিক নীতিমালা প্রদান করেছে। একদিক দিয়ে এটা যেমন চরম বাস্তব ও দুনিয়াদারীর বিষয় অন্যদিক দিয়ে আবার তেমনি সেগুলো ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা করলে এটাই সর্বোত্তম ইবাদাত হিসেবে গণ্য হয়। শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এগুলোই ইবাদাত নয়, ইসলামী বিধান অনুযায়ী সমগ্র জীবন পরিচালনার নামই ইবাদাত। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতির সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক

ইসলামী সংস্কৃতির সাথে বিজ্ঞানের কোন সংঘর্ষ নেই। মূলত এ সংঘর্ষ বা আপাতঃ বিরোধ সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ যিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, তিনিই বিজ্ঞানের স্রষ্টা এবং তাঁরই প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম। এ জীবন বিধানের ফলিত রূপ বা নির্যাসই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। অতএব বিজ্ঞানের সাথে ইসলামী সংস্কৃতির পারস্পরিক সংঘর্ষ, বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্যের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মানব ও জগত সৃষ্টির বিষয় হতে শুরু করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন নিগূঢ় ও রহস্য সম্পর্কে বহুসংখ্যক আয়াত আল কুরআনে পরিদৃষ্ট হয়, যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। শুধু আল কুরআনই নয়, মহানবীর (সা) সুন্নাহর সাথেও বিজ্ঞানের এতটুকু বিভেদ পরিলক্ষিত হয় না। ইসলামের প্রতিটি ইবাদাত, কুরআন-হাদীসের শিক্ষা অত্যন্ত যুক্তিভিত্তিক ও যুগোপযোগী। সৌরবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির অন্ত র্নিহিত নিয়ম-পদ্ধতি, শৃঙ্খলা, অনুশাসন ইত্যাদির সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই।

www.pathagar.com

বরং এসবই পরস্পর সম্পূরক– একই স্রষ্টার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। ইরশাদ হয়েছে :
"আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি অঙ্কুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত থেকে প্রাণহীনকে নির্গত করেন।" (সূরা আন'আম ; ৯৫ আয়াত)
"তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আন'আম : ৯৬ আয়াত)
"তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তার দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ দেখতে পাও।" (সূরা আন'আম : ৯৭ আয়াত)
"তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আন'আম : ৯৮ আয়াত)
উপরোক্ত চারটি আয়াতের শুধু প্রথমাংশ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে, আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বহু সংখ্যক আয়াতে সৌরবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, মানব সৃষ্টির রহস্য ও তার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। এগুলি এত স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যে কোন জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকটই তা সহজবোধ্য। তাই ইসলামকে বলা হয় ফিত্‌রাত বা স্বভাবের ধর্ম। ফিতরাত সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত সৃষ্টির মধ্যেই বিদ্যমান। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'ল' অব নেচার বা সহজাত প্রবণতা। সকল সৃষ্টির মধ্যকার এ সহজাত প্রবণতার স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক হলেন মহান রাব্বুল আলামীন। তাই সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান পরিদৃষ্ট হয়।
আল্লাহ তাআলা সূরা ইয়াসিনে কুরআনকে মহাবিজ্ঞানের বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ বহু সূরাতেই বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ নানাভাবে এসেছে এইরূপ একটি সূরা থেকে কয়েকটি আয়াত নিচে উদ্ধৃত হলো :
"আসমান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন-রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এগুলি নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নি-শাস্তি হতে রক্ষা কর।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৯-১৯০ আয়াত)
আল কুরআন ও মহানবীর (সা) শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে পৃথিবীকে আধুনিক সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ড্রাপার তাঁর 'Intelectual Development of Europe' গ্রন্থে বলেন :
"Besides introducing astronomy, medicine, mathematics, philosophy, surgery and other sciences into Europe, the Muslims taught for the first time in history, geography in their common schools from globes. Along with the manufature of

www.pathagar.com

writing-paper, founding observatories, they also introduced the West the inventions of gunpowder and artilery as well as the mariners compass."

ঐতিহাসিক মেজর আর্থার গ্রীন লিওনার্দ তাঁর 'Islam : Her Moral and Spiritual Value' গ্রন্থে বলেন :

"But apart from these weighty considerations the attitude of Europe towards Islam should be one of eternal gratitude and forgetfulness. Never to this day has Europe acknowledged in an honest and whole-hearted manner the great and ever-lasting debt she owes to Islamic culture and civilization only in a lukewarm and perfunctory way has she recognised that when, during the dark ages, her people were sunk in feudalism and ignorance, Muslim civilization under the Arabs reached a high standard of social and scientific splendour, that kept alive the flicking embers of European society from utter decadence."

প্রকৃতপক্ষে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও মহানবীর (সা) শিক্ষা যেমন এ নতুন আলোকোজ্জ্বল বিপ্লবী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও সাধনায়ও আল কুরআন ও মহানবী (সা) বিপ্লবী শিক্ষা বিস্তারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার দ্বারা মুসলমানগণ সারা বিশ্বকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে। অতএব, বিজ্ঞানের সাথে ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধ সম্পূর্ণ অমূলক। বরং একমাত্র ইসলামী সংস্কৃতিই বিজ্ঞানভিত্তিক। পরিমার্জিত জীবন, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে এর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করেছে।

পরিশেষে বলতে চাই মানব জীবনে আল্লাহর দেয়া বিধানের ফলিত রূপের নির্যাসই ইসলামী সংস্কৃতি, এর মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রাণস্বরূপ আল্লাহর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহর বিধান ও রাসূলের (সা) আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, এমন রুসম-রেওয়াজ, চাল-চলন, আদব-কায়দা, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি কোন কিছুই ইসলামী সংস্কৃতির অংশ হতে পারে না। এমনকি, সেটাকে মুসলিম সংস্কৃতিও বলা যেতে পারে না। কারণ প্রকৃত মুসলিম তো সেই, যে ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা থেকে বিচ্যুত কোন কিছুকেই ইসলামের সাথে সংযুক্ত করা সমীচীন নয়। বরং সেটা বিজাতীয় আদর্শ ও শিক্ষা হিসাবেই বিবেচিত হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা অপসংস্কৃতি হিসাবে বিবেচিত হবে। কোন জাতির উন্নতি-অগ্রগতির পেছনে সংস্কৃতির অবদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কোন জাতির পতনের মূলেও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বা অপসংস্কৃতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস

www.pathagar.com

পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখবো যে, যখনই তারা ইসলামের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে, ইসলামের আদর্শে নিজেদের জীবন, সমাজ রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নির্ধারণ ও পরিচালনা করেছে, সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা ইত্যাদির বিকাশ সাধন করেছে কেবল তখনই তারা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত, বিশ্বকে জয় করেছে, বিশ্ব-সভ্যতাকে করেছে সমুন্নত। আর যখনই তারা ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই তাদের পতন ঘটেছে, লাঞ্ছিত ও পদানত হয়েছে এবং বিজাতির দাসত্ব শৃঙ্খলে হয়েছে আবদ্ধ।

হয় উত্থান, না হয় পতন। হয় মনিবী, না হয় গোলামী। ইসলাম ও মুসলমানের জন্য অন্য কোন বিকল্প নেই। উত্থান ও উন্নতির জন্য অবশ্যই ইসলামী আদর্শকে মজবুতরূপে ধারণ করতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে তৎপর হতে হবে। বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল বিজাতীয় অপসংস্কৃতির করালগ্রাস থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। ■

লেখক-পরিচিতি : অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান– সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী, শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এবং সভাপতি– ফররুখ একাডেমী, ঢাকা।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৪ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

বিশ্বায়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

■

মুসলিম বিশ্বসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে আজ বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করা হয়েছে। বিশ্বের ধনী দেশগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সামরিক মিত্ররা আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাসমূহের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের সাহায্য প্রার্থী দেশগুলোকে বিভিন্ন চাপের মাধ্যমে বিশ্বায়নের দিকে যেতে বাধ্য করছে। ধনী দেশগুলোর একান্ত অনুগত হয়ে বিশ্বব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিশ্বায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বায়ন : প্রত্যয়গত ধারণা

বিশ্বায়ন আজকের দিনে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। বর্তমান বিশ্বে গত কয়েক বছর ধরে 'বিশ্বায়ন' নামের এই পরিভাষা ব্যাপকভাবে শুনা যাচ্ছে। পাশ্চাত্য থেকে অন্য অনেক কিছুর মতো এ বিশেষ পরিভাষাটিও ছড়িয়ে পড়েছে বা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সারা পৃথিবীতে। যাহোক বিশ্বায়ন সম্পর্কে দেশে বিদেশে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। বস্তুত এ সম্বন্ধে আলোচনা করা এখন একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পল হারস্ট ও গ্রাহাম থমসন এ প্রসঙ্গে বলেন, "Globalization has become a fashionable concept in the social sciences, a core dictum in the prescriptions of management gurus and a catch phrase for journalists and politicians.........."

ইংরেজী Globalization এর বাংলা পরিভাষা বিশ্বায়ন। এর আরবী- 'আওলামা'। মজার ব্যাপার হলো পরিভাষাটির এতো ব্যাপক প্রচার ও প্রসার অথচ বাংলা-ইংরেজী অভিধানে Globalization-এর কোন ভুক্তি নেই। এসব অভিধানে আছে – Globe অর্থাৎ 'পৃথিবী' এরই মধ্যে আছে Global অর্থ 'পৃথিবীব্যাপী'। এ থেকেই তৈরি হয়েছে Globalization. বাংলায় শব্দটি 'বিশ্বায়ন' হিসাবেই পরিচিত।

'বিশ্বায়ন' ইংরেজী গ্লোবালাইজেশন শব্দের সার্থক অনুবাদ নয়। কারণ বাংলা বিশ্বায়ন শব্দটার মধ্যে একটা সমতা সমতা ভাব আছে।

www.pathagar.com

মনে হয়, সারা বিশ্বের মানুষকে একই ধরনের কর্ম, উপার্জন, বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা ইত্যাদি সুবিধা দেয়ার জন্য নিয়মটা করা হচ্ছে।

একে সাধারণ পুঁজিতান্ত্রিক নিয়মের বিবর্তিতরূপ বলেও অনেকে মনে করেছিলেন। উন্নয়নশীল দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেছিলেন মার্কসীয় দর্শনের বিশ্বব্যাপী শ্রম ও সম্পদের সাধারণীকরণ প্রত্যয়টিকে ভিত্তি করে বিশ্বায়নের তত্ত্ব ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। আসলে সবটাই ভ্রান্তি। কারণ কোন পুরানা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গ্লোবালাইজেশন বিষয়ক ধারণা দেয়া হয়নি। এ নিছক এক অর্থনৈতিক কর্মকৌশল।

বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রক্রিয়া ও পুঁজিতন্ত্রায়ণেরই একটি নতুন ধরন। এ প্রক্রিয়ায় পুঁজি ও তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবসায় পৃথিবীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতামূলক শক্তিগুলোর অবাধ বিচরণ ঘটে।

অর্থনীতি ও ব্যবসা সংক্রান্ত স্কুলের তাত্ত্বিকদের মতে Globalization can be defined as the activities of multinational enterprises engaged in foreign direct investment and the development of business networks to create value across national borders. বিশ্বায়নের ফলে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এমন শক্তিধর হয়ে উঠেছে যার ফলে বিশ্বের কোন দেশই এখন নিজেদের সুবিধামতো বা নিজেদের কল্যাণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন করতে পারছে না।

এন্থনী গিডিংস (Anthony Giddings) এর মতে, “Globalization is political, technical and cultural as well as economic. Globalization is new and revolutionary and is mainly due to the ‘massive increae’ in financial foreign exchange transactions. This has been facilitated by dynamic improvement in communications technology especially electronic interchange facilitated by personal computers.”

এলান রুগম্যান (Alan Rugman) বলেছেন, “The word ‘Globalization’ is much abused and presents a problem for scholars across the social sciences who define it from the viewpoint of their own discipline.”

জোসেফ এ ক্যামেলারীর (J.A.Camelleri) মতে, “Nevertheless, the process of Globalization is a striking barometer of the states increasingly restricted freedom of action in management of economic activity. The growth international institutions points to a significant, if little advertised, delegation of state authority.”

www.pathagar.com

আবেদা সুলতানার মতে, "বিশ্বায়ন, হলো এমন একটা প্রক্রিয়া, যেখানে উৎপাদন পুঁজির গতিশীলতা, তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবাধ বাণিজ্য ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল দেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়।"

ডঃ মোঃ আজিজুর রহমানের মতে, "বিশ্বায়ন হলো সমগ্র বিশ্বে অবাধ বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তোলা। অন্যকথায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি বাজার গড়ে তোলা। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটানো। ব্যাপক অর্থে সমগ্র বিশ্ববাসীকে নিয়ে একটি বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলা।"

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে, "বিশ্বায়ন হচ্ছে পুঁজিবাদেরই একটা নতুন আচ্ছাদন, পুঁজিবাদ সারা বিশ্বে বাজার খোঁজে এবং পুঁজি লগ্নি করে। এতকাল তারা কাজটা করতো সাম্রাজ্যবাদী কায়দায়। সেখানে জবরদস্তি থাকতো। জবরদস্তি এখনও আছে কিন্তু এখন তাকে বিশ্বায়ন নাম বাদ দিয়ে বেশ ভদ্রগোছের চেহারা দেওয়া হয়েছে। যেন সবাই এক বিশ্বের অংশ, ছোটবড় নেই। এখন আর উপনিবেশ স্থাপনের ঝুটঝামেলা নেই।

তথ্য-প্রযুক্তি রয়েছে। আছে বিজ্ঞাপন। ব্যবস্থা করেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার। বিশ্বায়ন তথা পুঁজিবাদ কাজ করছে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মাধ্যমে। দেশে দেশে পুঁজিবাদীদের দোকান ও এজেন্সী রয়েছে।"

এম. কনফিরিয়াসের মতে, "বিশ্বায়ন হচ্ছে ট্যান্সন্যাশনালিজম। এ পলিসিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশের জন্য 'অধীনতা নীতি' বলা যায়। কারণ এ নীতি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবন যাত্রার জন্য কল্যাণকর নয়। এ নীতি যদিও উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন শক্তির ভিতর একটি সমন্বয় তৈরি করতে সক্ষম হয় কিন্তু মানুষকে স্বাধীন, সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে জীবনযাপন করতে দেয় না। তার মতে বিশ্বায়ন অধীনতা নীতিতে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে, নির্ভরশীলতা উন্নয়নকে ফলপ্রসূ করে। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশের উপর তাদের নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের অবস্থান তৈরি করবে। এখানে কোন দেশ যদি বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজের দেশ গড়তে পারে তাতে দোষের কিছু নেই। এ ধরনের বিশ্ববাজার পৃথিবীতে আগেও ছিলো।"

ড. মনযের কাহাফের মতে, "বিশ্বায়ন বর্তমান পৃথিবীর একটি অতি সাম্প্রতিক প্রপঞ্চ। সমগ্র পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব হাতে তুলে নেয়ার জন্য কৌশলী পাশ্চাত্য এ নতুন শ্লোগান মুখে তুলে নিয়েছে। সহজ কথায় সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একটা সমাজের বাসিন্দা। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক বিষয় পর্যন্ত সব ব্যাপারেই সবাইকে একই দৃষ্টিভঙ্গী, একই প্রবণতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এটি সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিকতম অস্ত্র।"

প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদের মতে, "বিশ্বায়ন হচ্ছে গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের একটি কৌশলমাত্র। গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের বড় মোড়ল হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ দেশটি বিশ্বায়নের যে ফর্মূলা নিয়ে এগিয়ে চলেছে তাতে ইসলাম ধর্মকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে

www.pathagar.com

চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, আমেরিকা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যেসব পলিসি গ্রহণ করে চলেছে, তাতে তার হীন চক্রান্তই সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"

জনাব আবুল আসাদ বিশ্বায়নকে 'Hegemonistic Centralization' আধিপত্যবাদী এককেন্দ্রিকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশ্বায়ন নব্য উপনিবেশিকতাবাদের পরিশীলিত বিকল্প শব্দ। বিশ্বায়ন একটি পদ্ধতিগত কর্মকৌশল। প্রকৃত অর্থে এককেন্দ্রিকরণের একটি অপকৌশল। বিশ্বায়নকে ভালো জিনিস বলে বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হলেও এটি আসলে এককেন্দ্রিকরণ। এর রাজনৈতিক লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীকে একটি আমব্রেলার মধ্যে নিয়ে আসা। এজন্য তারা বহুবিধ কৌশল অবলম্বন করছে। এগুলো টার্গেটে পৌছার অস্ত্র। বিশ্বায়নবাদীদের সামনে বাধা দুটি। ১. জাতীয়তা (Nation) : এটি প্রবল বাধা ২. ধর্ম (Religion)- কেউ মুসলিম, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খৃস্টান এ পরিচিতিরও বড় বাধা। বিশ্বায়নবাদীরা এ দুটো বাধা দূর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এজন্য তারা আর্থরাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যা যা করার দরকার সবই করছে।

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মতে, "বিশ্বায়ন হচ্ছে অর্থ, বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতির মিলন ক্ষেত্র। এটি পশ্চিমাদের একটি বাণিজ্যিক মিশন।"

ড. মাহাথির মোহাম্মদের মতে, "বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি শব্দ যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বের সকল দেশকে একটি অভিন্ন সত্তার আওতায় নিয়ে আসা। দরিদ্র দেশগুলোর বাজার দখল ও তাদের অর্থনীতি ধ্বংস করাই এ বিশ্বায়নের লক্ষ্য। গতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতির আলোকে ধনী দেশগুলো বিশ্বায়নের ধারণা উদ্ভাবন করে। কিন্তু বর্তমানে পুঁজির অবাধ সরবরাহ এবং পণ্য বেচাকেনা ও সেবার উপরই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বেশী। তবে পণ্যের অবাধ গতির মতো মানুষ ও অন্যান্য জিনিসের অবাধ প্রবাহ সম্ভব নাও হতে পারে।"

বিশ্বায়নের উৎপত্তি

অবাধ বাণিজ্যের নামে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া বহু পূর্বেই শুরু হয়েছিল। তাই জিনিসটা নতুন নয়। বিশ্বায়ন পুরাতন বটে কিন্তু আগের বিশ্বায়ন আর এখনকার বিশ্বায়ন এক রকমভাবে কাজ করছে না। গত শতাব্দীর ৬০ এর দশকের শেষের দিকে 'ক্লাব অব রোম' অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে পাশ্চাত্য মডেলের সীমাহীন প্রবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে কথা ঘোষণা করে সেখান থেকেই মূলত: বিশ্বায়ন কথাটির সূত্রপাত। পুঁজিবাদী বিশ্ব এর প্রবর্তক। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনে New International Economic order (NIEO) প্রতিষ্ঠার আহ্বান আসে। এর লক্ষ্য ছিল equity, sovereignty, equality, common interest and co-operation among all states. উদ্দেশ্য ছিলো সকল অসমতা, অবিচার দূর করে দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যকার প্রসারমান ব্যবধান কমিয়ে আনা। NIEO বাস্তবায়ন করার জন্য জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা UNIDO ১৯৭৫ সালে Lima Declaration এবং ১৯৮০ সালে Arusha Declaration প্রস্তুত করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ উন্নত দেশের অসহযোগিতার কারণে NIEO এর কোন লক্ষ্যই বাস্তবায়িত হয়নি।

এভাবে GATT, UNCTAD, Bretton Wood Charter, Kennedy Round,

www.pathagar.com

Tokyo Round প্রভৃতি সম্মেলনসহ শুল্ক হ্রাস এবং বাণিজ্যকে আরও সহজতর করে ধনী দেশে দরিদ্র দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ উন্নত দেশগুলো এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রফেসর এইচ. জি. ম্যানুর (H.G. Mannur) তাঁর বিখ্যাত International Economics (১৯৯২) গ্রন্থে উন্নত দেশের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "They followed a free trade policy as long as it served their purpose and abandoned it as soon as they realized that it was no longer in their best interests" এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা এক সময়ে অবাধ বাণিজ্যের বিরোধিতা করেছে তারা বর্তমানে কেন বিশ্বায়নের জন্য গরীব দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করছে? উত্তরে বলা যায় অতীতে বিভিন্ন সময়ে যখন অবাধ বাণিজ্যের প্রসঙ্গ এসেছে তখন বিশ্বে তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। এখন বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। বিগত শতাব্দীতে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব সামাজিক জীবনকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে শুরু করে। এ বিন্যাসের ধারক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও সম্প্রদায়। পুঁজি, প্রযুক্তি, তথ্য, পণ্য, পরিসেবা ও মুনাফার মাধ্যমে জাতিসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধনের আন্তর্জাতিকীকরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন, অঞ্চলভিত্তিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের উৎপত্তি ও প্রসার, গণ মাধ্যমের প্রভাব ও পরিবেশগত সমজাতীয় ভাবনা এ প্রক্রিয়াকে বেগবান করে। বিশ্বব্যবস্থার প্রাচীন ত্রিধা বিভক্তির (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিশ্ব) অবলুপ্তির সঙ্গে নতুন বাজার সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের তৎপরতায় সমাজতন্ত্রের পতনের প্রাক্কালেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিরপেক্ষতা অর্জন করে। মুক্তবাজার অর্থনীতির ভিত হয় সুদৃঢ়। পক্ষান্তরে মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় গোটা বিশ্বকে একই অবস্থানে সংহত করে। বিশ্বায়নের ভাবনা এর মধ্য দিয়েই অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা ও দ্রুত প্রসার লাভ করে। এটি দৃশ্যমান হচ্ছে যে, বিশ্বায়ন উদ্ভুত বাণিজ্য উদারীকরণ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্তকরণ, বেসরকারীকরণ, ভুর্তকি প্রত্যাহার এসবই দেশের ভিতরে বিদেশী পুঁজিকে ধাবিত করছে। ফলশ্রুতিতে দেশের উপর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের ঋণের বোঝা চেপে বসেছে।

ফরেন এফেয়ার্স পত্রিকা মার্চ-এপ্রিল ২000 সংখ্যায় তিন লেখক ডব্লিউ বার্ডম্যান, কাট্টার জোয়ান স্পেরো, থরাডি আড্রিয়া টাইসন 'নিউ ওয়ার্ল্ড নিউ ডিল' শীর্ষক প্রবন্ধে গ্লোবালাইজেশনের প্রেক্ষাপট এভাবে বর্ণা করেছেন-১৯৯৩ সালে বিল ক্লিনটন যখন ক্ষমতা হাতে নেন তখনই বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু এর স্থায়িত্ব, ব্যাপকতা এবং কার্যকারিতা নির্দিষ্ট হয়নি। ক্লিনটন প্রশাসন কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হয়। যেমন–

প্রথমত : কতকগুলো আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে,

দ্বিতীয়ত : নিজস্ব অর্থনীতির শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে,

তৃতীয়ত : মার্কিন বাণিজ্য নীতিকে এমনভাবে উদারীকরণ করে যাতে মার্কিন পণ্য অন্য

www.pathagar.com

দেশে ঢুকতে পারে এবং অন্য দেশের পণ্য অবাধে না হোক আগের চেয়ে বেশী মার্কিন বাজারে ঢুকতে পারে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সহযোগীরা সন্তুষ্ট হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রদর্শিত পন্থার সাথে যুক্ত হয় বিশ্বের শিল্পোন্নত আরও কয়েকটি দেশ- বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, কানাডা ও জাপান। আসলে এরা সবাই মিলে নিজেদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য নিজেদের নতুন অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে, সবাইকে তা মানতে বাধ্য করার জন্য। বিশ্বায়নের উদগাতা এসব দেশ প্রতিনিয়ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে চলেছে। কার্যক্ষেত্রে কখনও তা অর্থনীতির সীমা অতিক্রম করে রাজনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত হচ্ছে। আসলে বিশ্বায়ন এখন পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির, যেগুলো এখন শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত, তাদের যৌথ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বায়ন বাণিজ্য করছে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক (WB), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)। বিশ্বায়নের নীতি ও কৌশল নির্ধারকদের সুপারিশ অনুযায়ী আরও অনেক প্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে তৈরি হবে এতে সন্দেহ নেই। বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বর্তমানে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাঠামোগত সমন্বয় ও মুদ্রানীতির সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে অতি উত্তম সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ দুটো সংস্থাই নব্য উপনিবেশবাদী সম্রাজ্যবাদীদের মতলবী নীতি বাস্তবায়নের জন্য মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে।

বিশ্বায়নের সমালোচনা

বিশ্বায়নের সমালোচনা বহু বিস্তৃত। বলা যায়, বিশ্বায়নের প্রভাবে Few countries are globalizing while all other countries are being globalized or gullabalized. অর্থনীতিবিদরা যেখানে বিশ্বায়নকে দেখেছেন অগ্রগতি হিসাবে, রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা সেক্ষেত্রে একে দেখেছেন 'পশ্চাদপসরণ' হিসাবে। বিশ্বায়নের বিভিন্ন সমালোচনা নিম্নরূপ

১. অনেকে বলেছেন, বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের জন্য 'অধীনতা নীতি'। কারণ এ নীতি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক জীবন যাত্রার জন্য কল্যাণকর নয়। এটা একটা অসম ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় এক পক্ষ অধীনেই থাকবে আর এক পক্ষ আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেব।

২. বিশ্বায়ন হচ্ছে একটা আধিপত্য। বাণিজ্য এবং পুঁজির আধিপত্য। আধিপত্যবাদ যখন তৃতীয় বিশ্বের ওপর চেপে বসে তখন ঘটে বিশ্বায়ন।

৩. বিশ্বায়ন মানুষকে স্বাধীন, সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে জীবন যাপন করতে দেয় না।

৪. বিশ্বায়ন একটি নব্য পুঁজিবাদ উত্তর চিন্তাধারা।

৫. বিশ্বায়ন- ইতিহাস উত্তর পুঁজিবাদী চিন্তাধারা।

৬. বিশ্বায়নের কারণে বিশ্বব্যাপী ভারসাম্যহীনতা ও অসাম্য বেড়েছে। ধনী দেশগুলোর প্রভাব বেশী বলে এমনটি হয়েছে (ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য)।

৭. বিশ্বায়নের ফলে উন্নত বিশ্ব তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করেছে। বাণিজ্যের

www.pathagar.com

বিশ্বায়নের বিষয়টি ইতোমধ্যে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছে। (প্রফেসর ড. মোজাফফর আহমদ)।

৮. বিশ্বায়ন আসলে বুর্জোয়া কমান্ড অর্থনীতি অথবা বাজার বৃদ্ধিকরণ (জেমস ফোরম্যান-Historical Foundation of Globalization, UK)

৯. বশ্বায়ন বিশ্ব সমস্যার জটিলতার অবগুণ্ঠন মাত্র।

১০. বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বায়ন যান্ত্রিকতাকে মূল্য প্রদান করছে।

১১. বিশ্ব উন্নয়ন পণ্য বিনিময় ছাড়াও সম্ভব।

১২. বলা হয় যে, 'বিশ্বায়ন' মানুষ ও বস্তুর ভিতর সুসম্পর্ক সৃষ্টি করবে। এতে উৎপাদন মানবিক হবে কিন্তু অদ্যাবধি পৃথিবীতে এরূপ পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা দেখা যায়নি।

১৩. মানুষ বিশ্বায়নের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি এবং সম্ভাবনাকে সন্দেহের চোখে দেখে। কারণ এখানে স্বাধীনতার বিপরীতে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

১৪. বিশ্বায়ন একটি অর্থনৈতিক প্রেরণা। বিশ্বায়নের মূল ভিতটা অর্থনৈতিকই। অর্থনীতির সাথে রাজনীতি এবং সংস্কৃতি আছে। বিশ্বায়ন একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিন্তু এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্য যে দিকগুলো বলা হচ্ছে সেগুলো আসল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপারটা অর্থনৈতিক। অর্থনীতির সঙ্গেই সংস্কৃতি-শিক্ষা-দৃষ্টিভংগী আসছে, সবকিছুই আসছে কিন্তু ভিত্তিটা অর্থনৈতিক এবং এটি না বুঝলে বিশ্বায়ন বুঝা যাবে না। এই অর্থনীতিই রাজনীতি, শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্বায়ন এখন আবহাওয়ার মতো চারদিকে বিস্তৃত। বিশ্বায়নের বাইরে যাবার যায়গা নেই।

১৫. বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্বের ওপর চাপ পড়ছে। সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকছে না। অর্থনৈতিক নীতিমালা নির্ধারিত হচ্ছে বিশ্ব ব্যাংকের স্বার্থে, বিশ্ব ব্যাংকের দ্বারা।

১৬. বিশ্বায়ন তার বৈশিষ্ট্যের দাবী অনুযায়ী কোন 'সমতায়' বিশ্বাস করে না। বিশ্বায়নে সমতার পরিবর্তে মানুষের ভিতর স্বভাবগত বৈষম্যের ধারণাই বেশী কাজ করে।

১৭. বিশ্বায়ন একটি সিস্টেম হিসাবে কোন উদ্দেশ্যমূলক সম্পূর্ণতাকেও স্বীকার করে না।

১৮. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের আলোকে বলা যায় বাণিজ্যের ভিত্তি যা-ই হোক না কেন, বাণিজ্যের সুবিধা নির্ভর করবে বাণিজ্যের শর্তের (Terms of Trade) উপর। বাণিজ্যের শর্ত নির্ভর করবে বিবেচ্য দেশের তুলনামূলক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি অবস্থার উপর। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের আলোকে বলা যায় বিশ্বায়ন উন্নয়নের সোনার হরিণকে সকল দেশের মুঠোয় এনে দিবে একথা সত্য নয়।

১৯. আধুনিক বাণিজ্য তত্ত্বের আলোকে অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন (Samuelson) এবং লার্নার (Lerner) পরিপূর্ণ উপকরণ দাম সমতার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বিশ্বায়ন বাস্তবে আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যরত দেশসমূহের মধ্যে উপকরণ দাম সমান করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপকরণ দাম সমতার পথ ধরে দেশে দেশে আয় বৈষম্য দূর হবার

www.pathagar.com

আশাবাদ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বে ব্যক্ত হলেও বাস্তবে তা হয়নি। কমেনি আন্ত:দেশীয় আয় বৈষম্য। তাই গরীব দেশে গরীব জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ প্রসংগে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, বিশ্বায়ন এখনো বিতর্কিত বিষয়। আজকের বিশ্ব আগের যেকোন সময়ের চেয়ে বিপুল বিত্তের অধিকারী হলেও একই সাথে সর্বগ্রাসী বঞ্চনা এবং নিদারুণ বৈষম্যও চলছে। এই পটভূমিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রবল এবং সহিংস প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভও চলছে বিশ্ব পর্যায়ে। বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে বহু লোকের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এর ফলে বিরল সমৃদ্ধি হাতেগোণা কিছু এলাকায় দেখা গেলেও সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের বিশ্ব আধিপত্য আজও দিব্যি বহাল আছে।

২০. বিশ্বায়নের শ্লোগান ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ছদ্মাবরণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি সাংঘাতিক রকমের চ্যালেঞ্জ এসেছে। বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে উন্নয়নশীল দেশে শিল্প কল-কারখানার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের নয়া ব্যবস্থা হওয়া তো দূরের কথা তাদের যে কর্মসংস্থান আছে তা বন্ধ হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

২১. বিশ্বায়ন সারা বিশ্বে বেকারত্ব সৃষ্টি করছে। কেননা শ্রমকে তারা যতটা পারা যায় অপ্রয়োজনীয় করে তোলার চেষ্টা করছে। ফলে বেকারত্বের যায়গাটা তৈরি হচ্ছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব যে একটা ভয়ংকর ব্যাপার এবং সেটা যে বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত এটাকে স্পষ্ট করে দেখা হচ্ছে না এবং দেখা না হওয়ার কারণে এসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে তাঁদের যে ভবিষ্যৎ সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছে না।

২২. বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতনের পর সারা বিশ্বের অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলো এখন আবার বিশ্বায়নের নামে এক নতুন সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হয়েছে। এই নতুন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বায়নের নাম করে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) প্রভাব খাটিয়ে বর্তমানে সারা বিশ্ব শাসন করছে।

২৩. বিশ্বায়নের যুগে মানুষ মনে করে সে স্বাধীন। এটা একটা ভ্রান্তি। কেননা আসলে সে স্বাধীন নয়। সে পরাধীনই রয়ে গেছে। এখনকার অবস্থাটা হচ্ছে আত্মসমর্পনের। রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েও উন্নয়নশীল দেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যে পরাধীন সেই বোধটা নেই। কেননা উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনীতিতে সেটাই হচ্ছে দাঁড়াবার বস্তুগত যায়গা, সেই যায়গাটা অন্যের দখলে চলে যাচ্ছে। মানুষ অজান্তেই ওই নিপীড়ণকারী বিশ্বের অংশ হয়ে যাচ্ছে।

২৪. বিশ্বায়নের প্রভাবে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মাত্র ১০টি বহুজাতিক কর্পোরেশন বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করছে। এক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ, প্রাকৃতিক চাহিদা ইত্যাদি বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থের কাছে অর্থহীন। দেশে দেশে স্থানীয় বাজারে বহুজাতিক কোম্পানীর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য।

www.pathagar.com

বিশ্বায়নে যেহেতু মুনাফাই মুখ্য, তাই এক্ষেত্রে সামাজিক-রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধও শিথিল হতে বাধ্য।

২৫. বিশ্বায়নের প্রভাবে ছোট ছোট কোম্পানী তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে।

২৬. বিশ্বায়নের স্রোতে উন্নত বিশ্ব লাভবান হচ্ছে। বিশ্ব বাজার দখল করছে গ্লোবাল এলিটরা। বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য উন্নত দেশগুলোর মুনাফা লুণ্ঠন।

২৭. বিশ্বায়নের প্রভাব একদম সরাসরি। উন্নয়নশীল দেশসমূহ চলছে ঋণে। ঋণগ্রস্ত দেশসমূহ এর মধ্যেই বাজারে পরিণত হয়েছে। ঋণ দিচ্ছে দাতারা, তারা পরামর্শও দিচ্ছে। বিশ্বায়নের পেছনে দাতা গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। কারণ দাতা যারা তারাই তো বিশ্বায়নের মালিক। তাদের স্বার্থেই বিশ্বায়ন হচ্ছে। বিশ্বায়ন দুর্বল রাষ্ট্রের কোনও কাজে লাগছে না।

২৮. আজকের বিশ্বে বিশ্বায়ন যেমন বাস্তবতা, সম্পদের অসমবণ্টন তেমনি বাস্তবতা। বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাদী বৈশ্বীকরণের দুর্নিবার গ্রাসে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের শ্লোগান হারিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত সর্বশেষ রিপোর্টে জানা যায়, বিশ্বের বিশ শতাংশ মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হয়েছে ৮৬ শতাংশ সম্পদ। দরিদ্রতম এক পঞ্চমাংশ মানুষের মালিকানায় রয়েছে পৃথিবীর মোট আয়ের মাত্র ১ শতাংশ। বিশ্বের ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে ২৫০ কোটি মানুষ এখনও দরিদ্র এবং ১৩০ কোটি মানুষের আয় দৈনিক ১ ডলারের কম। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ৩ জন ধনী ব্যক্তির আয় একত্রে পৃথিবীর দরিদ্রতম ২৬টি দেশের জাতীয় আয়ের সমান। মাত্র ২০০ জন ধনী ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ পৃথিবীর মোট আয়ের ৪১ শতাংশ।

২৯. বিশ্বায়নের সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে উন্নয়নশীল-দরিদ্র স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উপর। বিভিন্নভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে এসব দেশের সরকারগুলোকে বাধ্য করায় রিজার্ভ থেকে নিয়ে প্রায় সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেই বিরূপ প্রভাব পড়ছে। রফতানী বাজার চাঙ্গা থাকলে এটি হতো না। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলো এজন্যই স্বল্পোন্নত যে তাদের কৃষি পণ্যই বেশী এবং শিল্প পণ্য প্রায়ই নেই। ফলে আমদানী বাজার তাদের খুলে দিতে হচ্ছে কিন্তু সে অনুপাতে রফতানি হচ্ছে না। এর ফলে এসব দেশের সরকারের রাজস্ব আয় কমে যাচ্ছে। তবে শুধু সরকারই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, অবাধ আমদানী পণ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশী বেসরকারী শিল্প উদ্যোগগুলো ক্রমাগত ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

৩০. গোড়া থেকেই নব্য উপনিবেশবাদী বিশ্বায়নপন্থীরা বিশ্ব অর্থনীতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আসছিলো যাতে তারা ছাড়া বিশ্বের আর কোন দেশ শিল্পায়িত হতে না পারে। মুখে বিশ্বায়নের কথা বললেও প্রযুক্তিকে তারা তাদের নিজেদের মধ্যেই কুক্ষিগত করে রাখে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে এ যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের উন্নত দেশসমূহ, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়াই বিশ্ব বাজারের মোট ভারী যন্ত্রসহ যাবতীয় খুচরা যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক সামগ্রী ও অন্যান্য শিল্পজাত পণ্যের প্রায় ৮৫% বাজারজাত করে আসছে। আর বাদবাকী বিশ্ব বাজারজাত করেছে শিল্পজাত পণ্যের বড় জোর ১৫%।

৩১. বিশ্বায়নবাদীরা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্প ও শিল্পজাত পণ্যের নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করেই

www.pathagar.com

থামেনি। তারা গোটা বিশ্বের কৃষিজাত পণ্যের বাজারকেও কুক্ষিগত করে রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে তারা নিজ নিজ দেশের কৃষকদের উচ্চহারে ভর্তুকি প্রদান করছে, অন্যদিকে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের উপর কৃষি ভর্তুকি প্রত্যাহার করার বা কমিয়ে আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্বায়নের মোড়ল কতিপয় শিল্পোন্নত দেশ প্রতি বছর কৃষি খাতে যে ভর্তুকি দেয় তা গড়ে ৩০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী। আরও উল্লেখ্য যে, শিল্পোন্নত ৭টি দেশের উল্লেখিত কৃষি ভর্তুকি হচ্ছে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল বিশ্বের ১২০ কোটি মানুষের বার্ষিক মোট আয়ের সমান। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, শুধু ২০০১ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলা চাষীরা সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি বাবদ পেয়েছিল ৩৬০ কোটি ডলার। কৃষির অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা দেয় অনুরূপ ভর্তুকি। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কতিপয় ধনীদেশ বিশ্ববাজারে তাদের কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করে তাদের উৎপাদন খরচের মাত্র ৩০% বা অনুরূপ মূল্যে। এভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে নয়া সাম্রাজ্যবাদীরা অতি কম মূল্যে কৃষিজাত পণ্য হাজির করায় বিশ্ব বাজার ব্যবস্থার কারণে স্বল্পোন্নত দেশ সমূহেও কৃষিজাত পণ্যের দাম কমে যায় ফলে এসব দেশের কৃষকরা ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অ-লাভজনক হওয়ায় অনেক কৃষক ইতোমধ্যেই কৃষি পেশা ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছে। যেহেতু অনুন্নত বিশ্বে কৃষিই হচ্ছে অর্থনীতির মূল ভিত্তি সেহেতু এ পরিস্থিতিতে তাদের গোটা অর্থনীতিই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিশ্বায়নের আগ্রাসী নীতির ফলে উন্নয়নশীল বিশ্ব বিশেষত স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত বিশ্ব শিল্পজাত ও কৃষিজাত উভয় প্রকার পণ্যের ক্ষেত্রেই মার খাচ্ছে, ফলে তাদের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলেছে। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর এক হিসাব মতে নয়া সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের উল্লেখিত কৃষি ভর্তুকির ফলশ্রুতিতে দরিদ্র দেশসমূহ প্রতি বছর ৬৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর মধ্যে ৪০ বিলিয়ন ডলার হচ্ছে কৃষিজাত পণ্য রফতানী বাবদ এবং ২৪ বিলিয়ন ডলার হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষতি বাবদ। বর্তমান অবস্থা বহাল থাকলে ভবিষ্যতে এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বহুগুণে বাড়বে। অথচ উন্নত দেশসমূহ ভর্তুকি প্রত্যাহার করলে এবং স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পণ্যকে বিশ্ব বাজারে ঢোকার সমান সুযোগ করে দিলে, এখন থেকে ২০১৫ সালের মধ্যেই দরিদ্র বিশ্ব অন্তত ৫২০ বিলিয়ন ডলার আয় করতে সক্ষত হতো। এমতাবস্থায়, স্বভাবতঃই উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পক্ষ থেকে দাবী উঠেছে যে, তথাকথিত অবাধ বিশ্বায়ন বন্ধ করতে হবে, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্য যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষত উন্নত দেশসমূহের বাজারে যেতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় শুল্ক বা ট্যারিফ সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দিতে হবে এবং উন্নত দেশসমূহকে তাদের চক্রান্তমূলক কৃষি ভর্তুকি প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

বিশ্বায়নের কুফল

ড. আনাস ঝারকা বিশ্বায়নের কুপ্রভাবগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। যেমন :

১. বিশ্ব সরকার : স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনসাধারণ অতিরিক্ত গ্যাস বিল

www.pathagar.com

বা বিদ্যুৎ বিল প্রদান করবে কিনা সেটা নির্ধারণ করার এখতিয়ার এসব দেশের সরকারের হাতে নেই এটি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করছে বিশ্ব ব্যাংক, আই এম এফ প্রভৃতি পুঁজিবাদের ধারক বাহক বিশ্ব সংস্থা। অন্যথায় ধনী দাতা দেশগুলোর উচ্চ সুদে প্রদেয় ঋণ সাহায্য হতে বঞ্চিত হতে হয় গরীব স্বল্পোন্নত দেশগুলোর। এভাবে গরীব, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সরকার মূলত কার্যকর সরকার থাকছে না। বরং বহুজাতিক সংস্থা বা ধনী দেশগুলোর খেয়াল খুশী মতো চলতে হয় তাদের। বিশ্বায়ন তাই বিশ্ব সরকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ সরকার পরিচালনা করছে বিশ্বায়নে নেতৃত্বদানকারী বিভিন্ন পর্যায়ের পুঁজিবাদী সংস্থা বা রাষ্ট্র।

২. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ : স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক জোট, অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রসমূহ (Nation State) উন্নতির সোপান অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের নিজস্ব বলয় তৈরির মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে ন্যাটো, ইউরোপি-য়ান ইউনিয়ন, নাফটা, এপেক প্রভৃতি সংস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিটি উন্নত দেশই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীয় যোগ্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভের। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এভাবেই ক্ষুদ্র, গরীব, অনুন্নত, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চলে গেছে সাহায্যকারী বিশ্বায়নের মোড়ল ধনীদেশের বা ব্যবসায়ী সংস্থার হাতে।

৩. সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : বিশ্বায়নের প্রধান মোড়ল বা প্রধান নেতৃত্বদানকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর সাংস্কৃতিক রাজধানী হলিউডই মূলত বিশ্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসী হলিউডী সংস্কৃতির প্রভাব বলয়ের আওতাভুক্ত হয়েছে। বিপুল পুঁজির বিনিয়োগ, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, উঁচুমানের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করছে পুঁজিবাদী সংস্কৃতি। স্যাটেলাইট চ্যানেল, উন্নত প্রকাশনা ও প্রভাবশালী সংবাদসংস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে একদিকে সমগ্র বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন অন্যদিকে অপপ্রচার ও কৌশলী নিয়ন্ত্রণ দ্বারা যেকোন পরিস্থিতির বিকাশ ঘটাচ্ছে বিশ্বায়নের শ্লোগানধারী বিবিসি, সিএনএন, এপি, এএফপি প্রভৃতি মিডিয়া সাম্রাজ্য। সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তান ও ইরাকে নব্য উপনিবেশবাদী আগ্রাসন এর উজ্জ্বল প্রমাণ।

৪. কৌশলে শোষণ : চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর শোষণকে সহজসাধ্য ও অবাধ করে দিয়েছে বিশ্বায়ন। কোমল পানীয়, প্রসাধনী ইত্যাদির বিপণন, প্রসার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে স্যাটেলাইট সম্প্রচার ও বহুমুখী বিজ্ঞাপনের সুবাদে। দরিদ্র দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়ার এ সুযোগ ভালভাবেই কাজে লাগাচ্ছে নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীসমূহ। এভাবেই শোষিত হয়েও শোষণের রূপ অচেনাই থেকে যাচ্ছে দরিদ্রদের কাছে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যায় এভাবে-

বিশ্বায়ন নামক ট্রেনের যাত্রী বিশ্ববাসী সবাই। সুলভ শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টের যাত্রী গরীব,

www.pathagar.com

অনুন্নত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নাগরিকরা। তারা ট্রেন ভাড়ার অতিরিক্ত আরো টাকা দিয়েছে প্রথম শ্রেণী থেকে নিয়ন্ত্রিত হকারদের কাছ থেকে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করার জন্য। হকার শ্রেণী সে টাকা পৌছে দিচ্ছে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের কাছে। ফলত প্রথম শ্রেণীর গুটিকতক যাত্রীর পুঁজি বৃদ্ধির বিপরীতে সুলভ শ্রেণীর ব্যাপক যাত্রী সাধারণ আরো নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সুলভ শ্রেণীর যাত্রীদের প্রথম শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা মর্যাদা বা অধিকার দেয়া হচ্ছে না। এভাবেই বিশ্বায়ন নামক ট্রেন শোষণের কৌশলী ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী ধনী দরিদ্রের বৈষম্য এ কারণে বেড়েই চলেছে। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া যতই ত্বরান্বিত হবে গুটিকতক ধনীদেশ (গ্রুপ-৭) এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলোই শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্ব অর্থনীতি। মার খাবে পুঁজি এবং ধ্বংস হবে অনুন্নত দেশের শিল্প কাঠামো, এতে সাধারণ মানুষের অনুন্নত দেশের হোক বা উন্নত দেশের, কোন কল্যাণ নেই। তাই যেখানেই শিল্পোন্নত দেশগুলো বিশ্বায়ন নিয়ে বৈঠক বসছে সেখানেই লাখ লাখ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে।

বিশ্বায়নের লক্ষ্য

বিশ্বায়নের লক্ষ্যকে জাহিরী ও বাতেনী দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। বিশ্বায়নের জাহিরী লক্ষ্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এটা হলো সকল দেশের হাতে উন্নয়নের সোনার হরিণ তুলে দেয়া। সকল দেশকে উন্নয়নের সম পর্যায়ে নিয়ে আসা। বিশ্বের অংশ বানানো, আন্তর্জাতিক মার্যাদা দেয়া। কিন্তু আসলে বিশ্বের নয়, বিশ্ব বাজারের অংশ করা হচ্ছে, যে বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশের সম্পর্কটা একটা প্রান্তিক অবস্থান মাত্র। বিশ্বায়নের বাতেনী লক্ষ্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সামরিক মিত্র উন্নত দেশের পুঁজির বাজারের প্রসার ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী মার্কিন পণ্যের বাজার গড়ে তোলা। এই বাতেনী উদ্দেশ্যের ভিতরে একান্ত আরও একটা বাতেনী উদ্দেশ্য হলো অনুন্নত দেশ হতে উন্নত দেশে তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ তথ্য প্রযুক্তির প্রবাহের মাধ্যমে অনুন্নত-উন্নয়নশীল দেশে সামরিক প্রযুক্তি ও ইসলামী আন্দোলনসমূহের ওপর দৃষ্টি রাখা, যাতে কোন দেশ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র সামরিক সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে না পারে তা নিশ্চিত করা। আসলে পশ্চিমা বিশ্ব বিশ্বায়ন নামক নতুন উদ্ভাবিত ও পরিভাষার মাধ্যমে একটি ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে চায়। সমাজতন্ত্রের সূতিকাগার ও লালনভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলাম ও মুসলমানদের একটি চ্যালেঞ্জিং শক্তি মনে করছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রতি উত্তরোত্তর আগ্রহ বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে তারা 'বিশ্বায়ন' নামের এ কৌশলটি আবিষ্কার করেছে। এ কৌশলটির লক্ষ্য মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামী উম্মাহ। এটি একটি ফাঁদ। ইসলামী উম্মাহকে এ কৌশলটির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্বায়ন শ্লোগানটি যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন এর সূদুরপ্রসারী লক্ষ্য কিন্তু খুবই জঘণ্য।

বিশ্বায়নের তাত্ত্বিক ভিত্তি

বিশ্বায়নের জাহিরী লক্ষ্যকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে ধরে নিয়ে এরপর তার তাত্ত্বিক ভিত্তি

www.pathagar.com

অনুসন্ধান করা যেতে পারে। বিশ্বায়নের জাহিরী লক্ষ্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা করতে হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্লাসিক্যাল, নব্য ক্ল্যাসিক্যাল এবং আধুনিক তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের প্রণেতা এডাম স্মিথ (Adam Smith) চরম ব্যয় পার্থক্যকে (Absolute cost difference) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এডাম স্মিথের ছাত্র ডেভিড রিকার্ডো চরম ব্যয় পার্থক্যের ধারণাকে আরও ব্যাপকতা দান করেছেন। তিনি স্মিথের তত্ত্বের ভিত্তিকে আরও প্রসারিত করে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে তুলনামূলক অধিক সুবিধা বা কম অসুবিধা না থাকলে দুটো দেশের মধ্যে বাণিজ্য হতে পারে। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে অবধা বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর উৎপাদন বাড়বে কিন্তু বাড়তি উৎপাদনের সুবিধা কোন দেশ কতটুকু পাবে তা নির্ভর করবে বাণিজ্যের শর্তের ওপর। বাণিজ্যের শর্তের প্রতিকূলতার কারণে বাণিজ্যরত একটি দেশ সকল সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে পারে। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করলে বলা যায় বিশ্বায়ন হলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষায়ন অর্জিত হবে। কিন্তু অর্জিত সুবিধার বণ্টন নির্ভর করবে বাণিজ্যের শর্তের ওপর। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বানুসারে অবাধ বাণিজ্যের দু'টো দেশ ভৌগোলিক আকৃতি, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক শক্তি, সামরিক শক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমান হতে পারে। যেকোন দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলে অবাধ বাণিজ্যের সকল সুবিধা শক্তিধর দেশ পাবে, দুর্বল দেশ কোন সুবিধা পাবেনা।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নব্য-ক্লাসিক্যাল বিশ্লেষণে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের শ্রমের খরচ পার্থক্যই বাণিজ্যের একমাত্র কারণ, এই সীমাবদ্ধতা দূর করে সুযোগ ব্যয়ের পার্থক্যকে বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তত্ত্বের প্রধান প্রধান প্রণেতা Haberler, Leontief, Lerner, Marshall, Edgeworth, Mead প্রমুখ। এই তত্ত্বানুসারে খরচ অবস্থার ওপর ভিত্তি বাণিজ্যের ফলে উৎপাদন পরিপূর্ণতা বা আংশিক বিশেষায়ন হতে পারে। কিন্তু বিশ্বায়ণের সুবিধা কে কতটা পাবে তা নির্ভর করবে বাণিজ্যের শর্তের ওপর।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আধুনিক তত্ত্বের প্রণেতা Eli Heckscher এবং Bertil Ohlim সুযোগ ব্যয়ের পার্থক্য বাণিজ্যের ভিত্তি-এ ধারণা বাদ দিয়ে অর্পিত উপাদানকে বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম : প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদের মূল্যায়ন

বিশ্বায়ন বিশ্ববাসীকে বর্তমান সময়ের একক প্রাধান্যশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 'গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের' ধারক ও বাহকে পরিণত করার ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত প্রায় ৬০০ বছর যাবৎ দাপটের সাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বিভিন্ন স্বরূপে বিরাজমান রয়েছে। অর্থব্যবস্থা মূলত ব্যসায়ীদের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পুঁজির প্রবাহ ও বাজার ব্যবস্থার সমন্বয়ে সৃষ্ট। ধাপে ধাপে বিবর্তিত ও নতুনত্ব লাভ করে পুঁজিবাদ বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদের বিবর্তন ধারা নিম্নরূপ

ব্যবসাভিত্তিক পুঁজিবাদ (Merchant Capitalism)।

শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদ (Industrial Capitalism)।

অর্থনৈতিক পুঁজিবাদ (Financial Capitalism)।

কল্যাণকর পুঁজিবাদ (Welfare Capitalism)।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (State Capitalism)।

বিশ্ব পুঁজিবাদ (Global Capitalism)।

যেসব মূলনীতির ভিত্তিতে পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে তা ৮টি এবং সেগুলো নিম্নরূপ

১. ব্যক্তিস্বার্থ (Self Interest)।

২. ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ (Private Property and enterprise)।

৩. লাভের আকাঙ্ক্ষা (The Profit Motive)।

৪. বাজার ম্যাকানিজম (Market Mechanism)।

৫. মুক্ত বাণিজ্য সম্পাদনে সুশীল সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রদান (Civil Society ensuring institutional support for free enterprise)।

৬. ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার সংরক্ষণ ও চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করার জন্য একটি আইনগত কাঠামোর বিদ্যমানতা (The availability of a juridico-legal framework for business rights and enforcement of contracts)।

৭. টাকার অন্তর্বর্তিতা বা আন্তঃপ্রবাহ (The intermediation of money).

৮. সুশাসন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যা অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে (Good governance and political stability providing domestic and external security)।

সম্পদ বা পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে এর উত্তোরত্তর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন পুঁজিবাদের অনন্য দিক। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু'ধরনের রূপই প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী।

পুঁজিবাদের ইতিবাচক দিক

ব্যক্তিকেন্দ্রিক পুঁজির বিকাশ ও উন্নয়ন, অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীলতা ও সৃজনশীলতার জোয়ার সৃষ্টি করে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের দ্বারা মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে। পুঁজিবাদই এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

পুঁজিবাদের নেতিবাচক দিক

পুঁজিবাদের ক্ষতিকারক দিকগুলো জর্জরিত করেছে পৃথিবীর অধিকাংশ বনি আদমকে। ভাবিয়ে তুলছে চিন্তাশীল মানুষকে বার বার। তবুও ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সম্পদের দাপটে টিকে আছে এর বিশাল দানবীয় রূপ।

উৎপাদন সর্বোচ্চকরণ ও অধিক মুনাফা অর্জন প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় মানবীয় দিক বলে আর কিছুই থাকে না এ মতবাদের। মুনাফা অর্জনের জন্য এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার

www.pathagar.com

জন্য সবই বৈধ-এটি মূলত পুঁজিবাদের প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ পারস্পরিক সামর্থ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। অদ্যাবধি তা কার্যত ব্যবসায়ীদের হাতেই আছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার শীর্ষ পদে আরোহণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের সমর্থন ও সহযোগিতাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোও ক্ষমতার শীর্ষে ব্যবসায়ী ও পুঁজিবাদী কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহের সমর্থনপুষ্ট দালালদের ক্ষমতায় আরোহণ নির্বিকারে অবলোকন করছে।

সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও পুঁজিবাদে সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন কখনোই হয় না বিধায় মানুষের ক্রয় ক্ষমতা সমভাবে বৃদ্ধি পায় না। ফলত ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তি স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়াতে দায়বদ্ধতাহীন প্রাণীতে পরিণত হয়। ভোগ বিলাস, সম্পদ করায়ত্তকরণ ও সঞ্চয়ের সর্বব্যাপী মানসিকতার প্রভাবে বিলুপ্ত হয় সামাজিক আদান-প্রদান সহযোগিতামূলক মনোভাব। এভাবে ব্যক্তি ও সমাজ সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কবিহীন দুটি পৃথক সত্তায় পর্যবসিত হয়। এ জন্যই শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার, যুল্‌ম ও দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত অসহায় মানুষ। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রাচুর্যের পাশাপাশি ব্যাপক দারিদ্র্য, অপচয়, অপব্যয়ের সাথে সাথে ক্ষুধা এবং ভোগ বিলাসের পাশাপাশি ব্যাপক বঞ্চনার চিত্র বিরাজমান। পৃথিবীর ২০% পুঁজিবাদী বিত্তশালীর জিডিপি বিশ্ব জিডিপির ৮৭%, যা জোরালোভাবে ভারসাম্যহীন, অযৌক্তিক ও অবিচারমূলক অর্থনীতির চিত্র ফুটিয়ে তোলে।

পুঁজিবাদের পরীক্ষা-নীরিক্ষা পৃথিবীর কোন কোন যায়গায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে শেয়ার বাজারে ধস, রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্যর্থতা পুঁজিবাদের সাফল্যের মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের হাতে জিডিপির মাত্র ১০% থাকার পরিস্থিতি। এর পেছনে পুঁজিবাদ সৃষ্ট ভোগবাদী মানসিকতা, অবিচার, সম্পদের অসম বণ্টন দায়ী। পুঁজিবাদের পুরো প্রক্রিয়াটি শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিচালিত হয়ে আজ বিশ্বায়নের কৌশলে পুষ্ট গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের রূপ পরিগ্রহ করেছে। পুঁজিবাদকে আধুনিক বিশ্ব মেনে নিচ্ছে না, নিতে পারে না। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই অর্থাৎ পুঁজিবাদ বিশ্বের মূল মাটিতেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হচ্ছে। এই বিক্ষোভের একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র আছে।

বিশ্বায়ন ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলাম বিশ্বজনীন মতাদর্শ। ইসলামে রয়েছে বিশ্ব দৃষ্টি (International Outlook)। সার্বজনীনতা-বিশ্বজনীনতার অনন্য বৈশিষ্ট্যে ইসলাম বিশিষ্ট। ইসলাম আল্লাহর শাশ্বত পথনির্দেশ। এর শিক্ষাসমূহ নবীন উষার মতো তরতাজা, স্বচ্ছ ও আধুনিক। মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা এর গুণবৈশিষ্ট্য। এ সত্যটি ভালোভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক যে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ভারসাম্য পূর্ণ ব্যবস্থা এবং সমুদয় সমতা, উদারতা, সুষম নীতি তার দেয়া অধিকার ও কর্তব্য সমূহের ব্যবস্থাবলীতে পূর্ণ অবয়বে বিদ্যমান রয়েছে।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য থেকে 'বিশ্বায়নের' যে আওয়াজ উঠেছে এবং সারা বিশ্বে যা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে মহান দীন ইসলাম আল্লাহ যে দীনকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন এবং মানুষের জন্য একমাত্র দীন হিসাবে মনোনীত করেছেন সে ইসলামের মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীনতা। দেড় হাজার বছর পূর্বের ইসলামের বিশ্বজনীন আহ্বান আজকের 'বিশ্বায়নের' আহ্বান থেকে শ্রেষ্ঠ ও অনেক ব্যাপক। ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বিশ্বমানবতার জন্য। ইসলাম মানবতার একমাত্র গ্যারান্টি। ইসলামে সমস্ত মানুষই সমান। বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করে না। এ দীনের আহ্বান সমগ্র মানবতাকে সচেতন করার জন্য রক্ত, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ ও অঞ্চলগত মর্যাদার সমস্ত মিথ্যা বাধা (False barrier) মূলোৎপাটন করে মানবতাকে সত্যিকার মর্যাদার আসনে সমাসীন করাই এ দীনের লক্ষ্য।

ইসলামের ফালাহ-কল্যাণ বিশ্বজাহানের জন্য। এজন্য ইসলামে আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে 'রাব্বুল আলামীন' 'বিশ্বজাহানের রব'- 'রাব্বুন-নাস' (সমগ্র মানব জাতির প্রভু) প্রতিপালক হিসাবে। নবী মুহাম্মাদকে (সা) বলা হয়েছে 'রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীন' 'বিশ্বজাহানের জন্য করুণা'। আর কুরআন হচ্ছে 'জিকরুল লিল আলামীন' বিশ্বজাহানের জন্য উপদেশ। এর চেয়ে বড় বিশ্বজনীনতা আর কি হতে পারে? বস্তুত এখানেই ইসলামী মানবতার বিশ্বজনীনতা। ইসলামের আবেদন ও আহ্বান বিশ্বজনীন বলেই ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সৃষ্টির উৎসকে এক করে দেখেছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ঘোষণা করেছে যে, 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তারিত করেছেন তাদের দ্'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।'

আকার, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মূল উৎস একজন পুরুষ ও একজন নারী। ইসলাম অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে বিশ্বজনীনতার ঘোষণা দিয়েছে। যার পরিধি আজকের ঘোষিত বিশ্বায়নের চেয়ে অনেক ব্যাপক।

ইসলাম আরো ঘোষণা করেছে যে, হে মানব জাতি। আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্তি করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সম্ভ্রান্ত সে, যে (তাঁকে) সর্বাধিক ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।

এটা স্পষ্টভাবেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক এবং মানবিক মানদণ্ডে সকল মানুষই এক। বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা ইত্যাদির ভিত্তিতে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু ভাল আর মন্দ কখনই এক হতে পারে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার ভিত্তিতে মানুষকে পৃথক করার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে সততা এবং আল্লাহ ভীতি (আরবীতে তাক্‌ওয়া)। তাক্‌ওয়া বলতে ব্যাপক অর্থে সকল ভাল কিছুকেই বুঝায়। ওপরের আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা পরস্পরকে জানতে পারে। কুরআনে বর্ণিত এ ভেদটি একটি নিয়ামত হিসাবে এসেছে যাতে মানব বৈচিত্র্য পূর্ণতা পেতে পারে বিভিন্ন ভাষা, গোত্র ও জাতীয়তার সম্মিলনে।

www.pathagar.com

বিশ্বায়নের পরিভাষা চালুর প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম কতই না সুস্পষ্ট করে 'বিশ্বায়নের' ধারণা পেশ করেছে। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (সা) প্রকৃত অর্থে বস্তবতাসম্মত এবং সার্বিক কল্যাণমুখী বিশ্বায়নের সফল প্রবর্তক। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন গোটা মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্যই কেবল তাঁকে মনোনীত করেছেন। মহানবী (সা) তাঁর গোটা জীবন মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য ব্যয় করেছেন। আজকের দিনেও মহানবী (সা) প্রদর্শিত পথেই কেবল বিশ্বায়নের সকল স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে যেহেতু সকল যুগ, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মূল হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন নারী, তাই মানুষ হিসাবে তারা সমান মর্যাদার অধিকারী। পরস্পরের পরিচয় জানার সুবিধার্থে তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব।

ইসলাম একমাত্র কালজয়ী ও সার্বজনীন আদর্শ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পৃথিবীর যে কোন জাতির জন্যই মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম। ইসলাম কোন বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীর জন্য নয়। ইসলাম মানুষের জন্য। সকল যুগ, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মানুষের জন্য। তাই কুরআন মাজীদে সর্বপ্রথম মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে। 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদাত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় তোমরা তাক্ওয়া অর্জন করবে।

আল্লাহ একমাত্র প্রভু, রব, মালিক, স্রষ্টা, পালনকর্তা, বিধানদাতা, জীবিকাদাতা, জীবন মৃত্যুর তিনিই একমাত্র মালিক। তিনি একই সাথে সকল সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বশীল, নিয়ন্ত্রণকারী, তাঁর দৃষ্টির আড়াল হওয়া সম্ভব হয় না। তাঁর শক্তির বলয় থেকে বাইরে যাওয়া অসম্ভব। অথচ মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রতিনিধি হিসাবে, ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে। যেহেতু আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনি সকলের স্রষ্টা, সকল প্রাণীর ও সকল মানুষের, সেহেতু তাঁর বিধানও সকল মানুষের উপযোগী। বিধানসমূহ রচনার ক্ষেত্রে তিনি একচোখা একদেশদর্শী নন বরং সর্বদ্রষ্টা, সর্বদর্শী। তাঁর বিধান কারো জন্য অনুপযোগী তো নয়ই বরং সবার জন্য একমাত্র উপযোগী ও কার্যকর বিধান। মূলত আল্লাহর বিধান ইসলাম কোন প্রকার ভৌগোলিক, ভাষা ভিত্তিক বা গোত্রীয় জাতীয়তায় বিশ্বাস করে না এবং বিশ্বাস করে এক বিশ্ব, এক আল্লাহ, এক জাতি ও একমুখীনতায়। এরই ভিত্তিতে সম্ভব বিশ্বায়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন।

ইসলামের বিশ্বজনীনতা মানুষকে মূল্যায়ন করেছে মানুষ হিসাবে। ইসলামী বিশ্বায়নের ধারণায় সবলের উপর দুর্বলের আধিপত্য নেই, আছে একটা সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। বৃহৎ শক্তি ও দুর্বল শক্তি বলে কিছু নেই। পাশ্চাত্য আর প্রাচ্য বলে কিছু নেই। তৃতীয় বিশ্বের কোন ধারণা নেই। ভেটো প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন দেশের স্বীকৃতি নেই।

ইসলামী বিশ্বজনীনতার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে যদি তোমাদের বা পিতা মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায় তবুও।" আল্লাহপাক আরও এরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই আল্লাহকে ভয় করার অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।" ইসলামের সত্যিকার অনুসারী নিজের অথবা আপনজনের স্বার্থ বিরোধী হলেও ন্যায়ের পক্ষে থাকবে। অন্যায় ও যুল্মের পক্ষে থাকবে না। কোন জাতির প্রতি তার কোন ধরনের শত্রুতা তাকে ন্যায়চ্যুত করবে না। এতো উন্নত নৈতিকতার তাকিদ একমাত্র ইসলামেই আছে।

মুসলিমরা আবেগনির্ভর হয়ে বরং বাস্তবতার ভিত্তিতে বিশ্বাস করে ইসলাম যে বিশ্বজনীন ধারণা দিয়েছে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও ব্যাপক বিশ্বজনীন ধারণা আর হতে পারে না। তা যে নামেই হোক না কেন।

মুসলিমগণ আল্লাহর যে মহান দীনের অনুসারী- সে দীন নিজেই বিশ্বজনীন। তাই মুসলিমদের নতুন করে কোন ধরনের বিশ্বায়নের আহ্বানে সাড়া দেয়ার প্রয়োজন নেই বরং কেউ বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে চাইলে ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে।

বিশ্ব মুসলিমের অবস্থান

- বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের বেশী মুসলিম।
- বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা ১৩০ কোটি।
- ৫৭টি ওআইসিভুক্ত দেশে মুসলিম জনসংখ্যা ৯০ কোটি।
- বিশ্বের বাকী দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যা ৪০ কোটি।
- ইউরোপে মুসলিম জনসংখ্যা ৩ কোটি।
- উত্তর আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা ১ কোটি।
- ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম।
- ৫৭টি মুসলিম দেশ পৃথিবীর ২৩% ভূমির অধিকারী।
- ভূ-রাজনৈতিক [এবড়-চড়ষরঃরপধষ] কৌশলগত স্থানে মুসলিম দেশগুলো অবস্থিত।

অর্থনৈতিক অবস্থান

- ১৩% আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (নিজেদের মধ্যে)।
- ৮৭% বাণিজ্য বহির্বিশ্বের সাথে।
- বিশ্ব অর্থনীতিতে মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী অবস্থান।
- সকল মুসলিম দেশই উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত।
- ৫টি মুসলিম দেশ উচ্চ মানব উন্নয়নভুক্ত।
- ২৫টি মুসলিম দেশ মধ্য মানব উন্নয়নভুক্ত।
- ২৭টি মুসলিম দেশ নিম্ন মানব উন্নয়নভুক্ত।
- মুসলিম বিশ্ব বেশ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনৈতিক পরাশক্তি ছিল।
- বিগত ৩০০ বছর ধরে পশ্চাদপদ।
- আবারো শক্তিশালী রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা।
- পশ্চাদপদতার কারণ এবং ভুল ভ্রান্তি চিহ্নিত করণে প্রচুর চিন্তা ভাবনা হচ্ছে।

www.pathagar.com

● নৈতিক এবং আদর্শিক চিন্তাধারার পুনরুদ্ধার করাটাই সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হচ্ছে।

বিশ্বায়নের সম্ভাবনা ও মুসলিম বিশ্ব

বিশ্বায়নের প্রভাবে বিভিন্ন জোট ও সংস্থার আত্মপ্রকাশের ফলে ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত মুসলিম দেশগুলো প্রায় ১০টি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোটের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মূলত মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায়। যেমন:

১. পারস্পরিক সহযোগিতা

অতিরিক্ত পুঁজির অধিকারী ধনী মুসলিম দেশগুলো তাদের বাড়তি পুঁজি কখনো ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত দরিদ্র মুসলিম দেশগুলোতে বিনিয়োগ করে না। এর দু'টি কারণ আছে বলে মনে হয়।

প্রথমতঃ এই অতিরিক্ত মূলধন তারা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে বিনিয়োগ করে বা সেখানকার ব্যাংকে জমা রেখে উচ্চ হারে সুদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়।

দ্বিতীয়তঃ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর স্টক মার্কেটের অদক্ষতা এবং স্বল্পোন্নত মুসলিম দেশসমূহের দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণেও তারা মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে না।

ধনী মুসলিম দেশগুলোর উচিত স্বল্পোন্নত মুসলিম দেশগুলোর পুঁজি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং দেশে তাদের অতিরিক্ত পুঁজি দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রদান করা। ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ এবং পরিকল্পনার দ্বারা তাদের সম্পূরক বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বেশী বেশী আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্য জোরদার করা প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে।

২. ওআইসি স্টক মার্কেটের উন্নয়ন

ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর স্টক মার্কেটের আরো দক্ষভাবে পুনর্গঠন করতে হবে। এজন্য অবাধ অর্থনৈতিক তথ্য প্রবাহের পাশাপাশি ব্যাপক বিদেশী বিনিয়োগ, উন্নত হিসাব নিরীক্ষণ এবং ক্রেডিট রেটিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের উন্নত ব্যবস্থাপনাই বিনিয়োগের আস্থা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৩. আগামী সহস্রাব্দের ব্যাংকিং-ক্রমবর্ধিষ্ণু ইসলামী ব্যাংকিং

বর্তমানে প্রায় ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মূলধন ইসলামী ব্যাংকসমূহ হ্যান্ডেল করছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের তহবিল ১৫০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। এ বিপুল পুঁজির যথার্থ বিনিয়োগের জন্য ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) এবং অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলোকে আরো সমন্বিত উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নিতে হবে।

www.pathagar.com

বিশ্বায়নের যুগে কিছু সম্ভাবনা

তথ্য আদান প্রদানের এক বিস্ময়কর সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে বিশ্ববাসীর জন্য। ই-টেকনোলজি এবং স্যাটেলাইটের কল্যাণে। মুসলিম বিশ্ব এ ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিলে বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সাম্প্রতিককালে আরবী টিভি চ্যানেল আল জাজিরা এ সত্যটি দিবালোকেরমত স্পষ্ট করে দিয়েছে। ওয়েব সাইট খুলে দাওয়াতী প্রচারের সুযোগ অবারিত হয়েছে। ফলে অল্প সময়ে ইসলামের সুমহান শিক্ষা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌছে দেয়া সম্ভব। এভাবে যে কোন বিষয়ে বিশ্ব জনমত গঠন করাও সম্ভব।

ইসলামী উম্মাহর জন্য কিছু কর্মকৌশল

প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ ইসলামী উম্মাহর জন্য কিছু কর্মকৌশল সুপারিশ করেছেন। যেমন:

১. ইসতিকামাত বা দৃঢ়তা বা অবিচলতা : ইসতিকামাত হচ্ছে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করা এবং আল্লাহর দীন যে রূপ আছে তার উপর পূর্ণ আস্থা, দৃঢ় বিশ্বাস এবং ধৈর্য ও স্থীরসহকারে এর উপর অটল থাকা। স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ভবিষ্যাৎ সম্পর্কে স্বীয় পরিমাপ, মুসলিম জাতির প্রকৃত মর্যাদা, তার শক্তির উৎস এবং দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার মূলনীতি, মিশন ও বিশেষ কার্যকর প্রোগ্রাম সম্পর্কে কোনরূপ আপোষ না করা। ষড়যন্ত্রমূলক বিশ্বায়নের মুকাবেলায় অবিচলতা হবে ইসলামী উম্মাহর কর্মকৌশলের প্রধান ভিত্তি। আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা, একমাত্র তাঁর শক্তির উপর ভরসা করা ও ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আপন অবস্থানে অটল থাকা ঈমানদারের নীতি ও বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যেই তার স্থায়িত্ব ও ইহ-পরকালীন সাফল্য নিহিত।

২. প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা : উদ্দেশ্যের সঠিক উপলব্ধি, কর্মতৎপরতার পূর্ণ জ্ঞান, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরিকল্পনা তৈরি, উপায়-উপকরণ ও প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ হাসিল করার কার্যকরী প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কার্যত সেগুলো লাভ করে ও যথাসময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করাই হবে এক্ষেত্রে সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূল চাবিকাঠি।

৩. মধ্যপন্থা ও উদারতা : ইসলামের শেখানো মধ্যপন্থা ও উদারতা কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।

৪. ন্যায়-নিষ্ঠা : ন্যায় ও ইনসাফের নীতি কখনো হাতছাড়া করা যাবে না। এমনকি বিরোধিতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঝগড়া-ঝাঁটি, তর্ক-বিতর্ক সর্বক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফের পথে কায়েম থাকতে হবে।

৫. পৌরুষোচিত প্রতিযোগিতা : ইসলামী উম্মাহর জন্য প্রতিযোগিতা এবং পৌরুষোচিত প্রতিযোগিতা হচ্ছে জীবন ও অস্তিত্ব বজায় রাখার পথ।

৬. ফালাহ অরিয়েন্টেড হওয়া : আল্লামা রাগিব ইসপাহানির মতে, ফালাহ পার্থিব জীবনের জন্য ৩টি অর্থ তুলে ধরে। যেমন–

ক. বাকা (Survival)।

www.pathagar.com

খ. ঘ্যানা (Freedom from Want)।
গ. ইজ্জ (Power & Honour) -ক্ষমতা ও সম্মান।
আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য ফালাহ'র চারটি অর্থ হচ্ছে–
ক. বাকা বিল ফানাহ (Eternal Survival)।
খ. ঘ্যানা বিল ফকর (Eternal Properity)।
গ. ইজ্জ বিল দুউল (Everlasting Glory)।
ঘ. ইলম বিল জাহেল (Knowlege Free all Ignorance)।
ড. শেখ মসকুদ আলী 'ফালাহ'র তিনটি অর্থ করেছেন–
ক. অপরের সুখ কামনা করা (Wish happiness)।
খ. অন্যের সুখে সুখী হওয়া (Share happiness)।
গ. অপরের দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নেয়া (Share sufferings)।

৭. আদল ও ইহসান : আদল ও ইহসান উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। আল মাওয়ার্দীর মতে, অন্যায়-অবিচার-জুলুম যত দ্রুত ধ্বংসাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে এবং বিবেককে পংগু করে দেয় অন্য কোন কিছু তা পারে না। অন্যদিকে আদল ও ইহসান সম্পদের প্রসার ঘটায় ও দেশের উন্নতি সাধন করে।

৮. গ্রান্ট বা ট্রান্সফার ম্যাকানিজমের যথাযথ ব্যবহার : সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরির জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামের ট্রান্সফার ম্যাকানিজমগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। ভোগ কমাতে হবে। ট্রান্সফার বেশী করতে হবে।

৯. সকলকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা : জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।

১০. বন্টন : আয় ও সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংকে জনপ্রিয় করা : ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে হবে। এতে ইসলামের চর্ষংধষরংস জনসমক্ষে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

১২. আত্মনির্ভরশীলতা : আত্মনির্ভরশীলতার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, একটি জাতি তার বুনিয়াদি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত কোন চাপের ও নিরুপায় অবস্থার মুখে নয় বরং নিজেদের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, নীতিমালা ও ন্যায়ানুগ স্বার্থের ভিত্তিতে গ্রহণ করবে এবং নিজের ভেতরে এমন চৈন্তিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি রাখবে যার দরুন অন্যরা তার সিদ্ধান্তসমূহের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

১৩. এক সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রাস প্রোগ্রাম গ্রহণ করা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেরূপ ইউরোপে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে এখন মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তিগত শক্তি অর্জন এবং ক্ষুদ্র ও পুঁজি সৃষ্টি (Asset Creation) উদ্দেশ্যে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া। মুসলিম মূলধন নিরাপত্তা করার এটাই মাধ্যমও উপায় যে, তা মুসলিম দেশসমূহের মূলধন সৃষ্টিতে

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হবে।

উপসংহারে বলা যায় সত্যিকার বিশ্বায়ন একমাত্র ইসলামের দ্বারাই সম্ভব। বিশ্বায়ন যদি সমতাপূর্ণ, সহযোগিতা ভিত্তিক হয় তবে তা আশির্বাদ কিন্তু দুর্বলকে শোষণ এবং বিশ্বায়নের ছদ্মবেশে দুর্বলকে শাসন করা গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে আজ থেকে ৬শো বছর পূর্বে প্রদত্ত ইবনে খালদুনের মন্তব্য বলে মনে হয়। রাষ্ট্র শাসককে পরামর্শ দিতে গিয়ে ইবনে খালদুন বলেছিলেন The strenght of the sovereign (al-mulk) does not become consummated except by implementaiton of the shariah...;

The Shariah cannot be implemented except by a sovereign (al-mulk);

The sovereign cannot gain strenghth except through the people (al-rijal);

The people cannot be sustained except by wealth (al-mal);

Wealth cannot be acquired except through development (al-imarah);

Development cannot be attained except through justice (al-adl);

Justice is the criterion (al-mizan) by which Allah will evaluate mankind; and The sovereign is cahrged with the responsibility of actualising justice, with Allah; it is no less concerned with man's just relationship with all other humans and the universe. অর্থাৎ :

–সার্বভৌম ক্ষমতা ছাড়া শরীয়াহর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।
–জনগণ ব্যতীত সার্বভৌমত্ব অর্থহীন।
–সম্পদ ছাড়া জনগণ অর্থহীন।
–উন্নয়ন ব্যতীত সম্পদ অর্জন অসম্ভব।
– ন্যায় বিচার ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।
–ন্যায় বিচার তাই-যা দ্বারা আল্লাহ মানুষের কর্মকাণ্ডকে মূল্যায়ন করবেন।
–সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ।
–সরকার ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবে–এ মর্মে সরকার দায়িত্ব লাভ করেন।

শরীয়াহর বাস্তবায়ন

–শরীয়াহর জন্য সার্বভৌমত্ব।
–সার্বভৌমত্বের জন্য জনগণ।
–জনগণের জন্য সম্পদ।
–সম্পদের জন্য উন্নয়ন।
–উন্নয়নের জন্য ন্যায় বিচার।
–ন্যায় বিচারের জন্যই সরকার। ■

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. Paul Hirst and Grahame Thomson, Globalization in Question : The International Economy and Possibilities of Governance, Cambridge/Malden, Polity Press, 1998, P-1

২. দ্র: Samsad English-Bengali Dictionary (Calcutta; Sahi Samsad, December, 1996) পৃ: ৪৬৫ Globalization শব্দটি নেই। বাংলা-ইংরেজী সংসদ (২য় সংস্করণ, ১৯৮২) বাংলা-বাংলা সংসদে (৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৪) 'বিশ্বায়ন' শব্দটি নেই। অথচ বিশ্ব শব্দ থেকে প্রায় পঞ্চাশটি শব্দের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এমনকি দুনিয়া জুড়ে প্রসিদ্ধ ইংরেজী-ইংরেজী অক্সফোর্ড অভিধানেও (নয়া দিল্লী থেকে প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০২) Globalization শব্দটি নেই।

৩. H. F Vermeulen and A.A Roldam (ed) 'Fieldwork and Foot Notes' Studies in the History of European Anthroplogy, London, 1995 গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ১

৪. Alan Rugman, the End of Globalization (Washington, Many Rivers Press, 2000) P. 4

৫. এলেন রুগম্যান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৬. আবেদা সুলতানা, বিশ্বায়ন ও শ্রম শক্তিতে নারী : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ৭৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-২০০৩, পৃ. ৪৭

৭. ড. মোঃ আজিজুর রহমান, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের অর্থনীতি শীর্ষক বিশেষ সম্মেলনে বিশ্বায়নের আলোকে বাণিজ্য ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে পৃ. ১

৮. M. Confirius, Angst vor dem nuen Denken? (নব্য চিন্তাধারার আতঙ্ক) in; Rote Blaetter (দর্শন পত্রিকা) No 10/88, Frankfurt P. 13

৯. প্রফেসর ড. খুরশিদ আহমেদ- ইউকে ইসলামিক মিশনের সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকের সাবেক মহা পরিচালক, লাহোর থেকে প্রকাশিত মাসিক তরজুমানুল কুরআন পত্রিকার সম্পাদক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ এবং জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান নায়েবে আমীর। তিনি ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকার জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ ২০০৪ সংখ্যায় গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে তার মূল্যায়ন তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে মুসলমানদের কর্মকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য Impact International জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৪ সংখ্যার ৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা এবং মার্চ সংখ্যার ৩৫-৩৮ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

১০. প্রসেফর ড. খুরশীদ আহমেদ, আমেরিকার আগ্রাসন মুসলিম উম্মাহর কর্মকৌশল, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, মে ২০০৩, পৃ. ১৫

১১. প্রখ্যাত সাংবাদিক, গবেষক, লেখক বহু গ্রন্থ-প্রণেতা এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ও সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম

১২. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার আয়োজিত 'বিশ্বায়ন' শীর্ষক সেমিনারে (১০ই এপ্রিল ২০০৪) প্রদত্ত সভাপতির বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত

১৩. দ্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ জুলাই, ২০০১ সংখ্যা

১৪. মে দিবস, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ। দ্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, ৩ মে ২০০৪, পৃ. ১

১৫. বিশ্ব সামাজিক ফোরাম (WSF) এর ব্যানারে গত ১৬ই জানুয়ারী ২০০৪ ভারতের মুম্বাই মহানগরীতে আয়োজিত বিশ্বায়ন বিরোধী চতুর্থ বার্ষিক বিশ্ব সমাবেশে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রাজিলের চিকো হোয়াইটেকার এর বক্তৃতা থেকে। দ্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৭ই জানুয়ারী ২০০৪, পৃ. ১। উল্লেখ্য এ সমাবেশটি ছিল বিশ্বায়ন বিরোধী পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রতিবাদ সমাবেশ। এ বিশ্ব সমাবেশে পৃথিবীর একশোটিরও অধিক দেশের লক্ষাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

১৬. সৈয়দ ফারুক হোসেন, বিশ্বায়ন : পা ফেলতে হবে সতর্কতার সাথে (প্রবন্ধ), দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৭ জুলাই, ২০০৪, পৃ. ৬
১৭. : সূরাতুল ফাতিহা, আয়াত-১
১৮. : সূরা আল আরাফ, আয়াত-১৫৮; এবং সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত-১০৭
১৯. : সূরা আত তাকভীর, আয়াত-২৭
২০. : সূরা নিসা, আয়াত-১
২১. : সূরা আল হুজুরাত, আয়াত-১৩
২২. : সূরা আল বাকারা, আয়াত-২১
২৩. সূরা আন আন নিসা, আয়াত-১৩৫
২৪. : সূরা আল মায়েদা, আয়াত-৮
২৫. UNDP Report 2000 P. 156-160
২৬. সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। গত ৩১শে জুলাই ২০০৪ ইসলামী ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো আয়োজিত 'Structural Characteristics and Development in an Islamic Perspective' শীর্ষক সেমিনারে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

লেখক-পরিচিতি : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম- বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষক, লেখক এবং ব্যাংকার।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৮ই আগস্ট, ২০০৪ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদ

অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ

■

১. **প্রস্তাবনা** : আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ যুগে যুগে পৃথিবীর ইতিহাসকে করেছে কলংকিত আর পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশ অতীতে জাতীয় স্বার্থ রূপায়ণের একটি মাধ্যম হিসাবে একে প্রয়োগ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং উপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পশ্চিমা দেশগুলো নানা অজুহাতে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর তাদের শাসন চালিয়ে আসছে এভাবেই। অতীতে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিকবাদ, নব্য সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি নানা নামে মূলত দুর্বল দেশগুলোর উপর শোষণ আর নির্যাতন চালানো হয়েছে। বর্তমানে এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় বিশ্বায়নের নামে আসলে সেই পুরানো শোষণ ও নির্যাতনকেই স্বার্থক করতে চাচ্ছে পশ্চিমা শক্তিশালী দেশগুলো। যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদের আলোচনায় আমরা সেই ইতিহাসকেই তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

উল্লেখ্য, পবিত্র আল কুরআনের ঐতিহাসিক সত্যতার মাধ্যমেও আমরা আদ-সামুদ জাতি বা নমরূদ-ফিরাউনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পর্কে অবগত হতে পারি। ইসলাম আল্লাহর একক ও নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যক্তি, দেশ বা আদর্শের সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী আধিপত্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে : দুনিয়া অস্থায়ী; স্থায়ী আখিরাতের শস্যক্ষেত্র মাত্র। ফলে দুনিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নামে সবল কর্তৃক দুর্বলের বিরুদ্ধে শোষণ-নির্যাতন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য। ইসলামিক পণ্ডিত সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসতত্ত্বের জনক ইবনে খালদুনও বলেছেন : সভ্যতা বা সাম্রাজ্য চক্রাকারভাবে উৎপত্তি থেকে বিকাশের চূঁড়ায় উঠে অবশেষে অনিবার্যভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

www.pathagar.com

ইতিহাসের এই শিক্ষা সত্ত্বেও আমরা আমাদের চোখের সামনে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র তাণ্ডবতা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি। নানা নামে বা অবয়বে এই তাণ্ডব মানুষের স্বাধীনতা, মুক্তি ও মানবতাকেই অপদস্থ করে না; রক্তাক্তও করে বটে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিকবাদ, নব্য সাম্রাজ্যবাদ বা বিশ্বায়নের এককেন্দ্রিকতাবাদের মাধ্যমে এহেন রক্তপাত আজও আমরা প্রত্যক্ষ করে চলেছি।

অতএব 'যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদ' কিভাবে বা কি নামে মানবতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষ ও পৃথিবীর কিভাবে ক্ষতি করে চলেছে তা অনুধাবনের জন্য এর অর্থ, স্বরূপ, উৎপত্তি, বিকাশ ও ধারাবাহিকতাকে বুঝতে হবে।

২. ভূমিকা : যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদের কবলে পৃথিবীর নানা দেশের অসংখ্য মানুষ অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। যা বিশ্ব শান্তির শত্রু এবং সভ্যতার বিঘ্নস্বরূপ। সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে অনিয়ন্ত্রিত জাতীয়তাবাদ। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, যা বিভিন্ন দেশের শক্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার উপর আঘাত হানে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় এই শোষণের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব রাজনীতিতে নতুনরূপে এবং নতুনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। যার পরিবর্তিত রূপ হলো নব্য উপনিবেশবাদ, যা আরো পরিবর্তিত হয়ে বিশ্বায়নের নামে চালানো হচ্ছে। আর সাম্রাজ্যবাদ তার উৎপত্তির লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে বিশ্ব রাজনীতিকে প্রভাবিত করে আসছে তা অনুভব করা আধুনিক বিশ্বব্যবস্থাকে জানার প্রয়োজন খুবই জরুরি।

৩. সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি : সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিশ্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য বা তারও পূর্বে আলেকজান্ডারের ম্যাসিডোনিয়ান সাম্রাজ্য প্রাচীনতম সাম্রাজ্যের উদাহরণ। রোমান শব্দ "ইম্পেরিয়াল" থেকে "ইম্পেরিয়ালিজম" শব্দটির উদ্ভব হয়েছে, যার অর্থ হলো : অবাধ সামরিক অধিনায়কত্ব, অর্থাৎ এক বা একাধিক সামরিক অধিনায়কের হাতে সকল ক্ষমতা পুঞ্জিভূতকরণ বা একত্রীকরণ। অতীত যুগের অধিকাংশ ইতিহাসই সাম্রাজ্য স্থাপন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস। সেই ইতিহাসে আলেকজান্ডার, চেংগিস খাঁ ও নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মূলত নেপোলিয়ানের অনুসারীদের সনাক্ত করার জন্য "ইম্পেরিয়ালিট" শব্দটি ব্যবহার করা হতো। তখন নেপোলিয়নের আগ্রাসী নীতিকে বুঝানোর জন্য "ইম্পেরিয়ালিজম" কথাটি নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীকালে ব্রিটেনে নেপোলিয়নের সমালোচকরা একে এই নিন্দাসূচক অর্থেই ব্যবহার করতে থাকেন। পরে ডিজরেলির সমালোচকগণ "ইম্পেরিয়ালিজম" শব্দটিকে দেশীয় নিন্দাসূচক শব্দরূপে প্রয়োগ করেন।

পরবর্তীকালে অনেক ইংরেজ লেখক ও রাজনীতিবিদ সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যয়টির নিন্দামূলক দিকটি বাদ দিয়ে এর নতুন অর্থ নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হন। ক্রমে তা ভূখণ্ড প্রসারের মাধ্যমে 'বৃহত্তর ব্রিটেন' গঠনের নীতিরূপে গ্রহণ করা হয়। এভাবেই সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি ধীরে ধীরে উপনিবেশিক শাসনের সাথে যুক্ত হয়।

www.pathagar.com

৪. সাম্রাজ্যবাদ : সাম্রাজ্যবাদ হলো সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। অপর রাজ্য গ্রাস করে বা রাজ্য জয় করে, সেই অঞ্চলের মানুষকে জোর করে বিদেশী শাসনাধীনে আনা এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করাই হল সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ অর্থ- বিদেশী শাসন ও শোষণ। কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রে আগ্রাসন বিস্তার করলে তাকে সাম্রাজ্যবাদী বলে আখ্যা দেয়া হয়।

সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদ বলতে এমন একটি নীতিকে বুঝায় যার লক্ষ্য হলো একটি সাম্রাজ্য গঠন, এজন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা বা সংগঠন গড়ে তোলা এবং তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নীতি অবলম্বন করা।

৫. সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা : সাম্রাজ্যবাদকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যথা :

- T. Moon-এর মতে, "অ-ইউরোপীয় দেশীয়দের উপর সম্পূর্ণ বিজাতীয় ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রাধান্যই হলো সাম্রাজ্যবাদ।"
- H.G.Wells-এর মতে, "একটি সচেতন জাতীয় রাষ্ট্রের পৃথিবীব্যাপী প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টাই হলো সাম্রাজ্যবাদ।"
- Professor Schuman-এর মতে, "একটি দেশের জনগণের উপর বল প্রয়োগ ও হিংসার মাধ্যমে বৈদেশিক শাসন চাপিয়ে দেওয়াকে সাম্রাজ্যবাদ বলে।"
- Morgenthau বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ বলতে কোনো রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে তার ক্ষমতার সম্প্রসারণকেই বুঝায়।"
- Mortiz Julius Bonn-এর ভাষায়, "সাম্রাজ্যবাদ হলো এক বিশাল আয়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্র যা কমবেশী নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত এবং একটি কেন্দ্রীভূত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত।"
- Webstar-এর ভাষ্য মতে, "যখন একটি দেশ নিজের স্বার্থে অন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনাশ বা সংকুচিত করে তার উপর নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করে তখনই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়।"
- লেনিন তাঁর "ইম্পেরিয়ালিজম : দ্যা হায়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম" গ্রন্থে বলেন, সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়। মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ও প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের জন্যই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়েছে।

সুতরাং উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে আমরা সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দিতে পারি এভাবে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাকে সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়। মূলত সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায় সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়। সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্যই হলো অনুন্নত অঞ্চলের জনগণকে অবহেলা এবং উন্নত দেশের স্বার্থ রক্ষা করা।

৬. সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি : সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে যুগে যুগে তার বিকাশের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। নিম্নে সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের তিনটি প্রধান স্তর উল্লেখ করা হলো :

৬.১. প্রথম স্তর : ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকে ১৭৩৬ সাল পর্যন্ত প্রথম স্তর ধরা হয়।

www.pathagar.com

এই স্তরে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বণিক বৃত্তির প্রভাব এবং ধর্মীয় মতদ্বৈততা ও খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। এর ফলে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের কাছে এক নয়া বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ ও উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক অঞ্চল বিদেশী শাসন ও শোষণের অধীনস্থ হয়। ইউরোপের বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা এ সময়ে বাণিজ্যের অজুহাতে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করে।

৬.২. দ্বিতীয় স্তর : ১৭৩৬ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তর ধরা হয়। এই স্তরে শিল্পবিপ্লব, অর্থনৈতিক বিকাশ, জাতীয়তাবাদের প্রসার প্রভৃতি ইউরোপের উন্নত দেশগুলোকে সাম্রাজ্য বিস্তারে উৎসাহিত করে। সাম্রাজ্যের প্রসারকে জাতীয় মর্যাদা ও আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রতিক বলে মনে করা হয়। এ সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্পেন, ইতালী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, পর্তুগীজ, ইংল্যান্ড প্রভৃতি খৃস্টবাদী-ইউরোপীয় দেশগুলোর মাধ্যমে।

৬.৩. তৃতীয় স্তর : ১৮৭০ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়কালকে তৃতীয় স্তর ধরা হয়। এই স্তরের প্রথমার্ধে এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে অতি দ্রুত সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিমা দেশগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষাকল্পে অর্থাৎ কাঁচামাল সংগ্রহ ও তা থেকে উৎপন্ন ফিনিস প্রোডাক্ট বিক্রয়ের বাজার ধরার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ভূখণ্ডগত অধিকার বজায় রাখার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সরাসরি করতলগত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী-সম্প্রসারণবাদী ধারার অবসান হয়।

৭. সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য : সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞার মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়, তবে সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। সাম্রাজ্যবাদকে যারা গতানুগতিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তারা প্রধানত সাম্রাজ্যবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন:

৭.১. অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য : সাম্রাজ্যবাদের পিছনে একাধারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণত অর্থনৈতিক লাভই সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য, তবে অর্থনৈতিক লাভের প্রত্যাশা না করেও সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গৃহীত হতে পারে।

৭.২. রাজনৈতিক অধিকার হরণ : অন্যের রাষ্ট্র দখল করে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐ দেশের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব অধিকৃত এলাকার জনগণের উপর নির্যাতন চালায় এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হত্যা ও নির্যাতন করে।

৭.৩. সাংস্কৃতিক বৈষম্য সৃষ্টি : সাংস্কৃতিক বৈষম্য সৃষ্টি করা সম্রাজ্যবাদের অপর এক বৈশিষ্ট্য। বিনামূল্যে বই, অশ্লীল ছবি ও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিতে অধিকৃত এলাকার জনগণের উপর শ্রেষ্ঠ বলে চাপিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

৭.৪. অন্য রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ : সাম্রাজ্যবাদের অপর বৈশিষ্ট্য হলো জোর করে অন্য রাষ্ট্র দখল করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা। অন্যের রাজ্য দখল অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য তবে তা বিরাট এলাকা জুড়েও হতে পারে আবার ক্ষুদ্র এলাকা জুড়েও হতে পারে।

৭.৫. পুঁজিবাদের প্রাধান্য : সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদকে সমর্থন করে। পুঁজি গঠনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ অধিকৃত এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৭.৬. সামরিক প্রাধান্য : সাম্রাজ্যবাদের অপর বৈশিষ্ট্য হলো সামরিক বাহিনীর প্রাধান্য। সাম্রাজ্যবাদীরা সামরিক শক্তির বলে অন্য দেশকে দখল করে এবং নিজ সাম্রাজ্যকে অন্যের হুমকি থেকে রক্ষা করে।

৭.৭. প্রাধান্য বিস্তার : সাম্রাজ্যবাদ প্রধানত এক জাতির উপর অন্য জাতির প্রাধান্য বিস্তার করে। বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে নিজেদের অধীনে আনার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বল প্রয়োগ করে, এমনকি গণহত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটাতে প্রস্তুত থাকে।

৭.৮. সার্বিক নিয়ন্ত্রণ : সাম্রাজ্যবাদের প্রধান লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে অবহেলা করা এবং ঐ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করা। ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশ তার অধিকৃত এলাকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. মার্কসবাদী ব্যাখ্যা : সাম্রাজ্যবাদের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে সমাজতন্ত্রকে জাহির করতে গিয়ে লেনিন তার বিখ্যাত রচনা "ইম্পেরিয়ালিজম : দ্যা হায়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম" গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

৮.১. উৎপাদন ব্যবস্থা ও পুঁজির কেন্দ্রীয়করণ : সাম্রাজ্যবাদের ফলে পুঁজি বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত হয়। তার ফলে একচেটিয়া কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়, যা অর্থনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। গত শতাব্দীর গোড়াতেই প্রত্যেক উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই এবং বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও জার্মানীতে তা ঘটেছে। উৎপাদন ও পুঁজির এই রকম কেন্দ্রীয়করণের ফলে প্রত্যেক শিল্পেই গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান মোট ব্যবসায়ের একটি ব্যাপক অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

৮.২. মহাজনি মূলধনের সৃষ্টি : সাম্রাজ্যবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো মহাজনি মূলধনের সৃষ্টি। অর্থাৎ শিল্পের কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঙ্গে ব্যাংকের কেন্দ্রীভূত পুঁজির মিলন হয় এবং তাতে করে এই মহাজনি মূলধনের জন্ম হয়। এসব মহাজনি মূলধনের মালিকানা বিদেশীদের হাতেই থাকে।

৮.৩. পুঁজি রপ্তানি : পুঁজি রপ্তানি সাম্রাজ্যবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদের একচেটিয়া পর্যায়ে বা সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণযুগে আর্থিক পুঁজির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় পুঁজির রপ্তানি। পুঁজিবাদের এই পর্বে পুঁজিপতিরা কেবল নিজের দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করতে পারে না। এই অবস্থায় তারা বিদেশে লাভজনক

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে উদ্যোগী হয়। এইভাবে পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

৮.৪. বৈদেশিক বাজার নিয়ন্ত্রণ : সাম্রাজ্যবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বৈদেশিক বাজার নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই বিশ্বের অনুন্নত এলাকাকে দখল করে উদ্বৃত্ত পণ্যাদির এবং উদ্বৃত্ত বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির বাজার হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সংস্থা গঠন করেও বিদেশের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা ক্ষণস্থায়ী হয়। ইতিহাসের এ পর্যায়ে এ সকল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। অবশেষে পুঁজিবাদের পতন ঘটে।

৮.৫. বিশ্বের ভূখণ্ড বণ্টন : সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বের ভূখণ্ড বণ্টন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ বিশ্বের সকল ভূখণ্ড ভাগ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। ফলে পরবর্তী পর্যায়কে এক সাম্রাজ্যবাদী অধিকৃত অঞ্চল দখল করা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার সম্ভব ছিল না। পুঁজিবাদের ফলে বাজার দখল ও কাঁচামালের প্রয়োজন অধিকতরভাবে অনুভূত হয়। ফলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব কারণে সাম্রাজ্যবাদের বাস্তবরূপ হলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে অবস্যম্ভাবী বিরোধ। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এমনটি দেখা গেছে। পরবর্তীতে অধিকৃত দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে এবং পরাধীন দেশগুলো স্বাধীনতা অর্জন করে।

লেনিন-এর সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার পর এটাই প্রতীয়মান হয় যে, লেনিন প্রধানত পুঁজিবাদের প্রেক্ষাপটেই সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু পুঁজিবাদের উদ্ভবের পূর্বেই ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেন, পর্তুগাল, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ঐ সময় সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য মূলত অর্থনৈতিক লাভ ছাড়াও জাতীয় মর্যাদা, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধর্মী প্রচার এবং ক্ষমতার লোভকে কেন্দ্র করে পরিলক্ষিত হয়। অলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য বিস্তার, মোঘল সাম্রাজ্য বিস্তার এবং হিটলারের সাম্রাজ্য বিস্তারের বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে অনেকভাবে অ-অর্থনৈতিক ছিল। ফলে মার্কসীয়, লেনিনীয় ব্যাখ্যা একদর্শী ও অসম্পূর্ণ।

৯. সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও বিকাশ : সাম্রাজ্যবাদ হলো বিশ্ব ইতিহাসের একটি যুগান্ত কারী ঘটনা। এর উদ্ভব ও বিকাশের অনেক কারণ রয়েছে। একটি রাষ্ট্র কেন সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে তা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

৯.১. ক্ষমতার লিপ্সা : এক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়ক নিজের দেশের জনগণের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সৃষ্টি করে। কারণ রাষ্ট্রনায়ক যখন মনে করে, আমরা সকল দেশের সেরা, আমরা সমগ্র বিশ্বকে শাসন করবো। তখন সে রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী হতে বাধ্য; যেমন হিটলার করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, "আমরা আর্য, আমরা পৃথিবীর সেরা জাতি।

www.pathagar.com

সুতরাং আমরা এই বিশ্ব শাসন করার অধিকারী।" বর্তমান বিশ্বেও নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি
বিস্তার করার জন্য অন্যদেশ দখল করার প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। যেমনঃ বিশ্বায়নের নামে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার নেতৃত্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনটি করে যাচ্ছে। Schuman যথার্থই বলেছেন : "আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ হল ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা এবং বিজয় স্পৃহার এক নবতম অভিব্যক্তি বিশেষ।" যা আমরা বর্তমানে লক্ষ্য করছি।

৯.২ আত্মমর্যাদা ও ঐতিহ্য রক্ষা : নিজের আত্মমর্যাদা, গৌরব ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর শুরু থেকে যেসকল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন হয়েছে, তা এ সত্য প্রমাণ করে। প্রাচীনকালে আলেকজান্ডার নিজের গৌরব, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য একের পর এক রাজ্য দখল করেছে। এরপর নেপোলিয়ান জয়ের নেশায় বিভোর হয়ে নিজ মর্যাদা ধরে রাখার জন্য ইউরোপের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে। তিনি মনে করতেন আক্রমণ করলেই জয়ী হওয়া যায়। পরে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগীজ এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হলো : 'কে বেশী রাষ্ট্র দখল করতে পারে।' তাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং লুপ্ত গৌরব ফিরে পাওয়া। সাম্রাজ্যের প্রসার, জাতীয় মর্যাদা এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রতীকে পরিণত হয়। অর্থাৎ যে বেশী রাষ্ট্র দখল করতে পারবে তার মর্যাদা তত বেশী বৃদ্ধি পাবে। এভাবে রাষ্ট্রগুলো সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে।

৯.৩. অর্থনৈতিক স্বার্থ : সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পিছনে যে কারণটি সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা হলো অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অর্জন। সতের শতকে শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে এক ধরনের ব্যবসায়ী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসা করতে এসে তারা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। অন্যদিকে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজন হত নতুন বাজার দখলের। এভাবে তারা রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে একসময় রাষ্ট্র দখল করে নেয়। প্রাচীন রোম বাণিজ্যিক স্বার্থেইফ্র-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নিজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হয়েছিল। ইংল্যান্ড, স্পেন, জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, পর্তুগাল প্রভৃতি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। পরবর্তীকালে এসব দেশকে তারা নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছে। উপনিবেশিক শাসন আমলে দেখা গেছে এই উপমহাদেশে ব্যবসার অজুহাতে এসে কাঁচামালের সহজ প্রাপ্যতা ও অর্থনৈতিক শ্রম বিভাজন নীতির মাধ্যমে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ পর্যন্ত এদেশ দখল করে রেখেছিল ইংরেজরা। ১৮৮৬ সালে বার্লিন চুক্তিপত্র সমগ্র আফ্রিকাকে ইউরোপের উন্নত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। এভাবে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক কারণেই সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার নীতি অনুসরণীয় হয়ে আসছে। বর্তমানে Multi national company এই কাজ করছে। যেমন আফগানিস্তান, ইরাক হামলা ইত্যাদি ঘটনার মূলেই রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ বা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব (তেল, গ্যাস, বাজার দখল) বজায় রাখা।

www.pathagar.com

৯.৪. উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসন : সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের কারণ হিসাবে অনেকে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সবগুলি ইউরোপীয় দেশেই জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্ধিত জনসংখ্যা সংকুলানের ক্ষমতা রাষ্ট্রগুলোর ছিল না। যেজন্য উপনিবেশ স্থাপন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং এশিয়ায় বিপুল সংখ্যক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পরে তারা সেখান থেকে ফিরে না এসে বরং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে এবং তারা ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবিস্তারের লিপ্সায় মেতে ওঠে।

৯.৫. আদর্শ প্রতিষ্ঠা : অনেকে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের কারণ বলে অভিহিত করেন। এরা মনে করেন, অনুন্নত দেশগুলোতে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেয়াই হলো ইউরোপীয় জাতিগুলোর উদ্দেশ্য। নিজেদের আদর্শ টিকিয়ে রাখার জন্য এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে। এভাবে তৈরি হয় কলোনী বা উপনিবেশ।

প্রাচীনকালে বৃটেন অনেক রাষ্ট্র দখল করে তাদের আদর্শ চাপিয়ে দেয়। ফ্রান্স "আলেকজান্ডার দি গ্রেট"এর দ্বারা নিজের আদর্শবাদ প্রচার করার জন্য অন্য রাষ্ট্র দখল করেছিল। মধ্যযুগে ক্রুসেড যুদ্ধ হয়েছিল মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্ম ও আদর্শের জন্য। এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম যুদ্ধ। ইউরোপিয় উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদ খ্রিস্টধর্ম ও পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির প্রচারকে মিশন বলে গণ্য করতো।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদ প্রচারের জন্য কিছু কিছু রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন মধ্য এশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া এই রাষ্ট্রগুলোর উপর রাশিয়া তাদের আদর্শ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। পরে কমিউনিজমকে প্রতিহত করার এবং উদার নৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। আদর্শগত কারণেই যুদ্ধ হচ্ছে কাশ্মিরে এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। বিশ্বায়নের নামে এখন পশ্চিমা আদর্শই প্রচারিত হচ্ছে।

৯.৬. মানব-প্রকৃতি : মানুষের প্রবণতা হল অন্যকে প্রভাবিত করা। এই মানব-প্রকৃতির কারণেও সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয়। Primitive Societyতে মানুষের এক ধরনের Tendency ছিল, তারা পশু শিকার করতো। সেখানে অন্যের শিকার করা পশু লুটপাট করার প্রবণতা ছিল। এরপর শুরু হয় পশু পালন এবং কৃষিকাজ। পশুপালনকারীর জন্য তৃণভূমি এবং কৃষিভূমি জোর দখল করে অন্য গোত্র নিয়ে নিত। মধ্যযুগে এসে আমরা আরেক ধরনের প্রবণতা দেখতে পাই। এখানে কিছু রাজ্য দুর্বল রাজ্যগুলো দখল করে নিত। সামন্তপ্রভুরা নিম্ন পেশার মানুষদের অত্যাচার করতো। তখনো ভূমিদখল ও চাষ নিয়ে এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয়েছিল।

আধুনিক যুগে নেপোলিয়ন পরাজয়কে ভুলেই গিয়েছিলেন। একের পর এক রাষ্ট্র দখল করেই চলছিলেন। তেমনি হিটলার মনে করতেন তিনিই পৃথিবীর সেরা শক্তিশালী ব্যক্তি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনিও সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করেন। বর্তমানে মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মতৎপরতায় সেই উন্নাসিক মনোভাবই লক্ষ্য করা যায়। এখানে শুধু অর্থনৈতিক কারণ নয় বরং এক ধরনের Human nature এর Tendency কাজ করছে। এভাবে দেখা যায় একেক যুগে একেক রকম করে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে। মূলত Human nature এর পরিবর্তনের কারণেই এমনটি হচ্ছে।

৯.৭. পররাষ্ট্র ও কৌশলগত কারণ : সাম্রাজ্যবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো পররাষ্ট্র ও কৌশলগত দিক। বৃটেন যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দখল করেছিল সেগুলো তাদের দরকার ছিল। চীন যদি তিব্বত দখল করে না নিত তাহলে তিব্বত চীনের জন্য হুমকির কারণ হত। তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামাকে দখল করেনি বরং নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। তাও কূটনৈতিক কারণে। তেমনি ভারত সুকৌশলে কাশ্মির দখল করে নেয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কৌশলগতভাবে মজবুত থাকার স্বার্থে। এভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

৯.৮. জাতীয় নিরাপত্তা ও সাময়িক প্রয়োজন : জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটেছে বলে অনেকে মনে করনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স কর্তৃক রাইন নদী পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের উপর দাবী পেশ জার্মানীকে সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করেছিল। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে জাপান সুদূর প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে। আফ্রিকার উপনিবেশ থেকে ফ্রান্স সেনা সংগ্রহ করতো। অনেকেই মনে করেন, ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক পথকে সুরক্ষিত করার জন্য আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয়েছিল। তারা মনে করেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি প্রধান কারণ ছিল ভারতবর্ষে বৃটিশ স্বার্থকে রক্ষা করা। মিশর, সুদান প্রভৃতির রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সম্মুখীন হলে বৃটেনের রাজনৈতিক উপস্থিতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এবং মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ আরব থেকে শুরু করে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটেছিল।

১০. সাম্রাজ্যবাদের পতন : সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের পরিণাম সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির জন্য ছিল অতীব ভয়াবহ। সাম্রাজ্যবাদের ফলে বিশ্ব নিপতিত হয় অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহে ও গভীর সংকটে। সাম্রাজ্যবাদের ফলেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের আক্ষরিক পতন হয়েছে আর এ পতনের পেছনে যে সকল কারণ রয়েছে তাহলো :

প্রথমত : জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদের বিদায় ঘটে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের অধীনে থেকে অত্যাচার ও নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ায় তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে তারা মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত কাঁপিয়ে তোলে এবং তাদের পতন ঘটে।

দ্বিতীয়ত : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র রাষ্টগুলো সম্মিলিতভাবে নিজেদের রক্ষা করার মানসে এক আন্দোলনের সূচনা করে। এই আন্দোলনই হচ্ছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন। এই আন্দোলনে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের অংশগ্রহণের ফলে উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ ভীত সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জনগণও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

চতুর্থত : সাম্রাজ্যবাদের পতনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সূচনাকালীন ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের সনদে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের অবসানের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বহু রাষ্ট্র উপনিবেশবাদের অবসান কল্পে জাতিসংঘের ওপর চাপ দিতে থাকে। এমতাবস্থায় জাতিসংঘ আর নীরব হয়ে থাকতে পারেনি।

১১. মূল্যায়ন : সাম্রাজ্যবাদ হলো শোষণের হাতিয়ার। সাম্রাজ্যবাদের ফলে উন্নত দেশসমূহ অনুন্নত অঞ্চলগুলোকে শোষণ করে। তথাপি সাম্রাজ্যবাদের সার্বিক দিক মূল্যায়ন করলে দেখা যায় এর কিছু ইতিবাচক দিকও আছে যা অনুন্নত দেশকে উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে।

যেমন, কোন রাষ্ট্র শক্তিশালী হলে চিন্তার দিক থেকেও সেটি শক্তিশালী হয়। এক্ষেত্রে শক্তিশালী রাষ্ট্রটি যদি দুর্বল রাষ্ট্রকে দখল করে নেয় তাহলে দুর্বল রাষ্ট্রটির উপর শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্র যখন ঘনবসতি– সমস্যায় সম্মুখীন হয় তখন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা এক রাষ্ট্রের জনগণকে অন্যরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করে। এতে করে অধিক জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান হয়। আবার সাম্রাজ্যবাদের ফলে আধুনিকীকরণ ঘটে। একটা আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র অন্য একটা পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে গেলে সেই রাষ্ট্রটি উপকৃত হয়। সেখানকার মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণের পরিবর্তন হয়। এ সকল কথা যে সকল তাত্ত্বিক বলেন তারা উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক ক্ষতির দিকটিকে চেপে যান। তারা মূলত শিক্ষায়, ভাবনায়, সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশিক শ্রেণীটির উপজাত বা বাই প্রোডাক্ট।

১২. মন্তব্য : সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, দৃশ্যত: সাম্রাজ্যবাদের কিছু ভাল দিক থাকলেও তা জনগণের জন্য কখনোই কল্যাণকর নয়। কারণ জনগণ পরাধীন থেকে কখনোই স্বাধীনতার সুধা লাভ করতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদীদের পতন ও জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলেও অনুন্নত দেশসমূহ সাম্রাজ্যবাদের কালো থাবা হতে আজও মুক্ত হতে পারেনি। সময়ের গতিধারায় সাম্রাজ্যবাদের রূপ পাল্টিয়েছে। পূর্বে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত। বর্তমানে সেখানে নব্য উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি না এসেও তাদের নীতি ও কৌশল চাপিয়ে দিয়ে বহু দেশকে পরাধীন করে রাখছে। এবং সুকৌশলে স্বার্থ রক্ষার জাল ছড়িয়ে রেখেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বাধীন হলেও

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক দিক থেকে এখানো পুরোপুরি স্বাধীন নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদ এক নতুন অবয়বে বিশ্বকে আর্থ, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্নভাবে গ্রাস করতে যাচ্ছে উন্নত কলা-কৌশলের মাধ্যমে। এখন সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে সরাসরি নানা দেশ দখল বা উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শোষণ ও অধীনস্থকরণের ধারা শেষ হলেও শক্তিশালী দেশ কর্তৃক দুর্বল দেশগুলোকে ঋণ, প্রযুক্তি, নীতির মাধ্যমে নির্ভরশীল করে রাখা হচ্ছে। এখন কোনো একক দেশ নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মাধ্যমে গঠিত অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ), বহুজাতিক কোম্পানী, মিডিয়া প্রভৃতি সংস্থা ও সংগঠনের মাধ্যমে সর্বাত্মক আগ্রাসন চালাচ্ছে এবং তাবৎ বিশ্বেই প্রতিষ্ঠা করেছে তাদের অদৃশ্য অথচ যুৎসই সাম্রাজ্য।
আগে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তিকে সনাক্ত করা গেলেও বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে অদেখা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবলে আক্রান্ত হয়েছে তাবৎ বিশ্ব। আগে অনেকগুলো সাম্রাজ্যবাদী দেশ বা শক্তির উদ্ভব লক্ষ্য করা গেলেও বর্তমানে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রযত্নে ও পৃষ্ঠপোষকতায় একজোট হয়েছে সকল সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি বিশ্বের দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলোর বিরুদ্ধে। বস্তুত কাগজে-কলমে সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশিকতাবাদ-সম্প্রসারণবাদের নামে বা সরাসরি পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে দখলদারিত্ব বা শোষণ-শাসন-কর্তৃত্বের অবসানের কথা বলা হলেও একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব প্রকৃত অর্থে নিপতিত হয়েছে একচ্ছত্র দৈত্যরূপী সাম্রাজ্যবাদী চক্করে যার ভদ্র নাম রাখা হয়েছে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া। ■

লেখক-পরিচিতি : লেখকের 'বিশ্বায়ন : ইসলাম ও বাংলাদেশ' প্রবন্ধের লেখক-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

লেখা-পরিচিতি : প্রবন্ধটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৫ মূল প্রবন্ধ হিসাবে সেমিনারে পঠিত।

www.pathagar.com

ইজতিহাদ কি ও কেন?

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান

■

ইজতিহাদের সংজ্ঞা

ইজতিহাদ আরবী 'জুহদ' শব্দ থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু হাসিল করার উদ্দেশ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালানো। ইসলামী পরিভাষায় শরী'আতের কোনো নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ।

উসূলবিদদের মতে একজন ফকীহ্ শরী'আতের মূল বিষয় সমূহের ওপর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার-বিবেচনা করে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার শাখা-প্রশাখার সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণা চালিয়ে থাকেন তাই ইজতিহাদ। এতে বুঝা গেলো, শরী'আতের যেসব বিষয় অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত তা জানার জন্য চেষ্টা করার নাম ইজতিহাদ নয় এবং সেসব বিষয়ে ইজতিহাদের সুযোগ বা অবকাশও নেই। যেমন নামায ফরয হওয়া, নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়া ইত্যাদি। বরং যেসব বিষয়ে কোনো সরাসরি নছ্ বা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমাধান পাওয়া যায় না, সেসব বিষয়ে একটি সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করার নামই ইজতিহাদ। ইসলামের প্রথম যুগে কিয়াস এবং ইজতিহাদ একই অর্থে ব্যবহৃত হতো। যিনি ইজতিহাদ করেন তাঁকে বলা হয় মুজতাহিদ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিচার বিবেচনা ছাড়াই অপরের মত মেনে নেয় তাকে বলা হয় মুকাল্লিদ।

ইজতিহাদ কেন ?

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ইজতিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সমাজে এমন সমস্যারও উদ্ভব হতে পারে যার সরাসরি সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে নাও থাকতে পারে। কিন্তু তৎসম্পর্কিত মূলনীতি অবশ্যই রয়েছে। আর এ মূলনীতির ভিত্তিতে নব-উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদ প্রয়োজন। এ ইজতিহাদই ইসলামী আইন ও বিধানকে সচল, সক্রিয় ও সঞ্জীবিত রাখে।

www.pathagar.com

আর ইজতিহাদের পথ যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে ইসলামী আইন ও বিধান যে সার্বজনীন ও সর্বযুগের, এ দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআন মাজিদের বহু আয়াতে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা ও চেষ্টা-সাধনার নির্দেশ রয়েছে যা ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতার ইঙ্গিত বহন করে। তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)এর নিম্নোক্ত ঘটনাটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মহানবী (সা) হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে (রা) ইয়ামনের বিচারক নিয়োগ করে পাঠাবার প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নিকট মোকদ্দমা পেশ করা হলে তুমি কিভাবে বিচার-ফায়সালা করবে? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তা যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও? মু'আয (রা) বললেন, আমি নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তা যদি নবীর সুন্নাতেও না পাও? মু'আয (রা) উত্তর দিলেন, তাহলে আমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে (সমাধান লাভের) যথাসাধ্য চেষ্টা (ইজতিহাদ) করবো এবং তাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবো না। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বুকে মৃদু করাঘাত করে বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে তাঁর রাসূলের মনোপূত যোগ্যতা দান করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, দারেমী)

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। যদি কেউ ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুলও করে, তবুও সে এর জন্য একটি নেকী লাভ করবে। পক্ষান্তরে তার ইজতিহাদ সঠিক হলে সে এর জন্য দ্বিগুণ নেকী লাভ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে ইজতিহাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

ইজতিহাদ ইসলামী শরী'আতে যেহেতু এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই যে কেউ ইজতিহাদ করলেই যে তা গ্রহণযোগ্য হবে, এমন নয়। এজন্য মুজতাহিদের বিশেষ কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিকারী হওয়া জরুরী। এ কারণে উসূলবিদগণ ইজতিহাদের প্রকারভেদ ও ইজতিহাদকারীর জন্য বেশ কিছু শর্ত বা বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেছেন।

ইজতিহাদের প্রকারভেদ

ইজতিহাদ সাধারণত তিন প্রকার। যথা :

১. ইজতিহাদ মুত্লাক বা ব্যাপক ইজতিহাদ। এটি কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা বিশেষ কোনো মাস'আলার সাথে সংযুক্ত নয়, বরং ধর্মীয় যাবতীয় আহকামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এ প্রকারের ইজতিহাদ হচ্ছে সর্বোচ্চ মানের ইজতিহাদ। বিশিষ্ট সাহাবীগণ এবং প্রথম শ্রেণীর ইমামগণই এমন ইজতিহাদের অধিকারী ছিলেন।

২. ইজতিহাদ ফিল-মাযহাব বা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের সাথে সম্পর্কিত ইজতিহাদ। কোনো মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (ইমাম) কর্তৃক প্রবর্তিত ধারা ও পদ্ধতি অনুসরণে এই প্রকারের ইজতিহাদ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইজতিহাদের এই প্রকার প্রথম

www.pathagar.com

প্রকারের চেয়ে নিম্নমানের। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর অনুসরণে ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এবং ইমাম শাফি-ঈ (রহ)-এর অনুসরণে ইমাম নববী (রহ) এই শ্রেণীর মুজাতাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩. ইজতিহাদ ফিল ফাত্ওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন ফাত্ওয়া সম্পর্কে ইজতিহাদ। এটি দ্বিতীয় প্রকারের ইজতিহাদ থেকেও নিম্নস্তরের। এপ্রকারের ইজতিহাদে যে সকল মাস'আলা সম্পর্কে ইজতিহাদ করা হয়, মুজতাহিদের পক্ষে শুধু সেই প্রকার মাস'আলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট, বিভিন্ন মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ মুফতীগণ এই শ্রেণীর মুজতাহিদের অন্তর্ভুক্ত।

ইজতিহাদকারীর যোগ্যতা ও গুণাবলী

- আল্লাহ্প্রদত্ত শরী'আতের ওপর ইজতিহাদকারীর সুদৃঢ় ঈমান ও তা মেনে চলার একনিষ্ঠ সংকল্প থাকতে হবে। তাঁকে তাঁর বন্ধন ছিন্ন করার খায়েশমুক্ত হতে হবে এবং ইসলামী শরী'আত থেকেই পথ নির্দেশ লাভ করতে হবে।
- প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদকে অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এবং তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং তার ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট দখল থাকা একান্ত প্রয়োজন, কারণ কুরআন মাজীদ এই ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং মহানবী (সা)এর সুন্নাহর ভাষাও তাই। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে পৌছুতে হলে আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। অধিকন্তু তাঁকে কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত আদেশ নিষেধ, তার শ্রেণীভেদ এবং যুক্তি প্রমাণের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, শরী'আতের যাবতীয় আদেশ নিষেধ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া মুজতাহিদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। বরং যে মাস'আলা সম্পর্কে ইজতিহাদ করবেন সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

- রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী আইনের ওপর যে কাজ হয়েছে এবং মুজতাহিদ ইমামগণ যুগ যুগ ধরে যেভাবে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ সাধন করেছেন সেই সম্পর্কেও ইজতিহাদকারীর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।
- বাস্তব জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে ইজতিহাদকারীর গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ এগুলোর ওপরই শরী'আতের বিধান ও মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।
- ইজতিহাদকারীদেরকে নৈতিকতার মানদণ্ডে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। চরিত্রহীন অবিশ্বস্ত ব্যক্তির ইজতিহাদ নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মহিউস্ সুন্নাহ বাগাবী ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পর্কে বলেন : একজন মুজতাহিদকে পাঁচটি বিষয়ে আলেম বা জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।

এক. কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন মাজিদের জ্ঞান।

www.pathagar.com

দুই. হাদীসে রাসূল অর্থাৎ সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান।
তিন. উলামায়ে সলফ অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলেমগণের বিভিন্ন মতামত (ঐকমত্য ও মতবিরোধ) সম্পর্কে জ্ঞান।
চার. আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান।
পাঁচ. কিয়াস সম্পর্কে জ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে কি পরিমাণ জ্ঞান থাকলে তাকে মুজতাহিদ বলা যাবে, এ ব্যাপারে ইমাম বাগাবী বলেন : কুরআন মাজিদের জ্ঞান বলতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

- নাছেখ ও মানছুখ।[১]
- মুজমাল ও মুফাস্‌সার।[২]
- খাস ও 'আম।
- মুহকাম ও মুতাশাবিহ[৩]।
- মাকরূহ ও হারাম, মুবাহ, মুস্তাহাব ও ওয়াজিব।

হাদীসের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সাথে সাথে হাদীসটি সহীহ না জঈফ, মুসনাদ[৪] না মুরছাল[৫] এ সম্পর্কেও তার জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায় যা কুরআনের পরিপন্থী, এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে তাত্‌বীক বা সামঞ্জস্য বিধানের জ্ঞানও তার থাকতে হবে। কারণ হাদীস কখনো কুরআনের খিলাফ বা পরিপন্থী হতে পারে না। আর হাদীসের জ্ঞান থাকার অর্থ শুধুমাত্র সে সমস্ত হাদীস জানা থাকা জরুরী যা শরী'আতের বিভিন্ন হুকুম আহকাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। উপদেশমূলক কিংবা কোন ঘটনা বা কাহিনীমূলক হাদীস সমূহ জানা থাকা জরুরী নয়।

এমনিভাবে আরবী ভাষার ক্ষেত্রেও সে সমস্ত শব্দগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী যা কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ আরবী ভাষায় পণ্ডিত হওয়া জরুরী নয়। তবে ভাষার ক্ষেত্রে এতটুকু জ্ঞান অবশ্যই থাকা উত্তম যদ্বারা

---

১. যে আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোনো পূর্ববর্তী হুকুম স্থগিত কিংবা পরিবর্তিত হয় তাকে নাছেখ আর স্থগিত অথবা পরিবর্তিত হুকুমকে বলে মানছুখ।

২. 'মুজমাল' এমন শব্দ যার অনেকগুলো অর্থ হতে পারে। গভীর অনুসন্ধান ব্যতিরেকে শুধু শব্দ দ্বারা তার নির্দিষ্ট অর্থ বুঝা যায় না।
'মুফাস্‌সার' এমন শব্দ যার কাঙ্খিত অর্থ এতটা স্পষ্ট যা বুঝার জন্য কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না।

৩. 'মুহকাম' এমন বাক্য যার কাংখিত অর্থ এতটা মজবুত ও সুদৃঢ় যা রহিত বা পরিবর্তিত হবার কোনোরূপ সম্ভাবনা নেই।
'মুতাশাবিহ' এমন বাক্য যার অর্থ জানার কোনো পথই খোলা নেই।

৪. যে কোনো হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল অর্থাৎ সনদের কোনো স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েনি সে হাদীসকে হাদীসে 'মুসনাদ' বলে।

৫. যে হাদীসের সনদে সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে এবং স্বয়ং তাবেঈ রাসূলুল্লাহ (সা)এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে 'মুরসাল' বলে।

www.pathagar.com

আরবরা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কোন্ বাক্যটি কোন্ অর্থে প্রয়োগ ও ব্যবহার করে তা বুঝা সহজ হয়। কারণ শরী'আত সম্পর্কিত যাবতীয় সম্বোধন আরবী ভাষায়ই করা হয়েছে। সুতরাং আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে শরী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্য হৃদয়ংগম করা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে শরী'আতের বিভিন্ন হুকুম-আহকামের ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেঈদের বক্তব্য সম্পর্কেও একজন মুজতাহিদকে অবহিত থাকতে হবে। তাছাড়া এ উম্মাতের ফকীহগণ কর্তৃক প্রণীত অধিকাংশ ফতোয়া সম্পর্কে তাঁকে জানতে হবে, যাতে তার ইজতিহাদ উলামায়ে সলফ বা পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্যের পরিপন্থী না হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের একটি সম্পর্কেও যদি সে অজ্ঞ হয় তবে সে মুজতাহিদ হবার যোগ্য নয়। বরং তাকে অপরের তাকলীদ করতে হবে। (ইমাম বাগাবী)

অনেক ক্ষেত্রে একই মাস'আলা সম্পর্কে বিভিন্ন মুজতাহিদ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাঁদের প্রত্যেকের অভিমতই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কি না। এর জবাবে বলা হয়ে থাকে যে, মুজতাহিদগণের অভিমত যদি পরস্পর বিরোধী না হয় তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে তার প্রতিটিই সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে। পক্ষান্তরে পরস্পর বিরোধী অভিমত হলে হানাফীদের মতে ফাতওয়াগুলোর মধ্যে যে কোনো একটির অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রসংগত উল্লেখ্য, কোনো বিষয়ে কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হলে তাঁর পক্ষে উক্ত মত পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

সাধারণতঃ মনে করা হয়, বর্তমানকালে ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ, কারো পক্ষে এ যুগে ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা বর্তমান যুগেও যদি কেউ ইজতিহাদের জন্য আবশ্যক যাবতীয় যোগ্যতা, গুণাবলী ও জ্ঞান-গরিমার অধিকারী হন, তাহলে নির্দিষ্ট সীমা ও শর্তাধীনে ইজতিহাদ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অবৈধ বা অসম্ভব নয়। বরং আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দীনকে সচল ও স্থায়ী রাখার জন্য ইজতিহাদের পথ সদা উন্মুক্ত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, আর তাহলো, একজন মুজতাহিদের জন্য যে যোগ্যতা, গুণাবলী ও বাধ্যবাধকতার উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তি কি?

এর জবাবে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ফাত্ওয়া বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন; অর্থাৎ শরী'আতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আহকাম সম্পর্কে যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো এবং যাদেরকে বিভিন্ন এলাকার কাযী বা বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিলো তাঁরা সবাই মুজতাহিদ ছিলেন। যেমন : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর ফারুক (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা), আবু মুসা আশ'আরী (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), আলা ইবনে হাদরামী (রা), দাহিয়ায়ে কালবী (রা), উবাই ইবনে কা'ব (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), তাল্হা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা), যুবাইর ইবনুল আউয়াম (রা) প্রমুখ।

www.pathagar.com

উপরোক্ত সাহাবাদের চরিত্র, যোগ্যতা ও গুণাবলী বিশ্লেষণ করলেই একজন মুজতাহিদের মধ্যে কি কি যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকা আবশ্যক তা বুঝতে পারা যায় এবং একেই ইজতিহাদের যোগ্যতা ও গুণাবলীর ভিত্তি বা মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)এর কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে, যার ইজতিহাদের প্রতি রাসূল (সা) সমর্থন জানিয়েছেন। 'আনসাবুল আশরাফ' ও 'হায়াতুস সাহাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে হযরত মু'আয ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, সাহাবাদের মধ্যে যে চার জনের নিকট থেকে কুরআন গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন মু'আয (রা) তাদের অন্যতম। 'তাযকিরাতুল হোফ্ফাজ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা)এর জীবন কালেই হযরত মু'আয (রা) শ্রেষ্ঠ ফকিহদের মধ্যে পরিগণিত হন। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ফকীহ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : হালাল ও হারামের বিধান সম্পর্কে মু'আয ইবনে জাবাল ছিলেন অন্যদের তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী।

কা'ব ইবনে মালিক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর (রা)এর যুগে তিনি মদীনায় ফাত্ওয়া দিতেন। (হায়াতুস সাহাবা)

ইবনুল আসীর বলেন, রাসূলুলাল্লাহ (সা)এর জীবদ্দশায় আনসারদের মধ্যে মু'আয ইবনে জাবাল (রা), উবাই ইবনে কা'ব (রা) ও যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) ফাতওয়া দিতেন। (উসুদুল গাবা)

হযরত উমর (রা) একবার মু'আয সম্পর্কে বলেন : মু'আয না হলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।

এ মন্তব্য দ্বারা তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা ও গবেষণা শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ ছাড়া একবার ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কেউ ফিকাহ শিখতে চাইলে সে যেন মু'আযের কাছে যায় (তাযকিরাতুল হোফ্ফায)। ■

তথ্যপঞ্জি

১. ইকদুল জীদ : শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী।
২. আল-মওছু 'আতুল ফিক্হিয়া আল-ইসলামিয়া।
৩. কাশ্ শাফ, ইসতিলাহাতুল ফনূন।
৪. নূরুল আন্ওয়ার।
৫. ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

লেখক-পরিচিতি : মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান– লেখক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার সমিতির চেয়ারম্যান।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১৮ই এপ্রিল, ২০০৫ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র ঋণ : দারিদ্র্য দূরীকরণ বনাম সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন সুদৃঢ়করণ

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

■

জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। 'আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ' ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি, টার্গেট গ্রুপের আর্থিক কর্মকাণ্ড ও সুবিধাদির বিস্তৃতি ঘটানো। এতদব্যতীত ঋণ প্রদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী সংস্থার (এনজিও) মধ্যে সমন্বয় সাধন। সর্বোপরী সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সাথে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে অংশীদারিত্বের সেতু বন্ধন গড়ে তোলা। বাংলাদেশ হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর চারণভূমি। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে বিশ্বের মাইলফলক হচ্ছে এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রস্তাবে জাতিসংঘ ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যমান অতি দারিদ্র্যের মাত্রা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়নকামী গোষ্ঠীর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে ২০০৫ সালকে আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ ঘোষণা করে। এই ঘোষণা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনার প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির নামান্তর। যেহেতু ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উদ্ভাবক বাংলাদেশ সুতরাং তার সাফল্য সঙ্গত কারণেই অন্যান্য দেশের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। গত ১৫ই জানুয়ারী, ২০০৫ সালে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে 'আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ ২০০৫' এর শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করা হয়। সেই সাথে ক্ষুদ্র ঋণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে 'উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত গঠনের' দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ উদযাপনের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। 'ক্ষুদ্র ঋণের অগ্রদূত বাংলাদেশ' এই থিমকে সামনে রেখে আয়োজকরা সারা বছর ব্যাপী ক্ষুদ্র ঋণ উপকারভোগীদের নিয়ে সভা-সমাবেশ, তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করবেন।

www.pathagar.com

আয়োজকরা বলেছেন– দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত উন্নয়ন সহযোগী, স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সকল চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করা হবে, যাতে মিলেনিয়াম উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে 'প্রকট দারিদ্র্য' অর্ধেক করা সম্ভব হয়।

দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলে বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণের জমজমাট ব্যবসা করে আসছে। দীর্ঘ দিন থেকে অধিকাংশ বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার কমানোর ওয়াদা করলেও বাস্তবে তারা সুদের হার কমাননি। কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানেও ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার তুলনামূলক অনেক বেশী। উচ্চ হারের সুদের বিষয় সর্বমহলে সমালোচিত হলেও এর কোন সুরাহা এ যাবত হয়নি। এ সম্পর্কে একটি জাতীয় দৈনিক 'এনজিওগুলো সুদ কমাতে চাচ্ছে না' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখেছে এনজিওগুলো বর্তমানে ২২ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত সুদের হার ৪০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পত্রিকার মতে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলোর উপর সরকারের শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তারা ইচ্ছামতো ঋণের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক গরীব মানুষকে শোষণ করছে। ফলে গরীব মানুষ এনজিও'র খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে।[১] আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ ২০০৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি আইনী কাঠামোর আওতায় এনে ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার যৌক্তিক করার কথা বলেছেন।[২] সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দাবী করা হয়েছে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৪০% দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে। যদি বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যাকে ১৫ কোটি ধরে নেয়া হয় তাহলে দেশের ছয় কোটি লোক দারিদ্র্য সীমার মধ্যে রয়েছে। অর্থনীতিবিদদের মতে এই ছয় কোটি লোকের মধ্যে তিন কোটিই হলো 'হত দরিদ্র' বা 'চরম দরিদ্র'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম.এম. আকাশের মতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিষয়ক যত কর্মসূচী ও যত বরাদ্দ আছে সব একত্রে ব্যয় করলেও ছয় কোটি লোকের জন্য সিন্ধুতে বিন্দু সম।[৩] ২০০৪ সালের বাজেট পর্যালোচনাকালে ডঃ আতিউর রহমান বলেছিলেন- এটি স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে কি বয়স্ক ভাতা কি ভিজিডি, সবগুলোর ক্ষেত্রেই মাথাপিছু পরিমাণটা হচ্ছে অত্যন্ত নগণ্য। এর সাথে যদি যোগ করা হয় দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং সুশাসনের অভাব তাহলে সহজে অনুমান করা যায় যে, দারিদ্র্য ইপ্সিত হারে কমবেনা।[৪] বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের বাস্তব প্রায়োগিক দিকটি এখন পর্যন্ত মুলতঃ ক্ষুদ্র ঋণের সাহায্যে কিভাবে দরিদ্রের আয় বাড়ানো যায় তার সাথে সম্পৃক্ত। দারিদ্র্য নিরসনের অন্যান্য উপায়গুলোর সঙ্গে এর সম্পর্ক কি সেটা বুঝতে পারলে এ ধরনের ঋণের উপযোগিতা বা সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হবে। দারিদ্র্যের রূপ সাধারণত তিন ধরনের ।

গবেষকরা এতদিন দারিদ্র্যের সনাতন রূপের উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি বা পরিবারের ভোগ ও পুষ্টি যদি আয়ের স্বল্পতার কারণে এক বিশেষ মাত্রার (পুষ্টির মাপে

www.pathagar.com

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ২১২২ ক্যালরী) তুলনায় অপ্রতুল হয়, তবে ঐ ব্যক্তি বা পরিবারকে দরিদ্র বলা যাবে। দারিদ্র্যের এই সনাতনী সংজ্ঞার দু'ধরনের সমালোচনা সম্ভব।

এক. এর ফলে দারিদ্র্যের তীব্রতা বুঝা যায় না। বুঝা সম্ভব নয়। যেমন, প্রকৃত পুষ্টির নূন্যতম মাত্রার গ্রহণযোগ্য মান যদি দারিদ্র্য রেখা হয়, তবে যে ব্যক্তি তার ঠিক নীচে আছে এবং যে ব্যক্তির পুষ্টি মাত্রা নূন্যতম মাত্রার অর্ধেকেরও কম দু'জনকেই সমান দরিদ্র্য বলতে হবে, যদিও স্বাভাবিক বিচারে দ্বিতীয় জন অধিক দরিদ্র।

দুই. দারিদ্র্যের সনাতনী সংজ্ঞার অন্য যে সমালোচনা করা হয় তা'হলো এই যে, কেবল আয়ের স্বল্পতার কারণে ভোগ বা পুষ্টির অপ্রতুলতাই দারিদ্র্যের রূপ নয়। অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং সাধারণভাবে স্বাস্থ্যহীনতা দরিদ্রের চির সাথী। এসব দারিদ্র্যের কারণ ও ফলাফল দুই-ই। আয়, ভোগ ও পুষ্টির দারিদ্র্য এবং মানব সম্পদের দারিদ্র্য এক রকম সমার্থকও বটে। অনেকেই শেষোক্তটিকে আরেকধাপ এগিয়ে নিতে চান। তাঁরা বলতে চান যে দরিদ্রের মধ্যে যে হতাশা জন্মায়, তা তাঁদের মধ্যে হীনমন্যতা ও মানসিক দারিদ্র্যেরও সঞ্চার করে।

দারিদ্র্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হলো নিরাপত্তাহীনতা। তা হতে পারে আয়ের বা ভোগের, সামাজিক বা আইনগত, আবার প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণেও তা ঘটতে পারে।

দারিদ্র্যের প্রত্যয়গত ধারণা ও সংজ্ঞা

একটি সমস্যা হিসেবে দারিদ্র্যের সৃষ্টি মানব জাতির ইতিহাসের সূচনাতে হলেও দারিদ্র্যের প্রচলিত সংজ্ঞা এবং এর পরিমাপ পদ্ধতিতে এখনও বেশ কিছু অসঙ্গতি এবং অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান। অবশ্য দারিদ্র্যের ইতিহাস প্রাচীন হলেও দারিদ্র্য পরিমাপের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে অনেক পরে।[৫] সংজ্ঞা ও পরিমাপ বিষয়ে এ সব দ্বিধা ও দ্বিমতের কারণে অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটে না।[৬] দারিদ্র্য একটি মারাত্মক সমস্যা, যাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দারিদ্র্য বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে; যার দ্বারা নূন্যতম মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs) মেটাতে ব্যর্থ।[৭] সমাজতত্ত্ববিদ বুথ[৮] দারিদ্র্যকে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। বি. সুবাই রাউনট্রি[৯] বলেন, দারিদ্র্য হলো স্বল্প আয় যা কিনা শুধুমাত্র প্রকৃত দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনসমূহ অর্জনে অপ্রতুল। মিলার এবং রবী[১০] অর্থনৈতিক মর্যাদাকে দীর্ঘস্থায়ীত্বের মূল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরপর তারা শিক্ষা এবং সামাজিক গতিশীলতাকে দরিদ্রজনের ভবিষ্যত জীবনযাত্রার মান নির্ণায়ক হিসেবে তুলে ধরেছেন। অর্থনীতিবিদ ওঝা,[১১] ডান্ডেকার ও রাথ[১২] আহলুওয়ালিয়া[১৩] দারিদ্র্যকে পুষ্টির ঘাটতি অথবা অপুষ্টির আঙ্গিকে দেখেছেন। অনেক অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্যকে ক্ষুধার যন্ত্রণার মধ্যেও দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, একটি পরিবার তখনই দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে, যদি তার কোন সদস্যকে বছরের কোন না কোন দিনে না খেয়ে থাকতে দেখা যায়।[১৪] দারিদ্র্যকে অনেকে

www.pathagar.com

জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অভাব অর্জনে ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৫] অন্যকথায় দারিদ্র্যকে একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করা যায়। এক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যারা জীবন ধারনের জন্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে অপারগ। এই অক্ষমতা তাদের সীমিত সামর্থের প্রতিফলন। সাধারণত এই সীমিত সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধরা হয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে যেসব দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন তা ক্রয় করার মতো ক্রয়ক্ষমতার অভাবকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ মৌলিক চাহিদা কি এবং এর উপাদান গুলোই বা কি।[১৬] দ্বিতীয়তঃ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান কিভাবে নির্ধারণ করা হবে। বিশেষত এই ন্যূনতম মান স্থির নয় এবং স্থান ও কাল ভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন একটি সামগ্রী কোন দেশে সৌখিন দ্রব্য বিবেচিত হতে পারে যা অন্য দেশে অত্যাবশ্যকীয়। এজন্য জীবন যাত্রার নূন্যতম মান নির্ধারণে একটি অংশ আপেক্ষিক এবং দেশ বা কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়। অপর অংশ যা মৌলিক চাহিদা নির্ধারণ করে (যেমন-খাদ্য) তা অনেকাংশে অপরিবর্তনশীল। সেনের[১৭] মতে দারিদ্র্য ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ দারিদ্র্যকে বলা যেতে পারে একটি বঞ্চনার কাহিনী। বঞ্চনা একটি সামাজিক ধারণা যা কাল এবং স্থান ভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশ সমূহে দারিদ্র্যকে চরম বঞ্চনার সমার্থক হিসেবে গন্য করা হয় যা জীবন ধারনের নূন্যতম চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপরপক্ষে উন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য ধারণাটি মূলত আপেক্ষিক বঞ্চনা নির্দেশক যা একটি গ্রহণযোগ্য এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানদণ্ডে নির্ধারিত জীবন যাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা নির্দেশ করে। জে জনউনমকির মতে, দারিদ্র্য হলো এমন এক ব্যবস্থা যাতে প্রয়োজনসমূহ সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয় না। ডেলটুসিং বলেছেন, মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হলো দারিদ্র্য। থিওডরসনের মতে, দারিদ্র্য হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক উপোষ। দারিদ্র্য কোন একজন বা একদল লোকের জীবনযাত্রার নিম্নমান যা যথেষ্ট সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার প্রতি অবমাননা মূলক। রবার্ট চেম্বার্স দারিদ্র্যকে জীবন ধারনের জন্য আয় এবং ব্যয়ের চৌহদ্দি থেকে আকস্মিক সংকটে পড়ার আবস্থা বা সম্ভাবনা (সম্পদ বিক্রী অথবা মন্দার সময় ঋণে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি) পরাধীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষমতাহীনতা এবং একাকীত্বের অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃতি দিয়েছেন।[১৮] প্রতিদিন জীবন ধারনের জন্য ২১২২ ক্যালরী খাদ্য ও ৫৮ গ্রাম প্রোটিন ক্রয়ে অক্ষম জনগোষ্ঠীকে ধরা হয় দারিদ্র্য সীমার নীচে। আর ১৮০৫ ক্যালরী খাদ্যও কোন ভাবে জুটাতে পারেনা যে জনগোষ্ঠী, চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে তাদের অবস্থান। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের জন্য এই মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বিশ্ব ব্যাংক দারিদ্র্য সম্পর্কে তার বিভিন্ন প্রতিবেদনে দুটি দারিদ্র্যের সীমা টেনেছেন। সাধারণ দারিদ্র্য সীমা নির্ধারিত হয়েছে যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ৩৭০ মার্কিন ডলার এবং নিম্নতর চরম দারিদ্র্যের সীমা হচ্ছে ২৭৫ ডলার । যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ৩৭০ ডলারের কম, সে দেশকে উচ্চতর দারিদ্র্য সীমার অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসেবে শ্রেণীভূক্ত এবং যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ২৭৫ ডলারের কম সে দেশকে নিম্নতর দারিদ্র্য সীমার দেশ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত

www.pathagar.com

করা হয়। ইউএনডিপির মতে দারিদ্র্য অবস্থা নির্ণয় করার সময় মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index-HDI) ও মানব স্বাধীনতা সূচক (Human Freedom Index-HFI) কেও মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের সাথে যুক্ত করা উচিত। কথাটি এভাবে বলা হয়েছে, মানব উন্নয়ন সূচক এবং মানব স্বাধীনতা সূচককে যৌথভাবে মাথাপিছু আয়ের ধারণার সাথে একত্রিত করলে বিশ্বস্ততার সাথে দারিদ্র্য অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। মানব সম্পদ সূচকে আয়ুষ্কাল, বয়স্ক শিক্ষা ও ক্রয়ক্ষমতাকে একীভূত করা হয়েছে।

দারিদ্র্যের ইসলামী সংজ্ঞা

দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ তার বেঁচে থাকার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বা মৌলিক চাহিদা পূরনে ব্যর্থ হয়। ইংরেজীতে তাকে বলা হয় A Situation of Deprivation. ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হচ্ছে এমন এক অবস্থা যা মানব জীবনের অব্যাহত প্রয়োজনীয় পণ্য বা মাধ্যম উভয়েরই অপর্যাপ্ততা থাকে । অন্য কথায় দারিদ্র্য এমন ধরনের জীবন যাপন যা কোন সুস্থ গ্রাসাচ্ছদনের পর্যায়ে পড়ে না । এটা ব্যক্তির এমন এক অবস্থা যেখানে শুধু অব্যাহতভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা নয় বরং সুস্থ ও উৎপাদনমুখী অস্তিত্বের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, পোষাক এবং আশ্রয়ের মতো মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উপযোগী সম্পদের অভাব রয়েছে। আল কুরআন এ ধরনের ধারণা ও মৌলিক প্রয়োজনের মান সম্পর্কে বলছে ঃ

"এখানে তো তুমি মহা সুযোগ সুবিধা লাভ করেছ, না অভূক্ত উলঙ্গ থাকছ, না পিপাসা রৌদ্র তাপ তোমাকে কষ্ট দেয়।" (২০ ঃ সূরা আত ত্বাহা ঃ ১১৮-১১৯)

কুরআন ও হাদীস দারিদ্র্যকে দুটি স্তরে বিন্যাস করেছে । একটি হলো কঠিন দারিদ্র্য, চরম/অতি দারিদ্র্য সীমা (Hard core poverty) যার মধ্যে পড়ে ফকির ও মিসকিন। ফকির শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় উপকরণ নেই যারা সর্বতোভাবেই নিঃস্ব পথের ভিখারি তারাই ফকির । অন্যকথায় ফকির বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বা বৈধভাবে উপার্জনের সন্তোসজনক কোন উপায় নেই। মিসকিন হচ্ছে তারা, অভাব যাদের এখনো চরমে পৌঁছেনি, আশু ব্যবস্থা না হলে রাস্তায় দাঁড়াতে যাদের বিলম্ব হবে না। তবে মিসকিনদের আত্মমর্যাদা ও কৌলিণ্যবোধ তাদের রাস্তায় নামতে দেয় না, দেয় না কোথাও হাত পাততে, সহীহ মুসলিম শরীফে এক হাদীসে মহানবী (সা) মিসকিনদের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন- ১. যার ধনী হবার জো নেই ২. দারিদ্র্য প্রকাশ পায় না বলে ভিক্ষাও জোটেনা ৩. হাত পেতে কারো কাছে কিছু চায়ও না। এ হাদীসের শেষাংশে ইংগিত করা হয়েছে সূরা আল বাকারার এ আয়াতের দিকে ১. তাদের আত্মমর্যাদার অবস্থা তো এই যে, অজ্ঞরা তাদেরকে ধনী বলেই ভাবে ২. আপনি শুধু তাদের চেহারা দেখেই ভেতরের অবস্থা আঁচ করে নিতে পারবেন ৩. তারা কখনো কারো পেছনে লেগে কিছু চেয়ে ফিরে না[১৯] যারা কর্মক্ষম হওয়া সত্বেও কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য হন। শত চেষ্টা করেও চাকরি

www.pathagar.com

মিলছে না- এক কথায় একেবারেই বেকার যারা তারাও মিসকিন। সমাজের ঐসব লোক যাদের অবস্থা কিছুদিন আগেও ভাল ছিল হঠাৎ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বা অন্য কোন আকস্মিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বর্তমানে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে পূর্বে তারা যত বিত্তবানই থাকুক না কেন, আজ মিসকিনের কাতারে নেমে এসেছে।

দ্বিতীয় স্তরের সাধারণ দারিদ্র্যতা (General Poverty)। ইসলামের বিধান মুতাবেক যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই অর্থাৎ যিনি যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদের মালিক নন তিনিই দরিদ্র। অন্য কথায় সাধারণ দারিদ্র্য হলো এমন অবস্থা যেখানে মানুষের নূন্যতম মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs) পূরণ হয়ে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে, যা অবশ্য যাকাতের নিসাবের চেয়ে কম। ইমাম শাতিবী[২০] ও ইমাম গাজ্জালী (রহ)[২১] মানুষের প্রয়োজন গুলোকে তিনটি ক্রমিক স্তরে বিন্যাস করেছেন। এগুলো হচ্ছে-

১. জরুরীয়াত (Basic Needs)
২. হাজিয়াত (Comforts)
৩. তাহসিনিয়াত (Beautification)

তাঁদের মতে জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন ৬টি যেমন ঃ

১. আকীদা/দ্বীন - Faith, Deen, Ideolog ঃ ঈমান, দ্বীন, আদর্শ
২. নফস - Life itself ঃ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবেশ, যানবাহন, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয় ইত্যাদি যা মানুষের জীবন ধারনের সাথে সম্পৃক্ত
৩. নসল- Family formation ঃ পরিবার গঠনের ক্ষমতা
৪. আকল - Intellect ঃ শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা
৫. মাল - Property, Wealth ঃ নূন্যতম পরিমাণ সম্পদ
৬. হুররীয়াত - Freedom ঃ স্বাধীনতা

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম দারিদ্র্যকে দেখে স্রষ্টার প্রতি বান্দার আনুগত্যের পরীক্ষা ও দুর্ভোগ হিসেবে। কুরআন বলছে, আমরা নিশ্চই ভয়, বিপদ, অনশন, জান-মালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের জন্য সুসংবাদ।[২২]

ইসলাম দারিদ্র্যকে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে যা মানুষকে নীচতা, পাপ ও অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য মহানবী (সা) আল্লাহর কাছে এর জন্য পানাহ চেয়েছেন : হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দারিদ্র্য, অভাব ও নীচুমনা থেকে পানাহ চাই।[২৩] এ জন্য মানুষ কাউকে খুন করতেও কুণ্ঠিত হয় না। দারিদ্র্য জর্জরিত সমাজ কখনও উন্নতি লাভ করতে পারে না। মানুষের যদি খাওয়া পরার ব্যবস্থা না থাকে, থাকার যায়গা না থাকে তাহলে সমাজে অশান্তি, নৈরাজ্য, আইন-শৃংখলার অবনতি, সমাজ গর্হিত কর্ম তৎপরতা ইত্যাদি বেড়ে যায়। কুরআন শিক্ষা দিচ্ছে ঃ দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরা তাদের ও তোমাদের জন্য রিযিক

www.pathagar.com

দেব। নিঃসন্দেহে তাদের হত্যা করা মহাপাপ।[২৪] ইসলাম মনে করে দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে চালিত করে। মহানবী (সা) দারিদ্র্যকে কুফরীর সাথে তুলনা করে বলেছেন- দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে ঠেলে দেয় ।[২৫] সুতরাং দারিদ্র্য হচ্ছে মানুষের ঈমান ও চরিত্র এবং সমাজের নিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি স্বরূপ। দারিদ্র্য হচ্ছে সামাজিক ব্যাধি। কারণ এর কবলে পড়ে মানুষের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, বহু সামাজিক সমস্যা তৈরি হয় এবং নিঃস্ব জাতি বিশ্বে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মানবতা ও ইসলামের প্রতি একজন ঈমানদারের সামাজিক, নৈতিক ও আদর্শিক দায়িত্ব পালন বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে বলে দারিদ্র্য হচ্ছে এক আদর্শিক পাপ। দারিদ্র্য মানুষকে কাফিরের মতো কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দিয়ে তাকে কুফরীতে লিপ্ত করে। ইসলাম তাই দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে এবং তা নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণের জন্য সর্বাত্মক কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। মহানবী (সা) ইসলামী উম্মাহকে সাধারণভাবে এবং সে মুতাবেক নির্দিষ্টভাবে অভাব (Needs) হতে নিজেদেরকে বাঁচানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর তাগিদ এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে নির্দেশ প্রদান করেছেন। সমাজে যাতে দারিদ্র্য না আসতে পারে তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা ইসলামী সরকারের ও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর দারিদ্র্য যদি কোন কারণে বিস্তৃতি লাভ করে তাহলে তা দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো অবশ্য করণীয় বলে গণ্য করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ইসলামী সমাজে স্থায়ী দরিদ্র হিসেবে কোন নিম্নশ্রেণীর লোক থাকবে না; কেউ সাময়িকভাবে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলাম অবশ্য এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক, আইনানুগ ও ব্যবহারোপযোগী কাঠামো সৃষ্টির পক্ষপাতি যা দারিদ্রাবস্থা নিরসনের নিশ্চয়তা দেবে এবং ন্যায় ও সমতার সাথে প্রবৃদ্ধির বিকাশের সহায়তা করবে। পাশাপাশি ইসলাম মানবিক দায়-দায়িত্বের নৈতিক সম্প্রসারণের উপরও গুরুত্ব দিয়েছে। আর সামাজিক দায়িত্ব, অঙ্গীকার ও সংশ্লিষ্টতার বিকাশ সাধনের জন্য সমাজের প্রতি আহবান জানায়।

একদিকে ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষ বা সমষ্টিগতভাবে কোন জাতি যাতে দরিদ্র অবস্থায় পতিত না হয় তার জন্য ইসলামের কতকগুলো বাস্তব ইতিবাচক পদক্ষেপ (Positive Measures) রয়েছে। রয়েছে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ (Preventive Measures)। অন্যদিকে দরিদ্র অবস্থা থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়ার জন্য অনেকগুলো সংশোধনমূলক পদক্ষেপ (Corrective Measures) বা নিরাময়মূলক পদক্ষেপ (Curative Measures) রয়েছে । ইসলাম একদিকে বিত্তবানদেরকে গরীবদের প্রতি এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বপালন সম্পর্কে যেমন সজাগ ও সচেতন করেছে অপরদিকে অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সম্পদ আহরণ ও ভোগ ব্যবহারের অধিকার দেয়ার সাথে সাথে সম্পদ অর্জন ও খরচের নীতিমালাও ইসলাম দিয়েছে। কোন ব্যক্তি বা

www.pathagar.com

গোষ্ঠী স্বেচ্ছাচারী পন্থায় সম্পদ অর্জন ও ভোগ করতে বা জমা করতে পারবে না। সঠিক অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রে কিছু মানুষ হঠাৎ করে ধনী আবার ব্যাপক গণ মানুষ দারিদ্র্যে নিপতিত হতে পারবে না।

ইসলাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শোষণের সকল পথ বন্ধ করে দিতে চায়। অর্থ কেন্দ্রীভূতকরণ ও শোষণের সকল পথ বন্ধ করা হলে দেশ ও অঞ্চল রাতারাতি ধনী হওয়া আর কোন দেশ দরিদ্রে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ পন্থায় সম্পদ সঞ্চিতকরণ ও ব্যবহার দন্ডনীয় অপরাধ, সেটি ব্যক্তি পর্যায়ে, গোষ্ঠী বা জাতীয় পর্যায়ে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হোক না কেন। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের হাতে বা কোন বিশেষ অঞ্চলে বা কোন বিশেষ দেশে সম্পদ কেন্দ্রিভূত করতঃ অন্যান্য ব্যক্তি বা অপরাপর অঞ্চল বা অন্যান্য জাতিকে দারিদ্র্যে নিপতিত করা কাঙ্খিত ও স্বাভাবিক নয়।

ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রো ফাইনান্স

ক্ষুদ্র ঋণ বলতে প্রাথমিক পর্যায়ে যতটুকু পরিমাণ টাকা গরীব জনগণ কোন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড বা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে আয় বৃদ্ধি বা পারিবারিক ব্যয় করতে পারে তাকেই বুঝায়। অন্য কথায় অল্প পরিমাণ পূঁজি আয় বৃদ্ধি মূলক কাজে বন্ধকহীনভাবে দরিদ্রজনকে প্রদান করাকেই বুঝায়। প্রাথমিকভাবে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা এবং ধাপে ধাপে এ পরিমাণ সঙ্গতির সাথে মিল রেখে বাড়ানোকেই ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় ফেলা হয়। ধাপে ধাপে বর্তমানে এ ঋণ গড়ে বাংলাদেশে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকার কাছাকাছি এসেছে।[২৬]

ক্ষুদ্র ঋণ হচ্ছে এমন একটি কর্মসূচী যা আত্মকর্মসংস্থান, অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মসূচী এবং ব্যবসায়িক কর্মসূচীর জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ সরবরাহ করে [Micro Credit is a Program that provides credit for self employment and other financial services and business services (including savings and technical assistance) to the poor people.][২৭] বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ডঃ সালেহ উদ্দিন আহমদ ক্ষুদ্র ঋণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যেমন– ১. গরীবদের জন্য ঋণ, ২. জামানতমুক্ত (Collateral free), ৩. সাংগঠনিক বা পিয়ার গ্রুপ প্রেসার, ৪. স্বল্পাকারে ঋণ, ৫. আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ব্যবহৃত। সাম্প্রতিক বছর সমূহে ক্ষুদ্র ঋণ যা ব্যাপক পরিসরে মাইক্রো ফাইনান্স নামে পরিচিতি লাভ করেছে, দারিদ্র্য দূরীকরণে একটি কার্যকর এবং অধিক গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী হিসেবে স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গৃহীত হয়েছে। জোয়ানা লেজারর্ডডের মতে, মাইক্রো ফইনান্স এমন একটি কর্মসূচী যা স্বল্প আয়ের নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয়। মাইক্রো ফাইনান্স বলতে বুঝায় স্বল্প আয়ের গ্রাহকদেরকে অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা যা আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সেবার মধ্যে সঞ্চয় গড়ে তোলা এবং ঋণ প্রদান অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। মাইক্রো ফাইনান্স কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে– ১. ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বিশেষ করে চলতি মূলধন, ২. বিনিয়োগ গ্রহীতা ও বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন, ৩. জামানতের বিকল্প হিসেবে গ্রুপ গ্যারান্টি বা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, ৪. ঋণ ফেরত দেয়ার বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে ঋণের পুনরাবৃত্তি বিশেষ করে বর্ধিত আকারে ঋণ প্রদান, ৫. ঋণ প্রদান এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ, ৬. নিরাপদ সঞ্চয় প্রত্যবর্তন।[২৮]

ক্ষুদ্র ঋণের গ্রহীতারা বেশীর ভাগই হচ্ছেন দরিদ্র মহিলা। এসব মহিলার পরিবারের দৈনিক আয় গড়ে ১ মার্কিন ডলারের সমান বা নীচে। এদের বসবাস শহর এলাকায়, গ্রামে-গঞ্জে, প্রত্যন্ত গ্রামে, চর অঞ্চলে এবং হাওর এলাকায়। এই আর্থিক শ্রেণীর বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠী অতীতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল এবং এর কারণগুলো হলো–

প্রথমত ঃ ঋণ গ্রহীতাদের জামানত দেয়ার কিছু নেই।

দ্বিতীয়ত ঃ তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের নিম্নতম পরিমাণ অংকের টাকা দক্ষতার সাথে ব্যবহারের দক্ষতা নেই।

তৃতীয়ত ঃ এরা গ্রামে-গঞ্জে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদানকারী অফিস/শাখা থেকে অনেক দূরে বসবাস করে।

চতুর্থত ঃ ঋণের টাকা একত্রে ফেরত দেয়ার নিয়ম থাকা।

পঞ্চমত ঃ ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তাদের নিয়ে কাজ করার ঝামেলা এবং অনিচ্ছা থাকা।

ষষ্ঠত ঃ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের অফিসের বাইরে বা ব্রাঞ্চের বাইরে গিয়ে কাজ না করা।

এছাড়া আরো অনেক কারণ থাকায় তারা ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল।

ক্ষুদ্র ঋণের গ্রাহকদের এ অসুবিধা দূর করে পাকিস্তান আমলে রুরাল সোসাল সার্ভিস (RSS) এর মাধ্যমে, সমবায় সমিতির মাধ্যমে, ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সমিতি গঠনের মাধ্যমে অনেক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এর ফলাফল খুব আশান্বিত বা উৎসাহ যোগানোর মতো নয়। ওই প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে বা সীমিতভাবে সফল না হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার দায়িত্ব তাদের সদস্যদের বহন করতে হতো। এসব সমবায়ের অধিকাংশ সদস্যই নিজেদের অনক্ষরতা ও অযোগ্যতার জন্য তা পরিচালনা করতে সক্ষম না হওয়ায় কিছু সংখ্যক নেতা এবং ওই সংগঠনের কর্মকর্তা ব্যক্তিদের দ্বারা তাদের স্বার্থে এবং দুর্নীতিগ্রস্তভাবে পরিচালিত হতো। এ ধরনের পরিচালনার জন্যই বেশীর ভাগ সমবায় সমিতি সফলতার আলো দেখতে পারেনি। এ সমবায় থেকে পরবর্তী যে শিক্ষা নেয়া হয়েছে সেগুলো হলো–

১. সমিতি গঠন/গ্রুপ গঠন

২. ক্ষুদ্র পরিমাণ ঋণ প্রদান

৩. সাপ্তাহিক কিস্তি আদায় প্রক্রিয়া

www.pathagar.com

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কুমিল্লা এ ধরনের কাজের অগ্রদূত ছিল। সীমিত আকারে তাদের সফলতাকে সরকার ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু তা সফলতার আলো দেখতে সমর্থ হয়নি।

সমবায়ের বিকল্প হিসেবে বহুসংখ্যক এনজিও অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ চালিয়ে যায়। এ সময়ে এনজিওগুলোর কর্মসূচী বিদেশী অনুদানে পরিচালিত হতো। তাই এনজিওগুলো ব্যাপক ভাবে অর্থায়নের অভাবে ও কাজের ব্যাপকতা অধিকসংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে সমর্থ হয়নি।

এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেন। পরীক্ষামূলক কাজে ক্ষুদ্র দল গঠন এবং দলীয় গ্যারান্টির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে আদায়ের হার সাময়িকভাবে হলেও সন্তোষজনক ছিল। এ পরীক্ষা সফল হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে আরও বহু এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাবসায়ে জড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হচ্ছে- ব্রাক, আশা, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, আরডিআরএস, নিজেরা করি, প্রশিকা (কুমিল্লা), হীড বাংলাদেশ, কারিতাস, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ, গনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)। এসব এনজিওকে ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের জন্য গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে সপ্তাহে একবার যেতে হয়। বছরে ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের জন্য কর্মীদের ৫০ বার অফিস থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হয়। ক্ষুদ্র ঋণ বার্ষিক একবারে পরিশোধ হয়না বিধায় আদায়ে অনেক শ্রম, সময় ব্যয় হয়। একদিকে অল্প টাকা, অন্যদিকে শ্রম ও ঘন আদায় অর্থাৎ প্রচলিত পদ্ধতি থেকে ৫০ গুন বেশী। ক্ষুদ্র ঋণে প্রাথমিকভাবে অল্প পরিমাণ টাকাটাই দেয়া হয় যাতে গ্রহীতা ওই পরিমাণ টাকা স্বচ্ছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার এবং ব্যবহার থেকে লাভ করে টাকা ফেরত দিয়ে উদ্বৃত্ত থেকে পুঁজি গঠন এবং সাংসারিক ব্যয় মিটানোতে অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অবদান রাখার জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) গঠন এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের জন্যই আজ বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবার ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় আসতে পেরেছে। এতে তাদের দৈনিক আয় বেড়েছে। এসেছে পরিবারে তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা। সুদ ভিত্তিক গতানুগতিক ব্যাংকগুলো দ্বারা এ কাজ সম্ভব হয়নি বলে বিকল্প ব্যবস্থায় ঋণ প্রদানকারী এপেক্স গঠন করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং কিছু ইসলামী এনজিও ইসলামের বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে একটি মডেল দাঁড় করিয়েছে যা ইতোমধ্যেই গবেষক ও নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা

গ্রামকেন্দ্রিক যেসব প্রতিষ্ঠান গ্রামীন দরিদ্র, অসহায় ও বেকার জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে নিয়োজিত গ্রামীণ ব্যাংক তাদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। গ্রামীণ

www.pathagar.com

ব্যাংকের জন্ম ২রা অক্টোবর, ১৯৮৩ সালে। প্রাথমিকভাবে এর কাজ শুরু হয় ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে হাটহাজারীর ছোট একটি গ্রামে। গ্রামের নাম জোবরা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ ইউনুস এর উদ্যোক্তা। তিনি পুঁজি গঠনের নিমিত্তে দরিদ্র কৃষকদের ঋণদান ও তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা পরীক্ষা করেন। পরে নভেম্বর ১৯৭৯ সালে টাঙ্গাইলে গ্রামীন ব্যাংক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৩ সালে এ প্রকল্প সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোয় রূপ নেয়। সরকার এ ব্যাংককে স্বীকৃতি দেয়। ইফাদ (IFAD), ইউনিসেফ, ফোর্ড ফাউন্ডেশন গ্রামীন ব্যাংককে মূলধন যোগান দেয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

গ্রামের ভূমিহীনদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানই গ্রামীণ ব্যাংক। আবদুর রহমান Demand and Marketing Aspects of Grameen Bank গ্রন্থে বলেন, "গ্রামীণ ব্যাংক এমন একটি বিশেষ ঋণদান সংস্থা যা গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, আয় ও ভোগ বৃদ্ধিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।" এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১. ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা সমূহ গরীব ও দুঃস্থদের নিকট সম্প্রসারিত করা।
২. গ্রাম্য মহাজনদের শোষণ দূর করা।
৩. অব্যবহৃত ও আধা ব্যবহৃত মানব সম্পদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. অবহেলিত জনগণকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা।
৫. চরাচরিত "স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প বিনিয়োগ, স্বল্প আয়" এ দুষ্ট চক্রকে ঘুরিয়ে "স্বল্প আয়, ঋণ, বিনিয়োগ, বেশী আয়, বেশী বিনিয়োগ, আরও আয়"তে রূপান্তরিত করা। অর্থাৎ রেগনার নার্ক্সের কথিত দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা চালানো।

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ও কর্মসূচী

১. এমন সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি করা যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও ভূমিহীনরা কোন জামানত ছাড়াই ঋণ লাভ করতে পারে।
২. গ্রামের বেকার ও পরনির্ভরশীলদের দক্ষতা ও প্রয়োজনানুযায়ী ঋণ সুবিধা প্রদান করা।
৩. ঋণ প্রদানে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া।
৪. বেকার ও পরনির্ভরশীলদের স্বনিয়োজিত কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করন ।
৫. গ্রামের ভূ-স্বামী ও মহাজনদের দৌরাত্ম্য থেকে ভূমিহীন কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি সাধন।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিটি শাখা সাধারণত একজন মাঠ ম্যানেজার এবং কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা কর্মী দ্বারা পরিচালিত হয়। মাঠ ম্যানেজার ও কর্মীগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসাধারণকে গ্রামীণ ব্যাংকের কথা বলেন এবং তাদেরকে এর ভূমিকা ও কার্যবিধি সম্পর্কে অবহিত করেন। যারা ঋণ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তাদের ৫ জনের সমন্বয়ে

www.pathagar.com

একটি দল বা গ্রুপ গঠন করতে হয়। পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা দল বা গ্রুপ থাকে। প্রতিটি দলে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক থাকেন। ৬-৮টি গ্রুপ বা দল নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন কেন্দ্র প্রধান ও উপকেন্দ্র প্রধান নির্বাচিত হন। কেন্দ্র প্রধানের নেতৃত্বে প্রত্যেক সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে সভা হয় সেখানে ঋণের সুপারিশ, ব্যবহার এবং পরিশোধের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সংশ্লিষ্ট দলের সকল সদস্যের এ সভায় উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। একজন ব্যাংক কর্মীও এ সভায় উপস্থিত থাকেন। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নিয়মিত সাপ্তাহিক ২% কিস্তি তে পরিশোধযোগ্য এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে জামানত হিসেবে কোন জামানত বা বন্ধক দিতে হয় না। ঋণ বিতরণের সময় প্রদত্ত ঋণের ৫% গ্রুপ ফান্ডে জমা রাখতে হয়। এ গ্রুপ ফান্ড থেকে পরবর্তী কালে যে কোন সদস্য বা সদস্যা পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী টাকা ঋণ হিসেবে নিতে পারে। প্রতি সাপ্তাহিক সভায় সবাইকে ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হয়। বর্ধিত আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশই ঋণ পরিশোধে ব্যয়িত হয়। উচ্চ সুদের হারের কারণে অনেক ঋণ গ্রহীতাই একে নতুন মহাজন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ফলে দরিদ্র ও ভূমিহীনরা 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' ভেঙ্গে উপরে উঠে আসতে পারছেন না। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণদানের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাদেরকে আরও অধিক ঋণে জড়িয়ে ফেলছে। প্রথম ঋণ সীমার তুলনায় পরবর্তীতে আরও বেশী ঋণ নিচ্ছে। ওই টাকাতে আগের ঋণ পরিশোধ করছে। স্বচ্ছল ঋণ গ্রহীতারা ঋণ নিয়ে আরও অধিক সুদে অপরদের ঋণ দিচ্ছে। ফলে নতুন মহাজন সৃষ্টি হচ্ছে। নিকটাত্মীয় নিয়ে গ্রুপ গঠন নিষিদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এ নিয়ম মানা হয় না। ফলে দুর্নীতিত বাড়ছে। ঋণের টাকা কাগজপত্রে যেভাবে দেখান হয় বাস্তবে সেভাবে ব্যবহার করা হয় না। ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলে পাশ বই ফেরত নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এভাবে তালগোল পাকিয়ে বেশী টাকা আদায় করা হয়। গ্রুপ ফান্ডের টাকা ব্যাংক ফেরত দেয় না। কিস্তি পরিশোধের সময় অমানবিক আচরণ করা হয়। পুলিশের ভয় দেখানোর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাদের কিস্তি পরিশোধ করতে বাধ্য করা হয়। কিস্তি শোধ করতে না পারায় অনেক ঋণ গ্রহীতা আত্মহত্যাও করেছে।

বিগত কয়েক বছরে গ্রামীণ ব্যাংক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদের বেশীর ভাগই হচ্ছে মহিলা। মহিলারা তুলনামূলকভাবে পশু-পালন ও মৎস চাষের চেয়ে ব্যবসা ও দোকানদারীতে বেশী ঝুঁকে পড়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের দাবী অনুযায়ী তাদের ঋণ রিকভারীর পরিমাণ ৯০% তবে পুরুষদের দেয় ঋণ রিকভারীর তুলনায় মহিলাদের দেয় ঋণের রিকভারীর হার (৯৭%) বেশী। গ্রামীন ব্যাংকের সদস্যদের মধ্যে নাগরিক চেতনাবোধ জাগ্রত হচ্ছে। এ ব্যাংকের সদস্যরা স্থানীয় ইউপি নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করেছে এবং কেউ কেউ স্থানীয় ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জিতেও গেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, সদস্যদের ঋণ দিয়ে ১৬% সুদ আদায় করা হয়। অথচ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন ইফাদ) থেকে যে অর্থ গ্রহণ

www.pathagar.com

করা হয় তার সুদ মাত্র ২%। আবার এ অর্থের কিয়দাংশ বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংকে মেয়াদী হিসেবে জমা রেখে উচ্চ হারে সুদ অর্জন করা হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক এভাবে সুদী শোষণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় পরিণত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক অকৃষি কাজের জন্যই বেশী ঋণ দিয়ে থাকে। এতে কৃষি ও অকৃষি খাতের প্রয়োজনীয় ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। মাহবুব হোসেন দেখিয়েছেন যে, অকৃষি খাতে 'রিপিট ঋণের' ব্যাপক প্রয়োগের ফলে ঋণের অংক যে হারে বাড়ছে, আয় সে হারে বাড়ছে না। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে শুধুমাত্র ঋণ দেয়া তদারকী করা এবং ঋণ আদায় করার উপরই বেশী জোর দেয়া হচ্ছে। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় এতে দারিদ্র্য নিরসনে সার্বিক কোন প্রক্রিয়ার জন্ম হয়নি। ডঃ আতিউর রহমান লিখেছেন, গ্রামীণ ব্যাংকে বর্তমানে ঋণের ব্যবহার নিয়ে কড়াকড়ির মাত্রা শ্লথ হয়ে এসেছে। বিষয়টি উদ্বেগের। ব্যবহার সঠিক না হলে ঋণের উৎপাদনশীলতা বিনষ্ট হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণের কারবার থেকে বর্তমানে লাভজনক ব্যবসা বানিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। গ্রামীণ কোম্পানী পরিবারে (Grameen Family of companies) এখন অনেকগুলো কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যেমন : গ্রামীণ ফোন, গ্রামীণ সাইবারনেট, টিউলিপ (গন স্বাস্থ্যের সাথে যৌথ উদ্যোগ), গ্রামীণ টেক্সটাইল, গ্রামীণ এগ্রিকালচার, গ্রামীণ ট্রাষ্ট, গ্রামীণ উদ্যোগ, গ্রামীণ টেলিকম, গ্রামীণ কমিউনিকেশনস, গ্রামীণ ফান্ড, গ্রামীণ সামগ্রী, গ্রামীণ চেক, গ্রামীণ হেলথ, গ্রামীণ কল্যান, গ্রামীণ শক্তি, গ্রামীণ সফটওয়্যার, গ্রামীণ আইটিপার্ক, গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন, গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন, গ্রামীণ ব্যবসা বিকাশ, গ্রাম বাংলা রফিক অটোভ্যান ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক) এর অভিজ্ঞতা

ব্রাক বাংলাদেশের একটি সুবৃহৎ এনজিও। এটি শক্তিশালীও বটে। এ শক্তিশালী এনজিও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে কাজ করছে। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদ। তিনিই ব্র্যাকের স্থপতি। এ প্রতিষ্ঠান প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। জনাব আবেদ প্রথমে ১৯৭২ সালে Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC) গঠন করেন। পরে এর মানেটা বদলে Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) করা হয়। ব্র্যাকের রূপকার, মূল চালিকা শক্তি ফজলে হাসান আবেদ কর্মজীবন শুরু করেন বিদেশী তেল কোম্পানীর একাউনটেন্ট হিসাবে। ১৯৭০ সালে সিলেটের সাল্লাতে ঘুর্ণিঝড়ের পর ত্রাণ কাজ করতে গিয়েই জনাব আবেদের গ্রামীণ অভিজ্ঞতার সূচনা। ১৯৭১ সালের পট পরিবর্তনের পর যুদ্ধোত্তর জরুরী ও তাৎক্ষণিক সাহায্য এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করা হয়। পরে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ব্রাকের কার্যক্রমের তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ছিল ত্রান তৎপরতা দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। এর মধ্যে ছিল- কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, শিক্ষা, কৃষি, মৎস উন্নয়ন, গ্রামীণ সমবায়, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা, মহিলাদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি। নিজস্ব

www.pathagar.com

ডেমোনেস্ট্রেশন প্লটে চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখানো হয়। সরকারী পতিত জমি ও বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি চুক্তিতে চাষাবাদ করা হত । তৃতীয় পর্যায়ে সকল তৎপরতার দৃষ্টিভংগী ছিল গ্রাম উন্নয়ন এপ্রোচ (Community Development Approach) । এ এ্যাপ্রোচের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে তৃতীয় পর্যায়ে শুরু হয় টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ। গ্রামের গরীবদের জন্য তাদের নিয়ে 'অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ' নেয়া হয়।

ব্রাক গত ৩৩ বছর ধরে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে কাজ করছে। ব্রাক মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, জনগণকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা প্রদান করছে। লিগ্যাল লিটারেসি প্রোগ্রামের মাধ্যমে জনগণকে আইনগত অধিকার সম্পর্কেও সচেতন করছে। কিছু ক্ষেত্রে ব্রাক সরকারী দায়িত্বের অংশীদারিত্বও করছে।

ব্রাক এ পর্যন্ত ৬৪ জেলার ৪৮০ টি থানার ৬৮,৪০৮টি গ্রাম এবং ৪,৩৭৮টি শহুরে বস্তি র ১০ কোটি মানুষদের ঋণ দিয়েছে ১৩,৩২১ কোটি টাকা। এর মধ্যে বর্তমান পাওনার পরিমাণ ১,৪৬৩ কোটি টাকা। তাদের দাবী অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের হার ৯৮.৭৪%। ব্রাকের দেয়া ঋণের টাকা রেশম চাষ, হাঁস-মুরগী-গবাদী পশু পালন, হস্তশিল্প, মৎস্য চাষ ও কৃষি থেকে শুরু করে নানা রকম ক্ষুদ্র ব্যবসায় খাটানো হয়। ব্রাকের ঋণ গ্রহীতাদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ৭৬৬ কোটি টাকা। ব্রাকের রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগাম বিস্তৃত ৬৮,৪০৮টি গ্রামে। নন-ফর্মাল স্কুল, যা তিন বছর মেয়াদী প্রাইমারী শিক্ষা দিয়ে থাকে, তার সংখ্যাও ৩৪ হাজারের মত। এসব স্কুলের ১১ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৭০ শতাংশ। ১ কোটি ৪০ লক্ষ বাড়ীতে ব্রাক খাবার সেলাইন তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ২০ লক্ষ লোক রয়েছে ব্রাকের মাতৃদুগ্ধ ও উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায়। সরকারকে সহায়তামূলক টীকাদান কর্মসূচীর অধীনে রয়েছে আরও ৮০ লাখের বেশী মানুষ। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সরকারী স্বাস্থ্য অবকাঠামোর উন্নয়নে সহযোগিতা ছাড়াও ব্রাক কিছু কিছু রোগের চিকিৎসা করে থাকে। বর্তমানে ব্রাকে চিকিৎসাধীন যক্ষা রোগীর সংখ্যা হচ্ছে ৩,০০০। ব্রাকের আড়ং এ বিক্রিত হস্তজাত সামগ্রীর উৎপাদনে জড়িত রয়েছে ২২ হাজার কর্মী। ব্রাক পিন্টার্স ব্রাকের অর্থকরী প্রকল্প। ব্র্যাকের পরিবেশিত এসব পরিসংখ্যান ব্রাকের কর্ম বিস্তৃতির পরিচয় দেয়।

ব্রাকের সবচেয়ে বড় কর্মসূচী হচ্ছে আর ডি পি বা রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম । আর ডি পি'র অধীনে ঋণ পেতে হলে গ্রাহকদের ন্যূনতম জমি (৫০ ডেসিমালের নীচে) থাকতে হবে এবং তার ন্যূনতম মূলধন (ঋণের ১০ শতাংশ) থাকতে হবে। ব্রাকের আদর্শ হচ্ছে অর্থনীতিবিদ রবার্ট চেম্বার। ব্রাক তার ২০ বছরের পরিচিতিপত্রের প্রথমেই রবার্ট চেম্বারকে উদ্ধৃত করেছে।

ব্রাকের ঋণ পাওয়ার শর্ত হচ্ছে ঃ

১. গ্রুপ সদস্য হতে হবে।
২. নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় থাকতে হবে এবং সপ্তাহে মাথাপিছু ২ টাকা হারে জমা দিতে হবে।
৩. ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।

www.pathagar.com

৪. অনুমোদিত ঋণের ১০% সঞ্চয় থাকতে হবে।
৫. সগ্রুপকে দায়িত্ব অর্জন করতে হবে।

বিভিণ্ন ব্যক্তির জন্য বা সমষ্টিগতভাবে ঋণের জন্য যে প্রকল্প তৈরি হবে তা গ্রুপ থেকে পর্যালোচনা ও অনুমোদিত হতে হবে। গ্রুপের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য এর সভায় উপস্থিত থাকতে হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের শতকরা ৭৫ ভাগকে এ আবেদন অনুমোদন করতে হবে। সুদের হার সমষ্টিগত ঋণের জন্য ২০% এবং ব্যক্তির জন্য ১৮% থেকে ২৪%, ব্যবসার জন্য ৫০০ টাকার বেশী ঋণ দেয়া হলে সে ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য সুদের হার ২৫% এবং মহিলাদের জন্য ১৫%। গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের গ্রুপ গঠন ও তাদের বিভিন্ন সেলাই কাজে ঋণ প্রদান ইত্যাদি পরিপূরক প্রকল্প হচ্ছে আড়ং। গ্রামীন মহিলাদের কাছ থেকে ন্যূনতম মূল্যে তৈরি কাপড় ও অন্যান্য কর্মসূচীর সামগ্রী আড়ং এর মাধ্যমে এ দেশের বড় বড় শহরে বাজারজাতকরণ করা হয়।

ব্রাক এ পর্যন্ত বিভিণ্ন বিদেশী দাতা সংস্থার কাছ থেকে যেমন সিডা, ইউনিসেফ, অক্সফাম, হু, ফাও, এসডিএফ প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করেছে। সরকারের বিনানুমতিতে ব্রাক ২৪ কোটি টাকা গ্রহণ করেছে । সরকারের অনুমতির তোয়াক্কা না করে বিদেশী প্রভুদের এনে বছরের অধিকাংশ সময়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব আবেদ বিদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত থাকেন। তিনি ব্রাকের বিভিণ্ন প্রকল্প থেকে লক্ষাধিক টাকা বেতন ভাতা গ্রহণ করেন।

ব্রাক দেশের ৬৪টি জেলায় জমি ক্রয় ও ভবন নির্মাণের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশে ঘাঁটি করে চলেছে। শুধুমাত্র গাজীপুরেই ব্রাক প্রায় বিশ একর জমির উপর ট্রেনিং কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করেছে। ঢাকা মহানগরীর মহাখালীতে বহুতল নিজস্ব ভবনেও ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। একটি অত্যাধুনিক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনা সংস্থার মালিক হচ্ছে ব্রাক।

ব্রাক কোল্ড স্টোরেজ, হাউজিং ব্যবসা, ইন্টারনেট সার্ভিস দিয়ে, সফটওয়্যার তৈরি করে, বাগান করে, আড়ং নামে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বাণিজ্যিক দোকান স্থাপন করে এবং প্রিন্টিং কমপ্লেক্স স্থাপন করে প্রচুর অর্থ মুনাফা করছে। এনজিও নাম ব্যবহারের সুবাদে ব্রাক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে কর রেয়াত সুবিধা নিচ্ছে। অথচ সরকারের কোন বিভাগের কাছেই ব্রাক তার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করছে না। মুনাফালব্ধ কোটি কোটি টাকার হিসাব সম্পর্কে সংস্থার কোন দায়বদ্ধতা নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, আড়ং এর পণ্য বিক্রি হয় গলাকাটা দামে। অথচ যারা এসব উৎপাদন করে তাদের ভাগ্যে জোটে ১০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র।

ব্রাকের পুরুষ সমিতির একজন সক্রিয় কর্মী মন্তব্য করেছেন, ব্রাক এর শিক্ষা আমরা নিলাম। সমিতি করলাম। খাসজমি দখলের ঝগড়া বাঁধালাম। মারপিট করলাম মামলা বাঁধলো। জমি বেচলাম, গরু বেচলাম, ঘর বেচলাম। বেচলাম যার যা ছিল। হলাম সর্বশান্ত, ব্রাক শুধুই দেখলো। আমরা এখন সর্বহারা ।

www.pathagar.com

নরসিংদীর শিবপুরের একটি ঘটনা। ব্রাক থেকে ঋণ নেয়ার পর নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় ব্রাক থেকে চাপ আসতে থাকে। ঋণ বিতরণকারী কর্মীটি নিয়মিত চাপ দিতেই থাকে বাড়ী গিয়ে। পুলিশের ভয় দেখানো হয়। ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দেয়ার ভয় দেখায়। কাজ হয় না। ঋণ গ্রহীতা ভয়ে পালিয়ে থাকে। স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়া হয়। স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে পালিয়ে থাকে। অর্ধাহারে, অনাহারের সঙ্গে নেমে আসে এক দুঃসহ অধ্যায়ের, ব্রাক কর্মীটি পড়ে বিপদে। খুঁজে পায় না স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে। ধরার কৌশল ব্যবহার করা হলো। বেছে নেয়া হলো শবেবরাতের রাত। এ রাতে নিশ্চিত স্বামী-স্ত্রী বাড়ীতে থাকবে। দু'জন পুলিশ নিয়ে রওয়ানা দিলেন ব্রাক কর্মীটি। বাড়ীতে পাওয়া গেল স্ত্রীকে। পুলিশী নির্যাতন চলল কিছুক্ষণ। যদিও এ খেলাপীর ব্যাপারে স্ত্রী জড়িত ছিলেন না। মসজিদ থেকে ধরে আনা হলো স্বামীকে। বাঁধা হলো খুঁটির সঙ্গে। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতন চালানো হলো, জোর করে আদায় করা হলো তারিখ, কবে দিবে সে টাকা। ব্রাকের কর্মকর্তার নির্দেশ ছিল-ঋণ গ্রহীতার বাড়ীতে যা পাবে তাই নিয়ে আসতে হবে। ব্রাক কর্মী তাই করল। দেড় কেজি চাল এবং ঋণ গ্রহীতার স্ত্রীর প্রায় নতুন একটি শাড়ি নিয়ে কেন্দ্রে রওয়ানা দিল। বিবেকের তাড়নায় কর্মীটি ব্রাকের চাকুরী পরের দিন ছেড়ে দিয়ে চলে আসে । এ বক্তব্য চাকুরী ছাড়া কর্মীটির।

উক্ত কর্মী ব্রাকের আর একটি ঘটনা বিবৃত করেছেন। এটি তার এক সহকর্মীর ক্ষেত্রে ঘটেছে অন্য আর এক গ্রামে। এক বিধবাকে ঋণ দেয়া হয় ৩ হাজার টাকা। বিধবা গৃহীত ঋণের প্রথম কয়েক কিস্তি মোটামুটি ভালভাবে শোধ করে। তারপর বিভিন্ন অসুবিধার কারণে অনিয়ম শুরু হয়। চাপের মুখে দুটো ছাগল বিক্রি করে কিছু কিস্তি শোধ করে, কিছু নিজের জন্য খরচ করে। তারপর আবার চাপ। ভয়ে বাড়ির একটি আমগাছ বিক্রি করে। এতেও শোধ দিতে পারেনা কিস্তি। ব্রাক কর্মীর উপর চাপ বাড়তে থাকে। বিধবা ভয়ে পালিয়ে থাকেন ক'দিন। একদিন ধরা পড়ে যান। কর্মীটি রাগে মহিলার চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে গলার উপর পা তুলে দিয়ে বলতে থাকে- বল কবে দিবি টাকা। টাকা না দিলে মেরেই ফেলব। মাত্র ৪শ' টাকার জন্য এ বর্বর অত্যাচার। মহিলা ঘরের চালের টিন বিক্রি করে ব্রাকের দরিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। কর্মীটি হিসাব করে দেখালেন যে, এ মহিলার কাছ থেকে তিন হাজার টাকার ঋণের পরিবর্তে দেড় বছরের মধ্যে সুদাসলে ৪,৫৫০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

চাঁদপুরে 'ব্রাক স্কুলের' এক জন ১০/১২ বছরের ছাত্রী মারা গেলে ব্রাকের কর্মকর্তারা মেয়ের পিতাকে সাদা কাফনের পরিবর্তে কালো কাফনে আবৃত করে পূর্ব পশ্চিম দিকে লম্বালম্বিভাবে একটি গর্তে অমুসলিমদের কায়দায় দাফন করতে বলে এবং এর বিনিময়ে ১০ হাজার টাকা দেয়ার প্রস্তাব দেয়। সন্তানহারা পিতা ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং মেয়েকে ইসলামী কায়দায় দাফন করে। কয়েকদিন পর ব্রাক স্কুলের পার্শ্বের গ্রামের এক ব্যক্তি মারা গেলে ব্রাক কর্মকর্তারা মৃতের আত্মীয়-স্বজনকে লাশ উপরে

www.pathagar.com

বর্ণিত কায়দায় দাফন করলে ২০ হাজার টাকা দেয়ার প্রস্তাব দেয়। উক্ত মৃতের আত্মীয়রা এতে রাজী হয়ে লাশ অমুসলিম কায়দায় দাফন করে। পরে কর্মকর্তা কবরের উপর ক্রশ স্থাপন করে তা ভিডিও করে রাখে। এভাবে ক্রশ চিহ্নিত কবরের ভিডিও ধারণকৃত ছবি খৃস্টান দাতা সংস্থা সমূহের কাছে প্রেরণ করে ধর্মান্তকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারণা দেয়া হয়।

ব্রাকের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালানোসহ নীলকরদের মতো জুলুম করার অভিযোগ এনে গত ১২ জুন '৯৪ শত শত দরিদ্র কৃষক মিছিল সহকারে যশোহর জেলা প্রশাসনের দফতর ঘেরাও করে। মনিরামপুর থানার রাজগঞ্জ এলাকার নীপিড়িত জনগণ ব্রাকের বিরুদ্ধে মারামারিতে ইন্ধন যোগান, মৎসজীবিদের সম্পদ হরন সহ গুরুতর অভিযোগ এনেছে। ১৩ই আগস্ট, ০৫ নয়াদিগন্ত পত্রিকায় রাণীশংকৈল উপজেলায় ব্রাকের আরেকটি নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ পায় 'ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় গৃহবধু জেলে' শিরোনামে। উপজেলার চন্দনঘাট গ্রামের কিষাণী জবেদা খাতুন ব্র্যাক থেকে নেয়া ৮ হাজার টাকা ঋণের ১৯শ' টাকা পরিশোধ করতে পারেননি অথচ সিংহভাগ ঋণই কিস্তি তে তিনি পরিশোধ করেছেন।

স্থানীয় ব্র্যাক ম্যানেজার থানায় মামলা করেছেন। পুলিশ ওই সূত্র ধরে জবেদাকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে। খবরটি প্রথম দৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কিছু নয় মনে হতে পারে। মামলা, গ্রেফতার, হয়রানি না করলে ঋণের টাকা উসুল হয় না। দৃষ্টান্ত মূলক কিছু শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে কেউ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে চায় না। তাই 'একটু আধটু' হয়রানি করা ক্ষুদ্র ঋণদাতা এনজিওগুলোর রুটিনওয়ার্ক। গাঁও-গেরামের লোকজন সাধারণতঃ গরিব। সময়মতো ঋণ শোধ করার দায়বোধের চেয়ে ক্ষুধার তাড়া অনেক বেশী। পেটের দায় অনেক বড়। সন্তান-পরিজনের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিতে গিয়ে জবেদার মতো কেউ কেউ ঋণের টাকা পরিশোধের বিষয়টিকে গৌণ করে দেখতে বাধ্য হয়।

ব্র্যাক ম্যানেজার দায়িত্ব পালন করেছেন নিয়ম মেনে, কিন্তু বিবেকের দংশনটা অন্যখানে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের যে চমকপ্রদ প্রচারণা, তা কতটুকু সঠিক। গ্রাম পর্যায়ে এ মর্মে প্রচুর তথ্য রয়েছে। অসংখ্য জবেদা ঋণের টাকা তুলে শেষে ঘর-বর সব হারিয়েছেন। নাকের নথ, কানের দুল, কোমরের বিছা, পায়ের নূপুর ইত্যাদি অলঙ্কার ছাড়াও হালের গরুসহ চাষাবাদের উপকরণ, বাসন-কোসন, মুরগি, ছাগল সব কিছু ঋণদাতাদের কাছে তুলে দিয়েও অনেক অনেক পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বার বার ঋণ দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে একজন গরিব কৃষকের ক্রয় ক্রয়ক্ষমতা সাময়িকভাবে বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু তার প্রকৃত আয় বাড়েনি। ব্র্যাক অত্যন্ত পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত বড় মাপের এনজিও। তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিধি অনেক বড়। মানবতা উন্নয়ন করে, প্রতিযোগিতাহীন বাণিজ্যও করতে পারে। অথচ এত আড়ম্বর এবং জেলহাজতে যেতে হয়। মানবতার এত স্লোগানের আওতায়

www.pathagar.com

জাবেদাদের ঠাঁই হয় না কেন! যে দেশে ঋণ খেলাপিরাই অর্থনীতির চাকা ঘোরায়, সদম্ভে ঘুরে বেড়ায় সমাজের বুকে, সরকারী অফিসে জনগণের টাকা বকেয়া বিলের নামে আটকা পড়ে কোটির হিসাবে, সে দেশের মানুষ কার কাছে ইনসাফ চাইবে? এত সব করুণ চিত্রের পরও এনজিওগুলোর ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের সাফল্য যে নাই তা বলা যায় না। কিন্তু এত বড় বাতির নিচে অন্ধকারটা তো দৃষ্টির আড়ালে রাখা যায় না।

ব্রাক দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দেশ ব্যাপী চড়া সুদের মহাজনী ঋণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদ উঠেছে দেশ ব্যাপী। প্রতিবাদের সাথে ঘৃণা, ধিক্কারও উচ্চারিত হচ্ছে। দেশের সচেতন নাগরিকগণ ব্র্যাকের শোষণের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষার জন্য সরকাররের কাছে আবেদন রেখে সর্বত্র প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করছেন।

ব্রাক ক্ষুদ্র ঋণ প্রার্থীদের ১৭টি শর্ত মুখস্ত করায়। যে মুখস্ত করতে পারবে না তার ভাগ্যে ঋণ জুটবে না। সাধারণভাবে একে 'চিলকি' বলে । 'চিলকির' সময় প্রত্যেক সদস্যকে লাইন ধরে বসতে হয় এবং জোরে জোরে শর্ত মুখস্ত করতে হয়। অনেকের পক্ষে বিষয়টি বেশ কষ্ট সাধ্য। এ নিয়ে অনেক স্থানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে। যশোর জেলার সারসা থানার কিছু গ্রামে চিলকি শেখার ভয়ে মহিলারা সমিতি ছেড়ে দেয়। তারা বলেন স্বামী সংসার ফেলে রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা চিলকি শেখার সময় কোথায়।[২৯]

ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবসার পাশাপাশি ব্র্যাক শিল্প ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যও গড়ে তুলেছে। ব্রাকের সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে ব্রাক ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, ব্রাক ইন্ড্রাষ্ট্রিজ লিমিটেড, ব্রাক বাংলাদেশ মেইল নেটওয়ার্ক লিমিটেড, ব্রাক সার্ভিসেস লিমিটেড, ব্রাক রেনেটা এগ্রো ইন্ড্রষ্ট্রিজ লিমিটেড, ব্রাক কনকর্ড ল্যান্ডস লিমিটেড, ডেল্টা ব্রাক হাউজিং ফাইনান্স কর্পোরেশন, ব্র্যাক টি কোম্পানীজ, ডকুমেন্টস টিএম লিমিটেড ইত্যাদি। ব্রাক জুন ২০০২ সাল হতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানেও কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। আফগানিস্তানের ১৭টি প্রদেশের ৯৪টি জেলায় ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, কৃষি উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে।

আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন

ব্রাক সাম্রাজ্যের সম্রাট ফজলে হোসেন আবেদ তার মরহুমা স্ত্রীর স্মরণে প্রতিষ্ঠা করেন আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন। নারী উন্নয়নের নামে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন নারীদের শ্রমকে শোষণ করছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে ফাউন্ডেশন নামের এ বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পূঁজি সংগৃহীত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের নাম হলেও এটি মূলতঃ মহিলাদের শ্রমভিত্তিক হস্ত ও টেক্সটাইল জাত সামগ্রীর উৎপাদন কেন্দ্র। ব্রাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আরডিপি) ভুক্ত দলীয় সদস্যদের সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রতিদিন মাত্র দশ টাকা মজুরীর বিনিময়ে কাজ করানো হয়। ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত পন্য সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে ব্র্যাকের অভিজাত দোকান 'আড়ং'-এ অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে। রফতানী

www.pathagar.com

হচ্ছে বিদেশে। গ্রামীণ মহিলাদের শ্রম শোষণ করা হচ্ছে- তাদের দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে। এভাবেই এ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করছে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের তথাকথিত নারী উন্নয়ন কর্মসূচী।[৩০]

প্রশিকা

ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী এনজিও সমূহের মধ্যে আরেকটি নেতৃস্থানীয় সংস্থা প্রশিকা। সংস্থাটি গ্রামীণ ব্যাংকের মতো জমা ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ সংস্থাটি ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংগঠন অধ্যাদেশের আওতায় নিবন্ধীকৃত। এ আইন অনুযায়ী অর্থনৈতিক লাভজনক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রশিকা ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০টি বাস নিয়ে গড়ে তুলেছে 'দ্রুতি' নামে একটি পরিবহন সংস্থা। কয়েক কোটি টাকায় স্থাপিত হয়েছে অত্যাধুনিক ছাপাখানা, গার্মেন্টস ইন্ড্রাষ্ট্রিজ, রেডিও ওয়্যার এবং ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে গঠিত হয়েছে ভিডিও লাইব্রেরী। এসব ব্যবসা থেকে লাভের বিষয়টি সংস্থাটি কাউকে জানতে দেয়না। সংস্থা ঢাকা মহানগরীতে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সদর দফতর নির্মাণ করেছে এবং সেখানে প্রধান নির্বাহীর জন্য স্থাপন করেছে ৩ লাখ টাকা দামের একটি অত্যাধুনিক টেলিফোন সেট। এ পর্যন্ত এ সংস্থা প্রায় ৩০ কোটি টাকা সরকারের অনুমোদন ছাড়া দাতা সংস্থার কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। সংস্থার প্রধান নির্বাহী লক্ষাধিক টাকা বেতন ভাতা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রকল্পের প্রায় ৩০ ভাগ অর্থ বেতন ভাতা বাবদ ব্যয় হয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো তদন্ত করে নিশ্চিত হয়েছে যে, প্রশিকা বিদেশ থেকে সাহায্য এনে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ক্ষেত্র বিশেষে রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে দিয়েছে আর্থিক সহায়তা। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে আনা অর্থ ব্যয় করা হয়েছে প্রশিকা কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও। এমনকি এসব তহবিল ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের ছেলে-মেয়েরাও বিদেশ ভ্রমন করেছে।[৩১]

আর ডি আর এস

রংপুর-দিনাজপুর রুরাল সার্ভিস (RDRS) লুথারান ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৭১ সালে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ রিফিউজি ক্যাম্পে নিজস্ব নামে সহায়তা কার্যক্রমের সূচনা করে। স্বাধীনতার পর রংপুর-দিনাজপুর রিহেবিলিটেশন সার্ভিস এবং ১৯৮৬ সাল থেকে আরডিআরএস নামে কাজ করছে। উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর দিনাজপুর-রংপুর অঞ্চলে কাজ করছে। এ সংস্থা দীর্ঘ দিন ধরে এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীসহ বিভিণ্ন বিষয়ে কর্মরত থাকা সত্বেও তাদের বড় ধরনের কোন প্রকল্প চোখে পড়ে না। এ সংস্থা নীরবে ও কৌশলে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করছে। বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুরের যে সব অঞ্চলে আদিবাসী, উপজাতীয় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক বাস করে এবং যেগুলো সীমান্ত এলাকা কেবলমাত্র যেসব অঞ্চলেই এ সংস্থার কর্মকান্ড সীমিত। সংস্থার প্রধান প্রধান পদগুলোতে খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান সুদৃঢ় রয়েছে। সীমান্ত এলাকার বদলে দেশের অভ্যন্তরে প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণে এ সংস্থা আগ্রহী নয়। সংস্থার বাজেটের মোটা অংশ কর্মকর্তাদের বেতন-

www.pathagar.com

ভাতা বাবদ খরচ হয়ে যায়। এ সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিঃ টরবেন ভি পিটারসন এক যুগ এ সংস্থায় কাজ করেন এবং বিদেশ থেকে অজানা পরিমাণ অর্থ বেতন বাবদ গ্রহণ এবং বাংলাদেশে থাকার নামে মাসিক তিন লক্ষাধিক টাকা সুবিধাদি গ্রহণ করেও সংস্থার জন্য কোন অবদান রাখতে পারেননি।

উপরে নমুনা হিসেবে গ্রামীন ব্যাংক আরও ৪টি এনজিওর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম আলোচনা করা হলো। অন্যান্য সেক্যুলার এনজিওর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের একই ধরনের শোষণ মূলক চরিত্র আজ সর্বজন বিদিত। তাদের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য আজ দেশবাসীর সামনে পরিষ্কার হয়েছে। প্রথমতঃ একধরনের নির্ভরশীল সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক জাল বা সেফটি নেট এর মাধ্যমে হত দরিদ্রদের কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখা। বস্তুত এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এক ধরনের মহাজনী প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের নামে সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন সুদৃঢ়করণ কৌশল

বাংলাদেশ আজ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালে জড়িয়ে গেছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এরা সাম্রাজ্যবাদী বন্ধনই সুদৃঢ় করছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের নামে তারা যে সুদ আদায় করছে তা মহাজনদেরকেও হার মানায়। গ্রামাঞ্চলে এরা নব্য মহাজন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষ মতাদর্শ ও ধর্মমতের প্রচার ও প্রসারের অনভিপ্রেত অভিযোগ এদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হচ্ছে। এ ছাড়া সুদের হারে মহাজনী ব্যবসা, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে খৃস্টান ধর্মের প্রচার, খৃস্টান জনশক্তির জন্য সিংহভাগ অর্থ ব্যয়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের দিক দিয়ে এরা হিন্দু-ইহুদী সুদী মহাজনদের চেয়েও ঘৃণ্য, চারিত্রিক দিক থেকে নৈতিকতা বিবর্জিত ভোগবিলাসী, পেশার দিক থেকে সেবা বিক্রয়কারী মার্চেন্ট (Aid Merchant), মনোভংগীর দিক থেকে বুর্জোয়া, ধর্মের দিক থেকে ইসলাম বিরোধী এবং খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে ব্রতী, সামাজিক দিক থেকে পর্দা, শালিনতা এবং পারিবারিক ব্যবস্থা বিরোধী, অর্থনৈতিক দিক থেকে এরা মারাত্মক দুর্নীতিপরায়ণ, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য উপনিবেশবাদের বর্ধিত হাত। এসব প্রতিষ্ঠান মূলত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ। দারিদ্র্য বিমোচন এদের শ্লোগান, বাংলাদেশের দুঃস্থ জনগণদের বানিজ্য পণ্য এবং বাংলাদেশ এদের একচেটিয়া বাজার বা উপনিবেশ। এক্ষেত্রে তাদের অনুসৃত কৌশল সমূহ নিম্নরূপঃ

১. এটি সর্বজন বিদিত যে খৃষ্টীয় পুঁজিবাদীরা বিনা মুনাফায় একটি পেনিও বিনিয়োগ করে না। তাহলে কেন কোটি কোটি টাকা এ দেশে ঢেলে দিচ্ছে। সেবা ও সহযোগিতার লেবাস পরে অধিকাংশ পাশ্চত্য প্রভাবিত সংস্থা খৃস্টান ধর্ম ও পশ্চিমা ভোগবাদী জীবন দর্শন প্রচারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। বিশেষ লক্ষ্যে পৌছাই এদের টার্গেট। এরা পশ্চিমা ভোগবাদী ধর্ম ও দর্শন প্রচারের মিশনারী।

২. ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁরা এদেশের দরিদ্র জনগণের চির দরিদ্র, অনুগত ও শোষিত রাখার গভীর চক্রান্তে লিপ্ত।

www.pathagar.com

৩. এদেশকে পরনির্ভরশীল করে রাখা তাদের টার্গেট। জাতিকে দান-খয়রাত ও ক্ষুদ্র ঋণের নামে পরনির্ভরশীল করে রাখা হচ্ছে। উন্নয়ন তত্ত্বের মোড়কে পরনির্ভরশীলতার দাসখত পড়াচ্ছে জনগণকে।

৪. এ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে।

৫. বাংলাদেশে ভোগবাদী চিন্তা ও বস্তুবাদী দর্শনকে চাপিয়ে দেয়া চেষ্টা করছে।

৬. বাংলাদেশের গ্রামীন জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বহুজাতিক কোম্পানীসমূহের পণ্য বিপণনের প্রসার ঘটিয়ে মুনাফা লুণ্ঠন করাও এদের অন্যতম টার্গেট।

৭. বিভিন্ন স্তরের মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন দল ও মতাদর্শের বিরোধের পাশাপাশি নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির শ্লোগানের আড়ালে নারী পুরুষে বিরোধ সৃষ্টি করে পুরো সমাজকে নৈরাজ্য বা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। অবাধ যৌনাচারকে উৎসাহিত করে সমাজকে পংগু করে দেয়া।

৮. উপমহাদেশে যেভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসার ছদ্দবেশে এসে এদেশ ও জাতিকে শোষণ করেছে এবং এক পর্যায়ে করেছে শাসন, এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবসায়ীর ভূমিকা এর চেয়ে ভিন্ন নয়। অথচ এরা ক্ষুদ্র ঋণ, উন্নয়ন ও সেবার নামে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে।

৯. ক্ষুদ্র ঋণ ও অন্যান্য সেবা কর্মসূচীর মাধ্যমে এদেশে পাশ্চাত্যের আনুগত একদল দালাল সৃষ্টি করা, যারা মন মানসিকতায় হবে পাশ্চাত্যপন্থী। সাম্রাজ্যবাদীদের এদেশীয় এজেন্টরা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে লাভবান হচ্ছে, গড়ে তুলছে অবৈধ অর্থের পাহাড়।

১০. বিদেশী সাহায্যে কর্মতৎপর দারিদ্র্য বিমোচন ব্যবসায়ীদের আসল লক্ষ্য এদেশের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়া, সভ্যতার মূল্যমান থেকে সরিয়ে নেয়া ও ঈমানের ভিত্তি সমুহের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা।

ক্ষুদ্র ঋণ বিনিয়োগে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর কর্ম-কৌশল

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি। আর ইসলামী অর্থনীতির অংশ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকিং। ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে দ্বীন ইসলামের বিধান অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের প্রত্যয়ে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংক। প্রচলিত ব্যাংকিং ও অর্থায়নের বাইরে বিশেষ নিয়ম-কানুন শাসিত, বিশেষ করে 'উৎপীড়নমূলক সুদ' বিবর্জিত একটি অর্থসংস্থান ব্যবস্থার নামই ইসলামী ব্যাংক। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থায় মানুষের কল্যাণ (Human well being) এর কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, এ বিশ্ব জাহানের সবকিছু একমাত্র মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে মানব কল্যাণের গঠন উপকরণ শুধুমাত্র বস্তুবাদী লক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে বস্তুবাদী লক্ষ্যের সাথে আধ্যাত্মিক উপকরণও সমান গুরুত্ব সহকারে সংযুক্ত। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে মানুষ কখনো সত্যিকার

www.pathagar.com

কল্যাণ লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ইহকাল ও পরকাল উভয় প্রয়োজনের একটি সুষম তৃপ্তি লাভ করে। এ কল্যাণ এমন যা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় না অথচ তা তার দেহিক আরাম, মানসিক শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করে।৩২ এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর লুৎফর রহমান সরকার ১৯৯৭ সালে এক সেমিনারে বলেছিলেন 'মদীনায় যে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল, কালক্রমে তা একটি সুদমুক্ত যাকাতভিত্তিক ইনসাফপূর্ণ সমাজের সৃজন করেছিল, সেখানে ছিল না শোষণ, বৈষম্য, জুলুম, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও অকল্যাণ। ইসলামে কল্যাণকামিতা ইবাদাতের সাথে সম্পৃক্ত এবং অবিভাজ্য। এ কারণে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে কল্যাণ অর্জনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে'।৩৩ যদিও কল্যাণের সংজ্ঞা এবং উপাদান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বের বস্তুবাদী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সমুহের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবু মানব কল্যাণের জন্য কয়েকটি উপদান অপরিহার্য বলে সকল চিন্তাবিদই একমত পোষণ করেন।৩৪ এ উপাদানগুলো হচ্ছে–

১. সর্বাধিক (optimum) উৎপাদন নিশ্চিত করা।
২. যাবতীয় বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ও দক্ষতাপূর্ণ তথা সকল কর্মক্ষম মানুষের যথোপযুক্ত ব্যবহার/সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৩. আয় ও সম্পদের সুষম ও সুবিচারপূর্ণ বন্টন নিশ্চিত করা।
৪. সকল মানুষের জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা।
৫. সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা।

অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন মানব কল্যাণের জন্য উল্লেখিত অপরিহার্য লক্ষ্যসমূহ হাসিল করতে হলে প্রধানতঃ দুটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক;

ক. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সসীম সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ বরাদ্দ ও ব্যবহার।

খ. আয় ও সম্পদের সুষম ও ইনসাফপূর্ণ বন্টন নিশ্চিত করা।

মানব কল্যাণের জন্যই ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য ইসলামী অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনীতিতে সমতা ও সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক সাধারণ ঋণ (কর্জ) দেয়া-নেয়া ছাড়াও ব্যবসা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশলের মধ্যে রয়েছে–

১. সরাসরি বিনিয়োগ

২. লাভ লোকসানের ভিত্তিতে অংশীদারী বিনিয়োগ

i. মুদারাবা, ii. মুশারাকা, iii. মুজারায়া, iv. মুশাকাত, v. মুজরাহ।

৩. ব্যবসা সংক্রান্ত পদ্ধতি

i. বাই মুরাবাহা, ii. বাই মুয়াজ্জাল, iii. বাই সালাম iv.বাই ইসতিসনা, v. বাই মুজায়িদা

www.pathagar.com

৪. ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতি

i. ইজারা, ii. ইজারা বিল বাই

iii.ইজারা বিল বাই তাহতা বিশ শিরকাতিল মিলক

iv.ইজারা ওয়া ইকতিনা-ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিক।

৫. সেবা পদ্ধতি

i. জোয়ালা, ii. সত্যিকার সেবা মূল্যভিত্তিক অর্থায়ান।

৬. ঋণ প্রদান পদ্ধতি

i. কর্জ

ii.আল আরিয়া

i. আল ওয়াদিয়া।

১. সরাসরি বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কোন পক্ষের সাহায্য ছাড়াই নিজেই ব্যবসা-বাণিজ্য , শিল্প-কারখানা, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। শ্রমঘন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তার লক্ষ্যে এবং পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রকল্প এর আওতায় আসতে পারে তার মধ্যে রয়েছে– মৎস্য চাষ প্রকল্প, গো-মহিষাদির খামার, নার্সারী, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদি। ইসলামী ব্যাংক নিজেই এর সংশ্লিষ্ট স্কীম তৈরি থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ নিজেই করে। প্রাপ্ত লাভ-লোকসান ব্যাংকেরই। পৃথিবীর সবকটি ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকও এরূপ প্রকল্প হাতে নিয়েছে (নিমগাছি মৎস্য প্রকল্প)।

২. লাভ-লোকসান অংশীদারী বিনিয়োগ

i. মুদারাবা

দারাবা থেকে মুদারাবা শব্দ এসেছে। এর অর্থ অন্বেষণ করা। এতে এক পক্ষের পুঁজি, আর এক পক্ষের শ্রম পরিচালনা হয়। ব্যাংক তার অংশীদারকে (যাকে উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগ সহযোগিতা গ্রহণকারীও বলা হয়) সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় অর্থ (মুলধন) সরবরাহ করবে এবং অংশীদার কেবল তার অভিজ্ঞতা ও কর্ম প্রচেষ্টা সংযোজন করবে। মুদারাবা বিনিয়োগে ব্যাংক অংশীদারের (মুদারিব) কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে না কিংবা হস্তক্ষেপও করে না। পূর্ব নির্ধারিত শর্তানুযায়ী সম্মত হারে ব্যাংক ও অংশীদারের মধ্যে প্রাপ্ত লাভ ভাগাভাগি হয়। তবে লোকসান হলে ব্যাংক তা একাই বহন করে, অংশীদারের লোকসান যায় তার শ্রম ও সময়। এ পদ্ধতিতে পুঁজির মালিক, অংশীদার হিসেবে পুঁজি রূপান্তর বা বিনিয়োগ করে। এ পদ্ধতিকেই মুদারাবা বলা হয়।

ii. মুশারাকা

মুশারাকা পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে পুঁজি যোগান দেয়। সকলের কারবার পরিচালনার অধিকার থাকে। ব্যাংক তার অংশীদারকে সমুদয় অর্থ

www.pathagar.com

সরবরাহ না করে আংশিক অর্থ সরবরাহ করে এবং পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী মুলধনের হার অনুসারে তাদের মধ্যে লাভ-লোকসান বন্টিত হয়। পুঁজি রূপান্তরের ও ঝুঁকি সকলেই বহন করে। এ পদ্ধতিকে মুশারাকা পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়।
এছাড়াও মুজারায়া, মুশাকাত ও মুজরাহ্ বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।
ক্ষুদ্র বিনিয়োগের বিভিণ্ন কর্মকাণ্ডে এ ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্ত ত দু'টো পূর্বশর্ত লাগবে। যেমন–

ক. অংশীদারকে সকল আয় ব্যয়ের নিখুঁত হিসাব রাখতে হবে। এবং

খ. তাকে অবশ্যই সৎ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

যদি পূর্বাহ্নেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করা হয় তবে বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এরূপ শর্তসমূহ পরিপালন বেশ কঠিন হবে।

৩. ব্যবসা সংক্রান্ত পদ্ধতি

i. বাই মুরাবাহা

রিবহুন থেকে মুরাবাহা Sale at cost plus profit/সম্মত নির্ধারিত লাভে বিক্রয়। এ পদ্ধতিতে আগে মালামাল ক্রয় করে পরে তা ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রহীতাদের কাছে বিক্রি করে দেয়া হবে। পরস্পর সম্মতি অনুযায়ী এতে লাভ যোগ করা হবে। লাভ % হিসেবে নির্ধারণ করা হলেও হালাল হবে।

ii. বাই মুয়াজ্জাল sale on deferred payment (লাভের ভিত্তিতে ধারে বা বাকীতে বিক্রয়)

আজল থেকে মুয়াজ্জল- মানে ভবিষ্যতের নির্ধারিত সময়। ভবিষ্যতে নির্ধারণ কোন সময়ে নির্ধারিত দাম পরিশোধের শর্তে বাকী বিক্রি অন্যকথায় এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময় সীমা অনুযায়ী দেরীতে মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে দ্রব্য সামগ্রী হস্থান্তরিত হবে। মালামাল ক্রয় করে মালিকানা লাভ করার পর বিক্রয় হচ্ছে শর্ত। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহক মালামালের দাম একসাথে কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারে। ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে যেসব দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যেতে পারে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে

- সার, বীজ, কীটনাশক সামগ্রী
- হাঁস-মুরগীর ছানা
- ভেড়া, বকরী ও দুধালো গাভী
- দেশজ কৃষি যন্ত্রপাতি
- ঔষধ ছিটানো যন্ত্র
- নৌকা ও মাছ ধরার জাল
- কুটির শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল।

iii. বাই সালাম/Price paid in Advance goods deferred আগাম ক্রয়
অগ্রিম ক্রয় বাকীতে বিক্রয়ের বিপরীত। এই পদ্ধতিতে গ্রাহক ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট

www.pathagar.com

দিনে (এমন কি নির্দিষ্ট স্থানে) নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী ব্যাংকের নিকট সরবরাহ করে, তবে ব্যাংক ঐ দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য চুক্তির শর্তানুযায়ী আগাম পরিশোধ করে। ব্যাংক ক্রীত দ্রব্য সামগ্রী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রি করে। যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরে ইহসান প্রতিষ্ঠা করা সেহেতু এ ধরণের দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যাতে কোন পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে নজর রাখা হয়। সরকার দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। ডঃ আনাস ঝারকা বলেছেন দ্রব্য সামগ্রী মালে ফানি (Fungible Goods) হতে হবে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে অগ্রীম ক্রয় পদ্ধতিটি অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগের সুযোগ বিদ্যমান। যেমন– কৃষি পণ্য উৎপাদন, মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগীর খামার, পশু-পালন এবং পল্লী শিল্পজাত দ্রব্যাদি। তবে বাই সালাম ও বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতি একই সঙ্গে নিপুনতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে ফলাফল শুভ হতে বাধ্য। পল্লী এলাকার দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় বীজ বপনের সময় বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে; আবার আগাম ক্রয়ের আওতায় তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করতে পারে। উভয় ব্যবস্থায় তারা গ্রাম্য মহাজনের শোষণ থেকে রেহাই পেতে পারে। তাছাড়া বাই সালাম পদ্ধতি শষ্য কাটার মওসুমে শস্যের অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাসের সমস্যা প্রতিরোধের জন্যও একটি কার্বকরী ব্যবস্থা হিসেবে গন্য হতে পারে।

iv. বাই ইসতিসনা Bai-Istisna

সানায়া থেকে ইসতিসনা শব্দ এসেছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পাদিত এমন চুক্তিকে ইসতিসনা বলা হয় যাতে ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত বস্তু বিক্রেতা কর্তৃক তৈরি করে দেয়ার অংগীকার থাকে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সংজ্ঞানুযায়ী ইসতিসনা হচ্ছে ক্রেতার সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন বা ফরমায়েশ অনুযায়ী বিক্রেতা নির্ধারিত একটি সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট মুল্যে দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করবে। আই ডি বি ১৯৯৬ সাল হতে এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান শুরু করে। বাই ইসতিসনার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের সম্মতি ক্রমে গ্রাহককে পণ্যের আংশিক বা পূর্ণ দাম অগ্রিম দেয়া যেতে পারে অথবা বাকিতে রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারিত হতে হবে এবং মূল্য পরিশোধ কখন, কিভাবে হবে তা নির্ধারিত হতে হবে। উদ্দিষ্ট দ্রব্য কখন, কোথায়, কার খরচে সরবরাহ করা হবে তার উল্লেখ থাকতে হবে। ইসলামে অর্ডার দিয়ে মাল তৈরি করিয়ে বা বানিয়ে নিয়ে পরে দাম দেয়া বৈধ।

৪. ইজারা বা ভাড়া পদ্ধতি

i. ইজারা Ijara (Leasing)

স্থায়ী প্রকৃতির সম্পদ ক্রয় বা তৈরি করে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে অন্যকে ব্যবহার করতে দেয়াই হচ্ছে ইজারা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে স্থায়ী সম্পদ কিনে ভাড়া দেয়া যায় এবং মেয়াদ শেষে ঐ সম্পদ ফেরত নেয়া যায়। ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে মাধ্যম ও

www.pathagar.com

দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ইজারা বা লিজিং একটি বিশেষ কৌশল। এতে ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক ইজারা দাতা (ব্যাংক) ইজারা গ্রহীতা (গ্রাহক) রূপ নেয়। ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিক থাকে এবং গ্রাহক চুক্তির শর্ত মুতাবেক নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হয়। ব্যাংক নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত ভাড়া থেকে তার মূলধনের খরচ মিটিয়েও মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। গ্রাম এলাকায় গুদাম ঘর, হিমায়িত গুদাম ঘর, সেচ যন্ত্র, ক্ষুদ্র যানবাহন ইত্যাদি এ পদ্ধতির আওতায় ভাড়া দেয়া যেতে পারে।

ii. ইজারা বিল বাই বা ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া Hire Purchase

ইজারা বিল বাই মালে গায়রে ফানি (Non Fungible Goods) এর অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক পুঁজি দ্বারা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে বা তৈরি করিয়ে তার মালিক হয়ে গ্রাহককে হস্তান্তর করা হয়। দাম সম্পূর্ণ না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাংক সম্পদের মালিক থাকে। অন্যকথায় ইজারা বিল বাই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রহীতা ব্যাংকের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করার পরই কেবল সম্পদের মালিক হয়, এর পূর্বে নয়। এ পদ্ধতিতে যতদিন ব্যাংকের সমুদয় টাকা আদায় না হবে ততদিন ব্যাংক সম্পদের মালিক বিধায় ভাড়া গ্রহণ করবে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদ, মেশিনারীজ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহকদেরকে ক্রয় করে দেয়া যায়, এতে তাদের আয় রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে।

iii. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (HPSM)

(মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হায়ার পারচেজ/ভাড়ায় ক্রয়)

আরবীতে ইজারা বিল বাই তাহতা শিরকাতুল শিলক । এটি শরীয়া সম্মত একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে তার মালিকানা অর্জন করেন। এ পদ্ধতিকে ক্রমহ্রাসমান মালিকানা পদ্ধতিও বলা যায়।

সম্পদের উপর মূলধনের অনুপাতে উভয়ের মালিকানা থাকে; কিন্তু গ্রাহক সম্পদ দখল ও ভোগ করে। গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া ও কিস্তি পরিশোধ করে ক্রমে সম্পদের উপর তার মালিকানা অংশ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পদের মালিকানা লাভ করে। ব্যাংকের মালিকানা হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে তার ভাড়ার পরিমান হ্রাস পেতে থাকে এবং মালিকানা শেষ হলে আর ভাড়া পায় না।

শর্তাবলী

১. মূলধন অনুপাতে অংশীদারগনের মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া যাতে পরবর্তীতে তাদের বা তাদের ওয়ারিসগনের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

২. ক্রেতাকে তার পরিশোধিত মূল্যের আনুপাতিক মালিকানা ব্যাংক কর্তৃক হস্তান্তর করা।

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য

১. গ্রাহক এ পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয় করার আগ্রহ ব্যক্ত করে ব্যাংকের নিকট আবেদন করেন এবং ব্যাংক প্রস্তাবটি মূল্যায়নের পর মঞ্জুরী প্রদান করে।

২. মঞ্জুরী প্রাপ্তির পর গ্রাহক তার ইকুইটি ব্যাংকে জমা করেন এবং ব্যাংক তার অংশের টাকা যোগ করে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করে।

৩. পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে এর প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়সীমা ও কিস্তির পরিমাণ এবং জামানতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৪. ব্যাংক তার নিজের অংশ গ্রাহকের কাছে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তানুসারে নির্ধারিত কিস্তিতে পরিশোধ করেন।

৫. গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করার ফলে ব্যাংকের অংশীদারিত্ব ক্রমশ কমতে থাকে এবং গ্রাহকের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পায়।

৬. মালিকানার অনুপাত গ্রাহকের অনুকূলে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ব্যাংকের প্রাপ্য ভাড়ার পরিমানও আনুপাতিক হারে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

৭. ব্যাংকের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও ব্যাংকের অংশের পুরো টাকা শোধ করে মালের পূর্ন মালিকানা পেতে পারেন।

৮. গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংকের মালিকানার অনুপাত অনুযায়ী ভাড়া অব্যাহত থাকে।

৯. চুক্তির শর্তানুসারে গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ব্যাংক পণ্য বা মাল নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে।

১০. নির্ধারিত ভাড়া সহ ব্যাংকের মালিকানা সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত মাল বা পণ্যের মালিকানা ব্যাংকের থাকে। সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হলে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট মালিকানা হস্তান্তর করে।

১১. ব্যাংক ভাড়া হিসাবে যা পায় তাই তার আয়; ভাড়ার টাকা মালিকানায় অংশের সাথে যুক্ত হয়না।

৬. ঋণ প্রদান পদ্ধতি

i. কর্জ

ঋণের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে কর্জ। কর্জ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঋণ, loan বা credit বা advances কিন্তু সকল জাতের পন্যের বেলায় কর্জ হয় না। কর্জ হয় কেবল মালে ফানি (fungible goods) এর বেলায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কর্জ বা ঋণ হচ্ছে fungible goods সমপরিমাণ ফেরতের শর্তে কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া। কোন ফানজিবল পণ্য কোন নির্ধারিত বা অনির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুরূপ পন্য সমপরিমাণ ফেরত দেয়ার শর্তে বিনিময় বা প্রতিদান ছাড়া কাউকে ব্যবহার করতে দেয়াই হচ্ছে কর্জ বা ঋণ।

www.pathagar.com

কর্জের শর্তাবলী বা বৈশিষ্ট্য

১. ফানজিবল পণ্য হওয়া।
২. ঋণ গ্রহীতাকে পণ্যটি ব্যবহার করতে দেয়া।
৩. অনুরূপ পরিমাই পণ্য ফেরতের শর্ত থাকা।
৪. ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের কোন প্রকার ঝুঁকি বহন না করা।
৫. ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে প্রদত্ত ঋণের জন্য কোন প্রকার উপকার, বিনিময় বা প্রতিদান আশা না করা।
৬. সময় বা অবকাশ থাকা।

লাভমুক্ত ঋণ বা কর্জ প্রকৃতপক্ষে একটি হিতকর ঋণ ব্যবস্থা যা অসহায় সম্পদহীন ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়। সংজ্ঞা অনুসারে এই ঋণের সাথে লাভ যোগ করা হয় না। তবে ঋণ গ্রহীতাকে সেবা (সার্ভিস চার্জ) বহন করতে হতে পারে। এই সেবা খরচের প্রকৃতি একটু ভিন্ন ধরণের। এ ধরনের লেনদেনের জন্য ব্যয়কৃত প্রকৃত সেবা খরচের হিসেবে ধরা হয়। ঋণ গ্রহণের পূর্বেই ঋণ গ্রহিতাকে এই খরচের কথা বলে দেয়া হয়।

ii. আল আরিয়্যা

আরিয়্যার আভধানিক অর্থ হচ্ছে ধার, ইংরেজিতে Borrowing বা loan. কিন্তু কর্জ বা ঋণের সাথে এর স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কর্জ হয় মালে ফানি বা ফানজিবল পণ্যের ক্ষেত্রে, আর আরিয়্যা হয় মালে গাইরে ফানি বা নন ফানজিবল পণ্যের বেলায়। মালে গাইরে ফানি হচ্ছে গাড়ী, বাড়ি, মেশিনারীজ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। নন ফানজিবল পন্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

১. একাধিকবার ব্যবহার করলেও বস্তুর অস্তিত্ব থাকে।
২. এগুলোর সেবা প্রবাহ (flow of service) থাকে।
৩. মূল বস্তু থেকে এর সেবা বা সার্ভিস আলাদা করা যায় না।

আরিয়্যা হচ্ছে মূল্য বা বিনিময় ছাড়া মালে গাইরে ফানি বা নন ফানজিবল পণ্য ব্যবহার বা কাজ নেয়ার পর ফেরত দেয়ার শর্তে কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া। মালটি ব্যবহার করে এ থেকে উপকার নেয়ার জন্য তাকে কোন মূল্য বা বিনিময় দিতে হয় না। অবশ্য আরিয়্যা মালের যথাযথ হেফাজত করা তার দায়িত্ব।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে উপরে বর্ণিত পন্থাসমূহের সবগুলো এখনো বাংলাদেশে প্রচলিত হয়নি। ইসলামী ব্যাংক বাংলদেশ লিমিটেড পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং আরো কয়েকটি কল্যাণমূখী বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহ সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, মিরপুর সিল্ক উইভার্স ইনভেস্টমেন্ট স্কীমের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত বিনিয়োগ কর্মকৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে। আমওয়াব এবং বেশ কয়েকটি ইসলামী এনজিও যেমন মুসলিম এইড (ইউকে) বাংলাদেশ, দারুল খিদমাহ ওয়াল ফালাহ বাংলাদেশ, ইসলামিক এইড, বাংলাদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমে উপরে বর্ণিত ম্যাকানিজম সমূহের কোন কোনটি অনুসরণ করছে।

www.pathagar.com

আমাদের করণীয় বিষয়ে কতিপয় প্রস্তাব

দারিদ্র্য দূরীকরণে সফলতার লক্ষ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের কবল হতে এদেশবাসীকে রক্ষার জন্য আরও কতিপয় প্রস্তাব নিম্নরূপ:

১. ব্যাপক গণসচেতনা সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে সুদ ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করার পরিবর্তে পরনির্ভরশীল করে রাখা হচ্ছে সে বিষয়টি জনসমক্ষে পরিস্কার করে তুলে ধরতে হবে।

২. বাণিজ্যিক লক্ষ্য ও সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের মুখোষ উন্মোচনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩. দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সংগৃহীত অর্থ কোনভাবেই বিল্ডিং, পাকা ইমারত প্রভৃতি নির্মাণে ব্যয় করা যাবে না। এ ধরনের সম্পদ এক বিশেষ গোষ্ঠীর মালিকানায় চলে যাবার আশংকা রয়েছে।

৪. ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থে গড়ে উঠা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তির মালিকানা বা বেনামী মালিকানায় থাকবে না বরং অবিলম্বে এসব শিল্পও ব্যবসায়ে নিয়োজিত কর্মীদেরকে যৌথ মালিক বানাতে হবে। এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

৫. দারিদ্র্য দূরীকরণে দেয় ক্ষুদ্র ঋণের ইসলামী বিকল্পের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করতে হবে।

৬. ঢাকায় আন্তর্জাতিক মানের একটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ও দারিদ্র্য দূরীকরণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে এবং দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্দেশনা প্রদান করবে।

৭. ইসলামী নীতিমালায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইসলামী গ্রামীণ ব্যাংক চালু করা যেতে পারে।

৮. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। ■

তথ্যসূত্র

১. দৈনিক ভোরের ডাক, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪

২. দৈনিক আমার দেশ, ১৭ জানুয়ারী ২০০৪

৩. দৈনিক সংগ্রাম, ৯ মার্চ ২০০৫ পৃ ১৩

৪. দৈনিক আজকের কাগজ, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৪

৫. দারিদ্র্যের উপর প্রথম বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা শুরুর কৃতিত্ব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বুথ এবং রাওনট্রির। ১৮৮০-এর দশকে বুথ পরিচালিত পূর্ব লন্ডনের সমীক্ষা সম্ভবত দারিদ্র্য পরিমাপের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। দেখুন বুথ ১৮৮৯-১৯০২, রওনট্রি ১৯০১।

৬. এ প্রসংগে উল্লেখ্য, কিভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা সম্ভব, এর অনেক কিছুই এখনো জানতে বাকী রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য- কারা দরিদ্র এবং কোথায় তাদের অবস্থান, তারা কি ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়, তাদের সংখ্যা এবং অবস্থার পরিবর্তন এই সকল বিষয়ে তথ্য, এমনকি পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ দেশেও অনেকটাই সীমিত। তথ্যের সীমাবদ্ধতা এবং দারিদ্র্য ও উন্নয়নের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের জটিলতা, এই উভয় কারণেই দারিদ্র্যের উপর সংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং কর্মসূচীর প্রভাবের আংশিক মূল্যায়ন করাও একটা দুরূহ ব্যাপার (বিশ্ব ব্যাংক ১৯৮৮)।

৭. J.L. Hanson, A Dictionary of Economics and Commerce P. 308.

www.pathagar.com

৮. Charles Booth, Labour and life of the people in London (1902)
৯. Seebohm Rowntree, 'Poverty and Progress' London (1941)
১০. S.M. Miller & Pamela Roby, Poverty Changing Social Stratification 1969.
১১ PD Ojha, Configuration of Indian Society, RDI Bulletin, 24(I) P.1-12
১২. VM Dandekar & N.Path, Poverty in India, EPW, Jan 2 & 9 Issues .
১৩. Montek Ahluwali, Rural Poverty and Agricultural Performance in Indiap, Journal of Development Studies.
১৪. Desai, Rural Development for Rural Poor, Dharmpur Project Report, IIMA Ahmadabad. India.
১৫. Rose Michael, The Relief of Poverty, Macmillan, London
১৬. অনেকের অভিমত হচ্ছে মৌলিক চাহিদার কার্যকর ধারণা বহুমাত্রিক হওয়া প্রয়োজন। শুধু মাত্র ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বঞ্চনার বিভিন্ন দিক এতে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে এর বিপরীত মত হচ্ছে, যদিও দারিদ্র্য একটি বহু মাত্রিক বিষয় তথাপি আয় এবং ভোগ বঞ্চনার অন্যান্য উপাদানের সাথে পর্যাপ্তভাবে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য শুধু মাত্র এই দুই নিয়ামকের উপর দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। অবশ্য যেখানে উভয় নিয়ামকের তথ্য বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে ব্যয়ের উপর অগ্রাধিকার প্রযোজ্য কারণ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী স্থিতিশীল।
১৭. Sen, A.K. (1981) : Poverty and Famines, Clarendon Press, Oxford.
১৮. Robert Chambers, Poverty in India, concepts, Research and Reality, Discussion paper 241, IDS Sussex.
১৯. সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৩ আয়াত।
২০. ইমাম শাতিবী, Al Muwafaqat fi Usul al Shariah vol 2, p.177
২১. আল গাজ্জালী, Al-Mustasfa (১৯৩৭) Vol-১, পৃ. ১৩৯-৪০
২২. সুরা আল বাকারা ঃ ১৫৫ নং আয়াত।
২৩. আবু দাউদ।
২৪. সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩১ নং আয়াত।
২৫. বায়হাকী।
২৬. সফিকুল হক চৌধুরী, ক্ষুদ্র ঋনের সুদের হার কতো হওয়া চাই (প্রবন্ধ)।
২৭. মাইক্রোক্রেডিট সামিট ক্যামপেইন ২০০২ প্রদত্ত সংগা, উদ্ধৃত বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ণর ডঃ সালেহ উদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ Micro Credit and Poverty: New Realities and issues, জার্নাল অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ, ভলিউম ৫ নং ১, ২০০৩ পৃ ১.
২৮. জোয়ানা লেজ্জারউড, মাইক্রো ফাইনান্স হ্যান্ডবুক, বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশিত পৃ ১।
২৯. খবরের কাগজ ১২ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ এনজিও এক কাবুলীওয়ালা পৃ.৩৪।
৩০. সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ৪ মে ১৯৯৪।
৩১. দৈনিক সংগ্রাম, ২৮-০২-২০০৪ সংখ্যা সম্পাদকীয় দৃষ্টব্য।
৩২. অধ্যাপক ডঃ এম. এ হামিদ, মানব কল্যাণ ও ইসলামী অর্থনীতি, দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃ. ৫।
৩৩. লুৎফর রহমান সরকার, আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (বর্তমান দি অরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড) এবং মাসিক আল ফুরকানের যৌথ উদ্যোগে গত ২৪শে জানুয়ারী ১৯৯৭ জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে লিখিত ভাষণ,পৃ-১।
৩৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মানব কল্যাণ, ছাত্র সংবাদ, সদস্য সম্মেলন সংখ্যা ১৯৯৬, পৃ.১৯।

লেখক-পরিচিতি : লেখকের 'বিশ্বায়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ' প্রবন্ধের লেখক-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২৫শে জুলাই, ২০০৫ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

সন্ত্রাসবাদ
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

■

১. শুরুর কথা

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ" (সূরা আল আহযাব, আয়াত ঃ ২১)। উত্তম জীবনাদর্শ অন্বেষণকারী প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহপাক এই বাণী নাযিল করেছেন। আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশের মাইকেল এইচ হার্ট যখন তাঁর দি হানড্রেড বইতে মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে একথা বলেন যে, "He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels ঃ তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইতিহাসে ধর্মীয় ও জাগতিক, উভয় ক্ষেত্রেই সবেচেয়ে বেশী সফল" তখন কুরআনের ঐ কথারই একটা প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায়।

মাইকেল হার্ট আরো বলেন, 'বিশ্বের মহান ধর্ম ইসলামের প্রবর্তক ও প্রচারক মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন সবচেয়ে বেশী সফল রাজনৈতিক নেতা।'

নবী (সা) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল পুরোপুরি একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। নবী (সা) সন্ত্রাসের মাধ্যমে তথা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে, জোর জবরদস্তিমূলকভাবে আবু জাহল প্রমুখ অন্ধভাবে বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে নিজের অনুসারী লেলিয়ে, গুপ্ত খুন করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি। নির্যাতন, অত্যাচার, গালি-গালাজ, বয়কট, হত্যা এসব কিছুর প্রতিবিধানে তিনি প্রতিশোধমূলক সন্ত্রাসী কোন পদক্ষেপ নেননি।

২. সন্ত্রাসবাদ কি ?

যেহেতু ইসলামে নিরপরাধ মানুষ হত্যার এবং আত্মহত্যার কোন অনুমোদন নেই, তাই ইসলামে সন্ত্রাসের কোন অবকাশ নেই। অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করাকে, সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার সমতুল্য ঘোষণা করেছেন আল্লাহপাক। (সূরা আল মায়িদা, আয়াত ঃ ৩২) অন্যদিকে আত্মহত্যাকারীর জন্য ঘোষণা করা আছে নিশ্চিত জাহান্নামের।

www.pathagar.com

বোমার মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনভাবে হোক না কেন, আত্মহত্যাকারী পার্থিব জীবনে আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা এড়িয়ে যেতে চায়, তাকদীরে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর উপর তার পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুল থাকে না (সহীহ আল-বুখারী, হাদীস ঃ ৩৮৮২)। কুরআনে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের আল্লাহপাক যেভাবে চিহ্নিত করেছেন তাতে সন্ত্রাসীদের চেনা খুবই সহজ হয়েছে।

আল্লাহপাক বলেন, "মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী। কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না। তারা বলে আমরাইতো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু এরা বুঝতে পারে না। (সূরা আল বাকারা,আয়াত ঃ ৮, ১১, ১২)।"

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরা সন্ত্রাসকে একটি মতবাদ বা ইজম হিসাবে চিহ্নিত করে এর নামকরণ করেছেন সন্ত্রাসবাদ বা Terrorism । সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের মতামত এরকম ঃ

"Terrorism is not just brutal or unthinking violence. Experts agree that there is almost always a strategy behind terrorist actions. Whether it takes the form of bombings, shootings, hijackings or assassinations, terrorism is neither random, spontaneous, nor blind, it is a deliberate use of violence against civilians for political or religious ends.

সন্ত্রাসবাদ, অপরিকল্পিত কোন সহিংস ঘটনার নাম নয়। বরং বিশেষজ্ঞদের মতে প্রত্যেক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে একটি অপ-কুশলী উদ্দেশ্য। বোমা ফাটানো, গুলিবর্ষণ, ছিনতাই বা গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাসের ধরণ যাই হোক না কেন সন্ত্রাসী কার্যক্রম হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা বিচার বিবেচনাহীনভাবে বা উদ্দেশ্যহীন এলোপাতাড়িভাবে পরিচালিত কোন কার্যক্রম নয়। বরং সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সাধারণ নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত সহিংসতা ।"

এ বিষয়ে আমেরিকার ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের মূল্যায়ন হচ্ছে–

'Terrorism is premeditated (পূর্বপরিকল্পিত) politically motivated violence, perpetrated (অন্যায় আক্রমন) against noncombatant (বেসামরিক) targets by subnational groups or clandestine (গুপ্ত) agents, usually intended to influence an audience.'

সি আই এ -এর প্রাক্তন ডেপুটি চীফ, পল পিলারের মতে সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে–

1. It is premeditated- planned in advance, rather than an impulsive act of rage.
2. It's political- not criminal, like the violence that groups such as the mafia use to get money, but designed to change the existing political order.
3. It is aimed at civilians- not at military targets or combat ready troops.

www.pathagar.com

4. It is carried out by subnational groups- not by the army of a country.

সন্ত্রাসবাদকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরা বার বার বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে সন্ত্রাসবাদকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে সন্ত্রাসবাদের পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের কথাও অনিবার্যভাবে বলতে হবে ।

৩. Terrorism বা সন্ত্রাসবাদ শব্দের জন্ম

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পর, ১৭৯৩-৯৪ সালে ফ্রান্সে Terror নামে এক বিপ্লবী গ্রুপের শাসনকালে শব্দটির জন্ম। টেরর গ্রুপের নেতৃবৃন্দ প্রশংসিত হয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্য হতে বিশ্বাসঘাতকদের নির্মূল করার পদক্ষেপের জন্য, যাতে করে স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখা যায় । কিন্তু বিপ্লবের কিছুদিন পরই টেররদের ঐসব কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হিসাবে বা গিলোটিনের শিকারে পরিণত করার কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচিত হতে লাগল এবং এদের কার্যক্রম Terrorism নামে অভিহিত হতে লাগল। জন্মের উৎস সম্পর্কে উক্ত বর্ণনা হতে দেখা যাচ্ছে, Terrorism শব্দের উৎস ইসলামে নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভেতরেই রয়েছে।

৪. বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিছু সন্ত্রাসী ঘটনা

খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফিলিস্তিনে রোমান ও তাদের সমর্থকদের প্রকাশ্য জনসমক্ষে জবাই করে ইহুদীরাই হত্যা করে । মানুষকে এভাবে জবাই করে হত্যা করা যায় এ বিষয়ে ইহুদীরাই প্রথম পথ প্রদর্শক প্রতীয়মান হয়। ১৯১৪ সালে এক সার্ব চরমপন্থী কর্তৃক অষ্ট্রিয়ান আর্কডিউক ফার্ডিন্যান্ডকে হত্যা করে, যার ফলশ্রুতিতে শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৮৯ সালে ২৭০ জন যাত্রীসহ লকারবির আকাশে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে, যা সি আই এ কর্তৃক ঘটানো হয়েছিল। তবে এই কাজে তারা লিবিয়ার সন্ত্রাসী গ্রুপকে ব্যবহার করেছে। ১৯৯৪ সালে এক ইসরাইলী চরমপন্থী কর্তৃক হেবরন মসজিদের মুসলমানদের উপর মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করে নামাযীদের হত্যা করা। ১৯৯৫ সালে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনকে ইহুদী সন্ত্রাসী গুলি করে হত্যা করে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সংঘটিত বিমান হামলা ও শত শত নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি এবং সাম্প্রতিক ২০০৫ সালের ৭ই জুলাই লন্ডনে বোমা হামলার ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশ্বের অধিকাংশ সন্ত্রাসী ঘটনার পেছনে রয়েছে পাশ্চাত্যের কুশলী হাত।

৫. সন্ত্রাসবাদের প্রকারভেদ

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনায় সন্ত্রাসবাদকে নিম্নলিখিতভাবে বিভাজন করেছেন ঃ

৫.১. Nationalist ঃ জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস

৫.২. Religious ঃ ধর্মীয় সন্ত্রাস

৫.৩. State sponsored ঃ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

www.pathagar.com

৫.৪. Left wing : বামপন্থী সন্ত্রাস
৫.৫. Right wing : ডানপন্থী সন্ত্রাস
৫.৬. Anarchist : নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাস
৫.৭. Narcoterrorism : মাদক সন্ত্রাস
৫.৮. Cyber terrorism : কম্পিউটার তথ্য সন্ত্রাস।

জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস : Nationalist কার্যক্রমকে Terrorism হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও পাশ্চাত্য Terrorism বিশেষজ্ঞদের মতামতে একথাও প্রতিফলিত হয়েছে যে- Nationalist terrorism can be difficult to define, since many groups accused of the practice insist that they are not terrorists but freedom fighters.

ধর্মীয় সন্ত্রাস : ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীরা মূলত তাদের ভাষ্য অনুযায়ী স্বর্গীয় নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহিংসতার আশ্রয় নেয় বলে উল্লেখ করে থাকে। দ্রুত পট পরিবর্তনের আশায় এরা বড় ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে বলে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত । বড় বড় ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্প্রদায়গুলো থেকে যেমন সন্ত্রাসী গ্রুপের জন্ম হয়েছে, তেমনি ছোট ছোট ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকেও সন্ত্রাসীর সৃষ্টি হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মদদপ্রাপ্ত সন্ত্রাস : মূলত সরকার যখন কোন উগ্র নীতি অবলম্বন করে তখনই রাষ্ট্রীয় মদদে সন্ত্রাসের সূচনা হতে পারে। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোন রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করার চাইতে উগ্রনীতির বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে চলেছে এবং পেশী শক্তির মহড়া ও প্রয়োগে পৃথিবীতে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করছে কোন্ রাষ্ট্রসমূহ তা চিহ্নিত করলেই রাষ্ট্রীয় মদদপ্রাপ্ত সন্ত্রাস কি, তা অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

বামপন্থী বা শ্রেণী চেতনার সন্ত্রাস : বস্তুত একতরফাভাবে শ্রেণী শত্রু চিহ্নিত করে তাকে হত্যা করার আদর্শ হতে এ সন্ত্রাসের জন্ম।

ডানপন্থী সন্ত্রাস : সম্পদ অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন লালসার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট উগ্র মানসিকতা থেকে এই সন্ত্রাসের সৃষ্টি। অন্যের অধিকার হরণ ও আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে হত্যা, নির্যাতন এই সন্ত্রাসের দৃষ্টান্ত।

নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাস : হতাশাগ্রস্ত মানুষ দুটো কাজ করে : (১) আত্মহনন এবং (২) লক্ষ্যহীন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। উভয়টিই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। প্রকৃতপক্ষে যার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই।

মাদক সন্ত্রাস : DEA বা ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন- এর মতে, মাদক সন্ত্রাস বলতে সেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে বুঝায় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবৈধ মাদক চাষ, উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে কখনো কখনো মাদক ব্যবসা হতে অবৈধ মুনাফা লুটে নেয়ার পাশাপাশি মাদক সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রকরা দেশের রাজনৈতিক এজেন্ডাও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বিশেষত কলাম্বিয়ায়। প্রসংগত আরো একটি বিষয়

www.pathagar.com

লক্ষ্যণীয় তাহলো, অন্যান্য সন্ত্রাসী গ্রুপকেও মাদক সন্ত্রাসী কর্তৃক সার্বিক সহযোগিতা করতে দেখা যায় তাদের অস্ত্র, অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়, প্রশিক্ষণ দেয়া, ট্রান্সপোর্টেশন, নিরাপদ আবাস তৈরি, জাল পাসপোর্ট তৈরি, নিয়মিত কর্মচারীদের বেতন প্রদান ইত্যাদি কারণে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শুধু ২০০০ সালে আমেরিকানরা ৬৩০ কোটি ডলার বা ৩৭,৮০০ কোটি টাকা অবৈধ মাদকের পেছনে ব্যয় করেছে।

সাইবার টেরোরিজম বা কম্পিউটার তথ্য সন্ত্রাস ঃ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং কম্পিউটার তথ্য প্রবাহে ব্যাপক নৈরাজ্য তৈরি করাই সাইবার টেরোরিজম বা কম্পিউটার তথ্য সন্ত্রাস। সাধারণত বড় ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আগে কম্পিউটার তথ্য সন্ত্রাসের সহায়তা নেয়া হয়।

৬. সন্ত্রাস কেন ?

Prevention is better than cure- রোগ সারানোর চেয়ে রোগের প্রতিরোধই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সন্ত্রাসের বিভিন্ন ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরা সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন । কিন্তু সন্ত্রাস সমাজে কেন ছড়ায়? পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে কোন গবেষণা লব্ধ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এ বিষয়ে মানব জাতিকে এক অমোঘ দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) সূত্রে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে সমাজে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না।"

(মুসনাদে আহমদ)

অর্থাৎ সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে ঘুষকে নির্মূল করতে হবে।

৭. ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

ইসলামে অন্যায়ভাবে কোন মানুষ হত্যার লাইসেন্স যেমন নেই, তেমনি আত্মঘাতি বোমা হামলারও কোন অনুমতি নেই। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদ, ইতিবাচক সমাজ প্রতিষ্ঠার কোন বুনিয়াদ নয় বিধায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলামের কোন ভিত্তি নয়।

এ বিষয়ে নবী (সা)-এর নীতিমালা ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইসলামী ব্যক্তি গঠন ও গণভিত্তি রচনার প্রয়াস চালাতে গিয়ে মক্কায় অবস্থানকালের তেরোটি বছর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন।

মুশরিকদের হামলায় হারিছ ইবনু আবী হালাহ (রা), সুমাইয়া (রা), ইয়াসির (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসির (রা) শাহাদাত বরণ করেন। অনেকেই আহত হন। কিন্তু বৈধ অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা এই যুল্মের প্রতিকারের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করেননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিলো 'কুফ্ফু আইদিয়াকুম'

www.pathagar.com

(তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ) অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহার করো না । (ওহী গায়র মাতলু)
পরবর্তীকালে সূরা আন্ নিসার ৭৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই বিষয়টি উল্লেখ করেন। আল্লাহপাক বলেন, "তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ করো, সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো, তখন তাদের একদল, মানুষকে ভয় করছিল আল্লাহকে ভয় করার মতো অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং বলতে লাগল 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? আমাদেরকে কিছুদিনের অবকাশ দাও না? বলো, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্য পরকালই উত্তম।" (সূরা আন নিসা, আয়াত ঃ ৭৭)
আল্লাহপাক আরো বলেন, "ভাল ও মন্দ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা। তাহলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এই গুণের অধিকারী হয় যারা পরম ধৈর্যশীল ও পরম সৌভাগ্যবান।"
(সূরা হামীম আস সাজদা, আয়াত ঃ ৩৪-৩৫)
ইসলাম-বৈরী শক্তি, হামলার পর হামলা চালাতে থাকে। আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন সূরা নাযিল করে মুমিনদেরকে বার বার ছবর অবলম্বন করার তাকিদ দিতে থাকেন। এমনকি দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় ইয়াসরিববাসীদের অন্যতম লড়াকু ব্যক্তি আল আব্বাস ইবনু উবাদাহ ইবনু নাদলা (রা) যখন নবীজীকে (সা) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্য জীবন- বিধানসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি চাইলে আমরা আগামীকালই মিনায় অবস্থানকারীদের ওপর হামলা চালাবো।" মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আমাকে এইরূপ কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তোমরা নিজ নিজ কাফিলায় ফিরে যাও।"
(সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-১২০)
মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহপাক নবীকে (সা) রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেন।
আল্লাহপাক প্রেরিত জীবন-বিধানকে বিজয়ী করার জন্য নবী (সা)-এর অনুসৃত উক্ত নীতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত করার কারণ দু'টি ঃ
প্রথমত ঃ মুসলিম নামধারী সেইসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী নেতিবাচক কর্মকাণ্ড, যাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন, "মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী। কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা। তারা বলে আমরাইতো শান্তি স্থাপনকারী। সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু এরা বুঝতে পারে না। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ঃ ৮, ১১ ও ১২)
দ্বিতীয়ত ঃ ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের দৃঢ় বদ্ধমূল ও গোঁড়ামীপ্রসূত বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ শুধু যে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক, তা নয় । বরং সেই সাথে বিদ্বেষের একটি তীব্র প্রবণতাও

www.pathagar.com

আছে। ইউরোপ বা পাশ্চাত্যবিশ্ব বৌদ্ধ ধর্মমত বা হিন্দু দর্শনকে যদি মেনে নিতে নাও পারে, তবুও এ সকল জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কে সে ভারসাম্যযুক্ত চিন্তামূলক মনোভাব বজায় রেখে চলে। কিন্তু যখনই ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে, তখন পাশ্চাত্যের সকল ভারসাম্য হারিয়ে যায় এবং তীব্র বিদ্বেষ প্রবণতা দেখা দেয়। অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ব্যতীত সকল ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদই ইসলাম সম্পর্কিত রচনায় ও মন্তব্যে অবৈজ্ঞানিক পক্ষপাত-দোষের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের বিদ্বেষ-প্রবণতা তাদেরকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, ইসলামকে যেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু বলেও ধরা যায় না; বরং তাকে ধরে নেয়া হয় বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান আসামী হিসাবে, অর্থাৎ তারা খোলা মন নিয়ে কখনো ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করেন না বা ঘটনার সত্যতা বা বাস্তব অবস্থা যাচাই করতে চান না বরং পূর্ব নির্ধারিত বিদ্বেষমূলক সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রত্যেকটি বিষয়ের বিচার করতে শুরু করেন। অপর পক্ষের অর্থাৎ মুসলমানদের নিজের প্রকাশিত মতের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করে অবৈজ্ঞানিক ঈর্ষাপরায়ণতার মনোভাব নিয়ে তাদের জবানবন্দী 'বিশ্লেষণ' বা ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এতে করে পশ্চিমাদেশে ইসলাম ও যে কোন ইসলামী বিষয়ের বিচিত্ররূপে বিকৃত চিত্র উপস্থাপন হচ্ছে।

এই বিকৃতি কোনো বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ নয়– ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে, রাশিয়া ও ফ্রান্সে, ইতালী ও হল্যান্ডে, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়। সংক্ষেপে বলতে হয় যে, যেখানেই ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা ইসলামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে সেখানেই ঐ একই অবস্থা দেখা যায়। যখনই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনার বাস্তব অথবা কল্পিত সুযোগ পাওয়া যায়, তখনই তারা এক বিদ্বেষের আনন্দে মত্ত হয়ে ওঠেন। সার্বিকভাবে পাশ্চাত্য মনন যে কোন কারণেই হোক, ধর্ম ও সংস্কৃতি হিসাবে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। এর অন্যতম কারণ হতে পারে সেই অবজ্ঞা মিশ্রিত প্রাচীন মতবাদ যা সারা দুনিয়াকে 'ইউরোপীয়' ও 'বর্বর' এই দুইভাগে বিভক্ত করে দেখে। গ্রীক ও রোমানরা কেবল নিজেদেরকেই 'সুসভ্য' মনে করত, তাই তারা যা কিছু বিদেশী, বিশেষ করে যা কিছু ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট তার উপর 'বর্বর' মার্কা লাগিয়ে দিয়েছিলো। তখন থেকেই অবজ্ঞা মিশ্রিত এই মতবাদ পাশ্চাত্যের বাসিন্দাদের মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাস তৈরি করেছে যে, পাশ্চাত্যের বাইরে মানবজাতির অবশিষ্টাংশ থেকে তাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব একটি সঠিক সত্য। ফলে ইউরোপীয় ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ ও জাতির প্রতি তাদের বিঘোষিত অবজ্ঞা পশ্চিমী সভ্যতার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। (সংঘাতের মুখে ইসলাম -মুহাম্মদ আসাদ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৪-৩৫)

বর্তমানে পাশ্চাত্য মিডিয়াসমূহ সন্ত্রাসবাদের সাথে যেভাবে ইসলামকে এক করে ফেলেছে তার পেছনে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব, শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার ও নামধারী মুসলমানদের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডই মূলত দায়ী।

www.pathagar.com

৮. সন্ত্রাসের কালো হাত

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে, নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সংঘটিত বিমান হামলা এবং সম্প্রতি ৭ই জুলাই, ২০০৫ তারিখে লন্ডনের পাতাল রেলে ও শহরের বিভিন্ন সড়কে কয়েকটি বাসে বোমা হামলা সবচেয়ে বেশী আলোচিত সন্ত্রাসী নৃশংসতা। এইসাথে অতি সাম্প্রতিক গত ১৭ই আগস্ট, ২০০৫ তারিখে গোটা বাংলাদেশে একসাথে একইসময়ে শত শত বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা বিশ্বে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরল দৃষ্টান্ত।

জনশ্রুতি আছে যে, নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলার সময় ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক আসার কথা ছিল। কিন্তু কোন এক মহল থেকে তাকে না আসার জন্য আগাম হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় এবং তিনি আসেননি। ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটেছে লন্ডনে অবস্থানরত ইসরাইলী সাবেক প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর ক্ষেত্রেও। ৭ই জুলাই, ২০০৫ তারিখে লন্ডনে বোমা হামলার কয়েক ঘন্টা আগে এক ব্যক্তি টেলিফোনে নেতানিয়াহুকে লন্ডনে তার হোটেল কামরা থেকে বের না হওয়ার উপদেশ দেয়। নেতানিয়াহু তখন লন্ডনে একটি অর্থনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য হোটেলে অবস্থান করছিলেন। সে সম্মেলনটি ওই দিনই একই হোটেলের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ইসরাইলী মন্ত্রী তার হোটেলের কামরা থেকে মোটেও বের হননি এবং যে সম্মেলনের জন্য লন্ডনে আসা সে সম্মেলনেও যোগদান করেননি।

দু'টো ঘটনারই পেছনে কোন্ কালো হাত আছে এখনও পর্যন্ত আমেরিকা ও বৃটেন সরকারীভাবে তা উদঘাটন করতে পারেনি। যদিও দুই ঘটনার সাথে দুই ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর সূত্র ধরে ঘটনার রহস্যের কিনারা করা খুব কঠিন কোন কাজ বলে মনে হয় না বিশ্বের ক্ষমতাধর ঐ দুই দেশের জন্য ।

যেখানে ইহুদীরা আমেরিকা ও বৃটেন উভয় দেশের সরকার গঠন ও তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে, সেখানে উভয় দেশের সরকার যে ইহুদী লবির কাছে বাঁধা আছে, এটা সহজেই বোধগম্য । আর তাই ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে, নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সংঘটিত বিমান হামলা এবং ৭ই জুলাই, ২০০৫ তারিখে লন্ডনের পাতাল রেলে ও শহরের বিভিন্ন সড়কে কয়েকটি বাসে বোমা হামলার রহস্যের কিনারাও যেমন হচ্ছে না তেমনি পাশ্চাত্যের চির বিদ্বেষী ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তথাকথিত সন্ত্রাসের অজুহাতে বিদ্বেষ চরিতার্থও করা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত ঃ আবারও উল্লেখ করতে চাই যে, ইহুদীরা খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিশ্বে প্রথম সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দিয়েছিল ফিলিস্তিনের বুকে প্রকাশ্য দিবালোকে রোমানদের জবাই করে হত্যা করার মাধ্যমে (ইন্টারনেট)। তাই বিশ্বের বড় বড় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নৃশংসতার পেছনে কোন্ কালো হাত সক্রিয় তা বুঝতে সমঝদার ব্যক্তির অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

www.pathagar.com

৯. সন্ত্রাসের প্রতিকার

সন্ত্রাসরূপী এই দানবের বিপক্ষে আমরা শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসী কি খুব অসহায়? মোটেই তা নয়। সন্ত্রাসের প্রতিকারে শুধু প্রয়োজন চারটি শর্তের পূরণ ঃ

এক. ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নে রাসূল (সা) কর্তৃক অনুসৃত নীতির সঠিক মর্মের ব্যাপক প্রচার।

দুই. সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য সৃষ্টি।

তিন. সন্ত্রাস নির্মূলে নির্বাচিত সরকারের আন্তরিক ও অনমনীয় অবস্থান।

চার. ঘুষ কালচার নির্মূলের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০.শেষ কথা

সন্ত্রাস জগতকে আন্তর্জাতিকভাবেই Under-World নামে অভিহিত করা হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন বর্হিভূত জগতই Under-World। তাই সন্ত্রাসের জন্য আছে ঘৃণা, ভালবাসা নয়। ইসলামী সমাজ গঠনে প্রয়োজন মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা, ঘৃণা নয়। সন্ত্রাসী হচ্ছে সমাজের আগাছা, মহীরূহ নয়। যারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে মানুষের ঘৃণা কুড়াচ্ছে তারা নির্বোধ। সন্ত্রাস প্রতিরোধে এসব আগাছাকে নির্বীর্য করা এখন সময়ের দাবী। ■

তথ্যসূত্র

১.ইন্টারনেট

২. সংঘাতের মুখে ইসলাম ॥ মুহাম্মদ আসাদ ।

৩. ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি ॥ এ.কে.এম. নাজির আহমদ ।

লেখক পরিচিতি : লেখকের 'আমরা কলম সৈনিক' প্রবন্ধের লেখক-পরিচিতি দ্রষ্টব্য।

লেখা-পরিচিতি : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০৫, সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসাবে পঠিত।

www.pathagar.com

লেখক-সম্মেলন ও সেমিনার-প্রতিবেদন

মোশাররফ হোসেন খান

■

লেখায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয়

গত ১৭ই অক্টোবর ২০০৩ শুক্রবার বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে মাসিক 'পৃথিবী'র লেখকদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো এই প্রথমবারের মত লেখক সম্মেলন। ইসলামিক সেন্টারের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ।

সভাপতির স্বাগত ভাষণের পর আলোচনায় অংশ নেন সবর্জনাব অধ্যাপক আবু জাফর, মাওলানা এ কে এম ছিফাতুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, প্রফেসর মুহাম্মদ সফিউল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন, অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ, মীযানুল করীম, আশরাফুল ইসলাম, মুহাম্মাদ সাজ্জাদুল ইসলাম, হাসান শরীফ, শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া, নকীব হুদা, ওমর বিশ্বাস ও মোশাররফ হোসেন খান।

'উন্নত মানের প্রবন্ধ রচনার কৌশল' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে জনাব অধ্যাপক আবু জাফর বলেন, হঠাৎ লেখক হলে চলবে না। ভাল গদ্য লিখতে গেলে বিষয়গুলো সুবিন্যস্ত করার যোগ্যতা থাকতে হবে এবং ভাল লেখার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে।

মাওলানা ছিফাতুল্লাহ বলেন, মানগত দিক দিয়ে আমাদের লেখা উন্নত করতে হবে। লেখাটি যেন সময়োপযোগী হয় সে সম্পর্কেও খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে উপস্থাপনা একটি শিল্প। মুসলিম জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে।

www.pathagar.com

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, আল কুরআনে লেখা-পড়ার প্রতি জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূলও (সা) লেখা-পড়ার প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামে লেখালেখির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রফেসর সফিউল্লাহ বলেন, একমাত্র আল কুরআনেই বিজ্ঞানের শিক্ষা আছে। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা বলেন, লেখা ক্রমাগত অনুশীলনের বিষয়। ভাষার দিক থেকে আমাদের সমৃদ্ধ হতে হবে এজন্য ভাল লেখকের ভাল বই পড়া প্রয়োজন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, যে কোনো একটি বিষয়ে লেখা-জোখা চালানো উচিত। তার সংগ্রহ এবং সংগ্রহও সেই বিষয়ে হওয়া জরুরী। সাবজেক্ট নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমাদের পরিকল্পিতভাবে লেখা প্রয়োজন।

মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান বলেন, একসময় ইসলাম সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগই ছিল না। বাংলা ভাষায় তেমন কোনো বইও ছিল না। এখন বহু লেখক-অনুবাদক এগিয়ে এসেছেন এবং ইসলামী সাহিত্যের এক বিরাট ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্য যদি আজও মানুষ জানতো, তাহলে বিরুদ্ধবাদীরা বিরোধিতা করতে পারতো না। ইসলামী সাহিত্যের জন্য নতুন লেকক তৈরি করতে হবে।

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, মুমিন হিসাবে প্রথমত আমাদের প্রয়োজন নৈতিক ভিত্তি। উপস্থাপনা টেকনিকের মাধ্যমে পাঠককে টেনে নিতে হবে। লেখার জন্য উন্নত জীবনের যন্ত্রণা থাকা জরুরী। লেখার মধ্যে ম্যাসেজ থাকতে হবে। আল্লাহর সাথে আমাদরে গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আমাদের লেখা শিরকমুক্ত হতে হবে এবং ইসলামী ধারায় শালীন ভাষায় লিখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কুরআনের শাশ্বত নীতিমালা যেন লঙ্ঘিত না হয়।

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন বলেন, ভাষার গতি পরিবর্তন হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আমাদের আকীদা ঠিক রেখে লেখার ক্রমোন্নতির জন্য চেষ্টা ও শ্রম অব্যাহত রাখতে হবে। জন-মানুষের ভাষায় আমাদের লেখা উপস্থাপন করতে হবে।

অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ বলেন, ভাল লেখার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা ও পরিশ্রম অব্যাহত রাখা এবং নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। লেখকদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করাও জরুরী। ভাল লেখার জন্য প্রশিক্ষণ একটা জরুরী বিষয় বটে, কিন্তু প্রথমত লেখককেই এগিয়ে আসতে হয়।

মীযানুল করীম বলেন, প্রতি বছর এধরনের সম্মেলন হওয়া প্রয়োজন। লেখক ও পাঠকের মধ্যে সমন্বয় রাখা জরুরী। আমাদের স্ববিরোধিতা বর্জন করতে হবে। পাঠকের বোধগম্য করে লেখার জন্য আমাদের আরও দক্ষ হতে হবে। বর্তমান সময়ের প্রতিযোগিতার টিকে থাকার মত শক্তি অর্জন করতে হবে। পাঠকের উপযোগী করে লিখতে হবে।

www.pathagar.com

আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিদেশী গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারি। ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারলে আমাদের সাহিত্য আরও উন্নত হবে।

সাজ্জাদুল ইসলাম বলেন, আমাদের সাহিত্যে অনুবাদের গুরুত্ব কম নয়। অনুবাদ সাহিত্যেও আমাদের ভূমিকা রাখা দরকার।

হাসান শরীফ বলেন, লেখকের জন্য পরিবেশ, ক্ষেত্র ও মাধ্যমের প্রয়োজন। আমাদের লেখা পূর্ণাঙ্গ হতে হবে এবং লেখার মধ্য দিয়ে ম্যাসেজ পৌছুতে হবে।

শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, প্রবন্ধকারকে চিন্তাশীল ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। প্রবন্ধের ভাষা সুস্পষ্ট, সাবলীল বিশ্লেষণ নির্ভর হওয়া উচিত।

নকীব হুদা বলেন, লেখায় গভীরতা থাকতে হবে। একটি লেখা যেন বহুকাল টিকে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ওমর বিশ্বাস বলেন, লেখকের সাথে পাঠকের সম্পর্ক এবং একটি সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে। ভাল লেখার জন্য আমাদের কমিটমেন্ট থাকা জরুরী।

সমাপনী বক্তব্যে অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, একটি প্রবন্ধ তো কয়েকটি প্যারাগ্রাফের সমষ্টি। তবে বাক্যগুলো এমন হওয়া চাই যা পাঠকদের সুখ দেবে। অর্থাৎ সুখপাঠ্য হওয়া চাই। বাক্য গঠনে থাকবে চমৎকারিত্ব। বেশী সংখ্যক পাঠকের নিকট বক্তব্য স্পষ্ট করতে চাইলে আমাদের কর্তব্য দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার পরিহার করা। লেখকদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত যাতে কোনোভাবেই সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ না ঘটে। কম কথায় বেশী ভাব প্রকাশ করে প্রবন্ধ লিখতে পারলে ভালো হয়। লেখায় আবেগের প্রাধান্য নয়, জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয়। সমালোচনাও হওয়া চাই পরিশীলিত। Aggressive নয়, Educative.

আমাদের এমন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয় যা অন্যদেরকে মানসিকভাবে আহত করে। আমাদের লেখা হওয়া উচিত লোকদেরকে কাছে টেনে আনার মত, দূরে ঠেলে দেয়ার মত নয়।

আমরা কলম সৈনিক : আমাদের কলম হোক
চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের হাতিয়ার

দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, লেখার আবেদন ও প্রভাব ব্যাপক-বিশাল। আজকের দুনিয়ায় ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অনেক প্রসার ঘটেছে। তারপরও মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের জন্য লেখাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, লেখাই হলো মূল কাজ। তিনি বলেন, আজকের অস্থির ও অবক্ষয়মান বিশ্বে লেখকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। মানুষকে সুন্দর ও কল্যাণের দিকে আহ্বান জানানো হলো চিন্তাশীল লেখকের কাজ। এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন একমাত্র তাওহীদে বিশ্বাসী শক্তিশালী লেখক। এ জন্য বিশ্বাসী লেখকদের আরও সতর্ক ও সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

গত ১৮ই মার্চ, ২০০৪ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় লেখক

www.pathagar.com

সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত লেখক সম্মেলনে "আমরা কলম সৈনিক : আমাদের কলম হোক চিন্তার বিশুদ্ধি সাধনের হাতিয়ার" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ, জনাব অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ও জনাব অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ। সভাপতির অভিভাষণে জনাব আবুল আসাদ বলেন, মহান রাব্বুল আলামীন রাসূলকে (সা) পাঠিয়েছিলেন মানুষের হিদায়াতের জন্য। তিনি সকল সময় মানুষকে কল্যাণের দিকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে লেখকদেরকেও দায়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে। মানুষের ভেতরের কল্যাণ ও শুভবোধকে লেখার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।

জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, আজকের বিশ্বে চলমান অন্যায়, যুলম-অসত্যকে লেখার মাধ্যমে প্রতিহত করা যদিও সম্ভব নয়, তবুও আমাদের সাহসের সাথে স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াতে হবে। নগ্ন এবং অকল্যাণকর সাহিত্য রচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা উচিতও নয়। তবে আমরা সত্য ও ন্যায়ের পথে আমাদের শক্তি ও গতির মাধ্যমে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারি। সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে আরও বেশী শক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। লেখা ও লেখকের মধ্যে যে ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়, সেটা পরিহার করাও একান্ত জরুরী।

জনাব অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান বলেন, পরিচ্ছন্ন চিন্তার অধিকারী বিশ্বাসী লেখকের লেখাটাও ইবাদাতের মধ্যে গণ্য। এক সময় কলমের মাধ্যমেই বিশ্বকে জাগিয়ে তোলা যেত। এখন কলমের সাথে প্রযুক্তিগত মিডিয়াও যুক্ত হয়েছে। আমাদের লেখকদের সকল ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ বলেন, কলম সৈনিক বলতে এখন শুধু সাংবাদিককেই বুঝায় না, বরং বিশ্বাসী লেখকদেরকেই কলম সৈনিক হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি বলেন, লেখকদের আবেগের সাথে যুক্তির সমন্বয় ঘটাতে হবে।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, "আনুগত্যেই সৈনিকের পরিচয়। কলম সৈনিকরাও এর ব্যতিক্রম নন। কিয়ামত পর্যন্ত আল কুরআনকে অবিকৃত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহপাক নিজেই এবং আল কুরআনের বিধান অনুযায়ী গোটা মানব জাতিকে পরিচালনা করার দায়িত্ব রয়েছে ঈমানদার মানুষদের উপরই। আর পরিচালনার যুগোপযোগী দিক-নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব রয়েছে বিশ্বাসী কলম সৈনিকদের।" তিনি উল্লেখ করেন, "আল কুরআনই একমাত্র বিশুদ্ধ জীবনাদর্শ। আল কুরআনই বিশুদ্ধ চিন্তার উৎস।" তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "লেখকদের লেখা ও জীবনাচরণে বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের যত প্রতিফলন ঘটবে চিন্তার

www.pathagar.com

বিশুদ্ধি তত ত্বরান্বিত হবে। তিনি উল্লেখ করেন, আল্লাহ্‌প্রদত্ত মর্যাদায় মানুষকে সচেতন করে তোলা, মানুষকে আত্মবিশ্বাসী এবং আল্লাহমুখী করাই কলম সৈনিকদের কাজ।" বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এই দ্বিতীয় লেখক সম্মেলনে দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও লেখকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'বিশ্বায়ন' মানে আধিপত্যবাদী এককেন্দ্রিকরণ

দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক এবং বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, 'বিশ্বায়ন' শব্দটি নতুন কিন্তু এর কাজটি বেশ পুরনো। 'বিশ্বায়ন' যদি ভাল উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তাহলে ভাল, নইলে এর খারাপ উদ্দেশ্যের সাথে বহুবিধ অকল্যাণ জড়িত রয়েছে। আজকের বিশ্বে 'বিশ্বায়ন' একটি অধিক আলোচিত বিষয়, বলতে গেলে প্রধান এজেন্ডা। সুতরাং বিষয়টিকে পাশ না কাটিয়ে বরং আমাদের আজ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে এর মধ্য দিয়ে আমরা কি কি কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিতে পারি।

গত ১০ই এপ্রিল, ২০০৪ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'বিশ্বায়ন' GLOBALIZATION শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির অভিভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের নিজস্ব সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত এবং ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক ও মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ কর্তৃক পরিচালিত উক্ত সেমিনারে 'বিশ্বায়ন' GLOBALIZATION শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, ড. সদরুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, ড. আবদুল ওয়াহিদ, ইকবাল কবীর মোহন, আলফাজ আনাম প্রমুখ।

সভাপতির অভিভাষণে জনাব আবুল আসাদ বলেন, সত্য বলতে আজকে যাকে 'বিশ্বায়ন' বলা হচ্ছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা বিশ্বায়ন নয়। একে বলা যেতে পারে 'আধিপত্যবাদী এককেন্দ্রিকরণ'। আমাদেরকে বুঝতে হবে পশ্চিমা বিশ্ব হঠাৎ করে 'বিশ্বায়ন' নিয়ে সরব হয়ে উঠলো কেন। তাদের টার্গেট কি? আমরা মনে করি গোটা বিশ্ব রাজনীতিকে একটি ছাতার নিচে আনার জন্য তারা পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল বাধা হিসাবে তারা দেখছে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মকে। সুতরাং এই বড় দুটো বাধাকে অপসারণ করে তারা 'বিশ্বায়নের' সিঁড়ি বেয়ে লক্ষ্যে পৌছাতে চায়। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে তারা গোটা বিশ্বকে ধর্মহীনে রূপান্তর করার জন্য এক মহাকূটকৌশলের জাল বিস্তার করেছে। তারা চায় বিশ্বে কোন ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব থাকবে না। থাকবে না দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পরিচায়ক কোনো বর্ডার বা সীমানা। এজন্য তারা 'বিশ্বায়ন' ও

www.pathagar.com

'ভিসামুক্ত বিশ্ব'-এর মত আপাত মধুর কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। আজকের বিশ্বে জাতীয় সংস্কৃতি ততোটুকুই কাজ করতে পারে, যতটুকু আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি অনুমোদন করে। এটা তাদের এক সূক্ষ্মতম কৌশল। জনাব আবুল আসাদ বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব যতই জাতীয়তাবাদ ও ধর্মকে দূর করতে চাক না কেন, তাদের এই প্রয়াস কখনই সফল হবে না। সফল হবে না তাদের 'ধর্মোত্তর' সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। কারণ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে সারা বিশ্বে ধর্ম এখন অনেক বেশী জোরদার ও শক্তিশালী। তিনি বলেন, আমরা 'বিশ্বায়ন' অবশ্যই চাই, কিন্তু সেটা হতে হবে 'ইসলামী বিশ্বায়ন।' খোদ পশ্চিমা বিশ্বেই স্বার্থের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। তারা পরাজিত হতে বাধ্য। সুতরাং আজ বিশ্বের মুসলমানদেরই দায়িত্ব নিতে হবে 'ইসলামী বিশ্বায়ন' প্রতিষ্ঠার জন্য। এজন্য আমাদের আদর্শের ভিত্তিতে সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও বেশী শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই আদর্শিক সংগঠন বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে প্রয়োজনীয় ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রেও আমাদেরকে সকল বাধা অতিক্রম করতে হবে।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, "গ্লোবালাইজেশান" যদি গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থরক্ষার কৌশল হয় তাহলে তা পৃথিবীর গণ-মানুষকে আকৃষ্ট করবে না। শক্তিধর এক বা একাধিক দেশের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে তা পৃথিবীবাসীর ওপর চাপিয়ে দিলেও তা এক সময় অবশ্যই মুখ থুবড়ে পড়বে। গ্লোবালাইজেশানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন এমন সব মূলনীতি গ্রহণ করা যা গোষ্ঠী বিশেষের নয়, সকল মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে। গ্লোবালাইজেশানের জন্য আরো প্রয়োজন এমন রাষ্ট্রশক্তির যা আপোষহীনভাবে গণ-মানুষের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যই নিবেদিত।

এমন সব মূলনীতির জন্য পৃথিবীবাসীকে অবশ্যই ইসলামের কাছেই ধর্ণা দিতে হবে এবং এমন রাষ্ট্রশক্তি ইসলামের অনুশীলনের ভিত্তিতেই গড়ে ওটা সম্ভব। পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষেরা মুক্তমন নিয়ে অনুসন্ধান করলে গ্লোবালাইজেশানের নির্ভুল প্রেসক্রিপশান একমাত্র ইসলামের মাঝেই পাবেন।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, পাশ্চাত্য বিশ্ব তাদের মার্কেট সম্প্রসারণের জন্য 'বিশ্বায়ন' শ্লোগানে সোচ্চার। এটা তাদেরই একান্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়। প্রকৃত 'বিশ্বায়নে' তাদের কোনো আগ্রহ ও আন্তরিকতা নেই। 'বিশ্বায়নের' ছদ্মাবরণে তারা তাদের ভূমি ও রাষ্ট্র সংরক্ষণের জন্য অপরাপর দেশকে বিরান ও ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমরা বিশ্বায়নকে ইতিবাচকভাবে নিতে পারি। মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে এখন এ ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা জরুরী। প্রকৃত অর্থেই যদি বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো বিশ্বায়নের আলোকে কাজ করতে পারে তাহলে এর সুফল আমরাই লাভ করতে পারি। বিশ্বায়নকে ইসলামের পক্ষে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই উপায় উদ্ভাবনের সময় এসেছে।

www.pathagar.com

জনাব ড. সদরুল ইসলাম বলেন, বিশ্বায়নের সাথে যুক্ত হয়েছে অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ বহুবিধ বিষয়। এখন মুসলিম বিশ্বের উচিত বিশ্বায়নের মুকাবিলায় শক্তভাবে দাঁড়ানো। মুসলিম বিশ্বের যে তেল সম্পদ রয়েছে, পশ্চিমা বিশ্বই তা নিয়ন্ত্রণ করে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এই তেল সম্পদ যদি মুসলিম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। আজ বড় বেশী প্রয়োজন আমাদের শক্তি, সামর্থ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমোন্নতি ঘটানো এবং তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো। যদি তাই হয় তাহলে পশ্চিমা বিশ্বের 'বিশ্বায়ন' আমাদের অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারবে না। এখন প্রয়োজন আমাদের সকল কিছু কিভাবে সঠিক কাজে ব্যবহার করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন ও শক্তির সমন্বয় করা।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, বিশ্বায়ন শব্দটি প্রকৃত অর্থে ইসলামেরই কনসেপ্ট। আমরা বিষয়টিকে সেইভাবে নিয়ে যদি সারা বিশ্বে ইসলামের আদর্শ-ঐতিহ্য এবং দাওয়াতী কাজকে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে বিশ্বায়ন দিয়ে আমরা উপকৃত হব। আমরা বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিকগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি, সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী।

জনাব অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান বলেন, বিশ্বায়নের নামে পশ্চিমা বিশ্ব সমগ্র বিশ্বকেই শাসন করছে। তাদের যত তৎপরতা ও আয়োজন সে কেবল ইসলামকে উৎখাত করার জন্যই। তাদের বিশ্বায়নের ধারা কেবল তাদের স্বার্থের জন্য। প্রকৃত বিশ্বায়নের কনসেপ্ট পেশ করেছে সর্বপ্রথম ইসলাম। সুতরাং পশ্চিমা বিশ্বের অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশের জন্য পশ্চিমা বিশ্বের চাপিয়ে দেয়া তথাকথিত 'বিশ্বায়ন' একটি ভয়ঙ্কর বিষয়। এর মাধ্যমে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিশ্ব মানবতা বিপর্যস্ত হবে।

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, নবী করীমের (সা) মদীনা সনদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম 'বিশ্বায়ন' কর্মসূচী সফল হয়েছিল। আজও যদি আমরা আমাদের উন্নয়ন ঘটাতে পারি তাহলে সমগ্র বিশ্বই মুসলমানদের করতলগত হওয়া সম্ভব।

জনাব ইকবাল কবীর মোহন বলেন, বিশ্বায়ন এখন আমেরিকার নেতৃত্বে। তারাই এটা নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সময়ে আমাদের করণীয় কি সেটা ভাবতে হবে।

জনাব আলফাজ আনাম বলেন, বিশ্বায়নের মুকাবিলায় আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রয়োজন।

মূল প্রবন্ধে জনাব অধ্যাপক মাহফুজ বলেন, "শুধু রাজনীতিবিদ বা পণ্ডিতগণই নন, এখনও বিপুল সংখ্যক পশ্চিমা নাগরিক পর্যন্ত মনে করেন যে তারাই সমগ্র বিশ্বের অভিভাবকরূপে ঈশ্বর-কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে, তারাই বিশ্বের পরিত্রাতা এবং এটা পূর্ব-নির্ধারিত। এ মানসিকতার জন্যই তারা পৃথিবীকে ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বাধীন একটি মাত্র ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত রাখার চেষ্টা করে, যার নাম এখন বলা হচ্ছে 'এককেন্দ্রিক

www.pathagar.com

বিশ্ব ব্যবস্থা'। এরই ধারাবাহিকতা ও প্রতিফলরূপে বিকাশ লাভ করেছে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত 'বিশ্বায়ন' প্রক্রিয়া।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, "উপনিবেশিকতার ভয়ংকর নেতিবাচক প্রভাব আজও উপনিবেশিকতাত্তোর দেশগুলোতে সংঘাত, বিভাজন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হানাহানি, দুর্নীতি, বিভাজনের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আফ্রিকান এক নেতার উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য, "সাদা চামড়ার মানুষেরা ভালো ভালো কথা বলে আমাদের হাতে বাইবেল ধরিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকার ব্যবস্থা করলো। আমরা যখন চোখ খুলি, তখন দেখতে পাই আমরা পরাধীন আর আমাদের জমিগুলো তাদের দখলে।"

প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে বলেন, "সামগ্রিক বিবেচনায় বিশ্বায়নকে বলা হচ্ছে সর্বগ্রাসী, যা বিশ্বের দেশে দেশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-জীবন যাপন-দর্শনসহ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। এমনকি, এককেন্দ্রিক বিশ্বের হোতা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণা ও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বৈশ্বিক সামরিক নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। পারমাণবিক নিবারণ এবং সামরিক জোটভিত্তিক, যেমন ন্যাটো, ওয়ারশ ইত্যাদি ভিত্তিক নিরাপত্তা ধারণার গুরুত্ব অপসারিত হয়েছে বহুলাংশে এবং সেই সঙ্গে বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের রূপ ও চরিত্র। এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে লাগসই সামরিক ও বিদেশ নীতি প্রণয়ন করছে যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নীতি ও স্বার্থের চারিত্র্য বদল প্রভাবিত করেছে বিশ্ব রাজনীতি ও শক্তির ভারসাম্যের বিন্যাস। যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুযুদ্ধোত্তর সামরিক নীতিতে শত্রু-মিত্রের নয়া ধারণা, জাতীয় স্বার্থের ব্যাখ্যা ও তার ভিত্তিতে নির্ধারিত বিভিন্ন অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব নিশ্চিতভাবেই সেসব অঞ্চলে এবং সে সঙ্গে তাবৎ বিশ্বের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট করছে।"...

"বিশ্বায়নের বেশ কিছু নেতিবাচক বিষয় সামনে চলে এসেছে। যেমন : বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও অর্থনীতিতে 'ডিজলোকেশন' হচ্ছে। পুরনো বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনের এ পাগলা হাওয়াকে যে দেশ চিহ্নিত করতে ও সামলাতে ব্যর্থ হবে, সে দেশকে পাগলা হাওয়া কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। এমনকি, প্রস্তুতহীন দরিদ্র দেশগুলোর মানুষ, সমাজ, প্রতিষ্ঠান বিশ্বায়নের অকস্মাৎ ও ক্রমবর্ধিষ্ণু গতিবেগের সামনে উদ্ভ্রান্তির চাপে পড়ছে, তা সামলানোর মত মানবিক, প্রাতিষ্ঠানিক, আইনগত ও সামাজিক সংহতিও অনেক দেশে অনুপস্থিত। বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বা এর সঙ্গে কার্যকরী ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার উপযুক্ত সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক বেষ্টনী, স্বশাসন ও ভরসা আনতে পারেন নীতি প্রণেতা ও রাজনীতিবিদগণ।"

জনাব মাহফুজ পারভেজ তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেদনার কথা হলো যে নানাভাবে ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন বা চিত্রিত করা হয়েছে। এ কাজটি একদিনে হয়নি, হয়েছে দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে– ক্রুসেড, উপনিবেশিকতাবাদ এবং বর্তমান বিশ্বায়নের ভেতর দিয়ে। ইসলামবিরোধী

www.pathagar.com

মিথও ডিসকোর্সকে ভাঙার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা আমরা দেখাতে পারিনি। এক্ষেত্রে আমাদের আলেম, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত সমাজ তথা কার ব্যর্থতা, সে মূল্যায়ন করতে হবে।"... "একবিংশ শতাব্দীর সদা-পরিবর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া অক্টোপাশের মতো আমাদের সমাজ-জীবন-বিশ্বাস-মূল্যবোধসহ সকল কিছুকেই তার নিজের কজার মধ্যে ঘিরে ধরেছে; সমাজ-জীবন-বিশ্বাস-মূল্যবোধসহ কিছুকেই বিশ্বায়নের নীতি-আদর্শ-কাঠামোর অধীনস্থ করছে এবং আমাদের সমাজ-জীবন-বিশ্বাস-মূল্যবোধসহ সকল কিছুকেই বদলে দিচ্ছে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট পশ্চিমা পুঁজিবাদী ও খৃস্টবাদী-ইহুদিবাদী মতাদর্শের রঙে। এই আগ্রাসন ক্ষুদ্র ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ও সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মূল্যবোধগত-রাজনৈতিক তথা সার্বিক অস্তিত্বের জন্য ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ। বিশ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র, উন্নয়নকামী ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রের মতোই বাংলাদেশেও অভিন্ন অসহায় সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।"... "প্রসঙ্গত বলা যায় যে : বিশ্বায়নের দ্রুতগতি বাংলাদেশ ও অন্যান্য রাষ্ট্র হিমশিম খাইয়ে দিচ্ছে। আমরা সবাই সহজেই বুঝতে পারছি, বিশ্বায়নের প্রভাব এড়ানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বায়নের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া যেমনিভাবে জরুরি, তেমিন জরুরি বিশ্বায়নের ফলাফলকে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা। কেননা, এ প্রশ্নটি বেশ জোরালোভাবেই সমানে এসে গিয়েছে, আর তা হচ্ছে : বিশ্বায়ন কি আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে নাকি দরিদ্র দেশসমূহের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আরো বেশি প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেবে এবং বৈশ্বিক অসাম্যকে জোরদার করবে? একই সঙ্গে এটাও অনস্বীকার্য যে বিশ্বায়ন দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে এবং বিশ্বায়নের সুফল কেবলমাত্র তখনই ভোগ করা সম্ভব, যখন বাংলাদেশের মতো দেশসমূহ বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কেননা, প্রস্তুতি গ্রহণে সামান্যতম দেরি বিশ্বায়নের সুফলের ক্ষেত্রে বিশাল পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।"...

তিনি বলেন, "জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভায় আলোকিত সৃজনশীল মানুষের পক্ষেই সম্ভব বিশ্বায়ন বা অন্য যে কোন ধরনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তাই প্রয়োজন মানবিক উন্নয়নের নবতর ধারা, যা মানুষের সক্ষমতার দিগন্তকে সুদূরের সন্ধানে প্রসারিত করবে; ইচ্ছার ও আগ্রহের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেবে; নিরাপত্তাহীনতা-বৈষম্যহীনতাকে ঘুচিয়ে ক্ষমতায়নের পরিধিকে দেবে বাড়িয়ে; সকল কাজে উদ্ভব হবে অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণের চেতনা; ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিবোধকে করবে সুদৃঢ়; সামাজিক উত্তরণের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃজন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেবে ইতিবাচক প্রণোদনা। আর তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে শিক্ষা, জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা।"... "আজকের একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি-তাড়িত পৃথিবীতে বিশ্বায়নের নামে খৃস্ট-ইহুদি মোর্চা গড়ে উঠেছে তাতেও উত্তর প্রান্তের মানুষের আগ্রাসী থাবার নিচে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যর্থতার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। পক্ষান্তরে ইসলামের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সাফল্যের স্বর্ণালী ইতিহাস। হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে ইসলামের দীক্ষায় অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অপাংতেয় মানুষগুলো এমন অনুপম জীবন-চরিত্রের অধিকারী হয়ে এতো সমৃদ্ধ মানব সম্পদে পরিণত হয়েছিলেন যে দুনিয়ার ইহজাগতিক বাদশাহী ছিল তাদের পদতলে আর আখেরাতের পরজাগতিক সাফল্য ছিল তাদের করতলগত। তাদের প্রযত্নে নিপীড়িত মানুষ ও মানবতা পেয়েছিল শান্তির সুশীতল সবুজ আশ্রয়। এমনকি, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অপার আকাশে নক্ষত্রের অমলিন ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে তারা দিক নির্দেশনার আলো ছড়াচ্ছেন। বিশ্বায়ন বা অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে আমাদের এখন সিদ্ধান্ত নিতে যে আমরা কোন্ দিক নির্দেশনার পথ ধরে এগিয়ে যাবো।"

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

আল্লাহর নির্দেশিত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকেই ফিরে আসতে হবে

মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর জনাব প্রফেসর ড. এম. উমার আলী বলেছেন, বিভিন্ন সমাজ, সভ্যতা সময় ও আদর্শের প্রেক্ষিতে শিক্ষা দর্শনেও ভিন্নতা আসে। কিন্তু শিক্ষার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকা উচিত, সেটা হলো উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আদর্শিক জীবন গঠন করা। এটা মূলত ইসলাম তথা কুরআনকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

গত ২২শে নভেম্বর, ২০০৪ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'শিক্ষা দর্শন' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির অভিভাষণে প্রফেসর ড. এম. উমার আলী উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের নিজস্ব সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত এবং সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ কর্তৃক পরিচালিত উক্ত সেমিনারে 'শিক্ষা দর্শন' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী জনাব আবুল আসাদ, জনাব অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, জনাব ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, ড. আবদুল ওয়াহিদ, জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম বুলবুল, জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন প্রমুখ।

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী তাঁর আলোচনায় বলেন, শিক্ষা দর্শন একটি অত্যন্ত ব্যাপক-বিশাল বিষয়। সংক্ষেপে এর স্বরূপ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা দান করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে শিক্ষা দর্শনের মূল নির্দেশনা হলো আমাদেরকে তৌহিদবাদী তথা ইসলামী শিক্ষার সারাৎসারকেই গ্রহণ করতে হবে। সেই শিক্ষার আলোকে জীবন ও জগতকে আলোকিত করে তুলতে হবে। এটা এমন এক বাস্তবসম্মত শিক্ষা ও ব্যবস্থা– যা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক– দুইদিক দিয়েই সমাজ ও জাতিকে উন্নত করে তোলে। দুনিয়া ও

www.pathagar.com

আখেরাত– উভয় ক্ষেত্রেই সমূহ কল্যাণ বয়ে আনে। ফলে আমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশিত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকেই ফিরে আসতে হবে।

দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গোটা মানব জাতির জন্যই সমান কল্যাণকর। দুঃখের বিষয়, আজকের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মূল দর্শনই অনুপস্থিত। বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ ও জীবন উন্নত করা সম্ভব নয়। সেখানে সফলতাও আসে না। আজকের দিনে আমাদেরকে ভাবতে হবে ইসলামী শিক্ষা দর্শনের মধ্যে কিভাবে কারিগরী ও সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো যায়। কুরআনিক শিক্ষা ও আধুনিক টেকনোলজী ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যেখান থেকে একজন যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে যেমন বেরিয়ে আসবেন, তেমনি একই সাথে তিনি হবেন একজন উন্নতমানের আদর্শিক মুসলমান।

জনাব অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান বলেন, ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে যা আছে, সেটা হলো তাগুতী শিক্ষা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা কখনই মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, শিক্ষা দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই একটি জাতির শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আমরা মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের অধিবাসী। সুতরাং আমাদের শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উৎসই হতে হবে আল কুরআন। কারণ, আল কুরআনই প্রথমে শিক্ষা দর্শন, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, বস্তুবাদী শিক্ষা ধর্মহীন শিক্ষারই নামান্তর। ইসলামী জীবন দর্শনের ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো জরুরী। শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হওয়া উচিত ইসলামী শিক্ষা দর্শন।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে যে, আমাদের জীবন দর্শনের মূল ভিত্তি কি? বিভ্রান্তিকর বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি জাতি কখনই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। কারণ শিক্ষার ওপরই জীবন ও জগতের কল্যাণ নিহিত। সুতরাং আমাদের শিক্ষা দর্শনের মূল ভিত্তিই হতে হবে ইসলাম তথা আল কুরআন।

মূল প্রবন্ধে জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, "মানুষের শিক্ষার সাথে গোটা মানব জাতি ও পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে বিধায় মানব জীবনে শিক্ষা দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম।" তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "জীবন দর্শন ভেদে শিক্ষা দর্শনের ভিন্নতা থাকায় কোন কোন জীবন দর্শন হতে উদ্ভূত শিক্ষা দর্শন মানুষকে প্রকৃত সত্য হতে বিভ্রান্ত করে আল্লাহবিমুখ করে গড়ে তুলেছে। আল কুরআনের সত্য জীবন দর্শন হতে উদ্ভূত নয় এমন সকল শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানুষেরা এক অপূরণীয় ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে।

তিনি বলেন, "বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, জাতি হিসাবে আমাদের টিকে থাকা এবং

www.pathagar.com

পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রয়োজনে আমাদের শিক্ষা দর্শনে আল কুরআনে ঘোষিত শিক্ষা দর্শনের প্রতিফলন থাকা খুবই জরুরী এবং আল কুরআন-প্রদর্শিত মানবিক গুণাবলী অর্জনের পাশাপাশি আমাদেরকে প্রযুক্তিগত দক্ষতাও অর্জন করতে হবে।"

উক্ত সেমিনারে দেশের বহু বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে আল কুরআনের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে

দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক ও বিশিষ্ট লেখক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, ইসলামী সংস্কৃতি সর্বদা সম্প্রসারণ ও প্রাগ্রসরতাকে ধারণ করে। যখন যে দেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে, তখন সেই সাথে ইসলামী সংস্কৃতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইসলামী সংস্কৃতির অগ্রসতার পথ যেখানে রুদ্ধ হয়েছে, সেখানেই অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইসলামী সংস্কৃতিতেই কেবল উদারতা ও বহুমাত্রিকতা আছে। ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে আল কুরআনের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে। আজকের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সংস্কৃতি গোটা বিশ্বকেই নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতা ধারণ করে।

গত ৩০শে ডিসেম্বর, ২০০৪ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত 'ইসলামী সংস্কৃতি' শীর্ষক এক সেমিনারে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের নিজস্ব সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত এবং সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ কর্তৃক পরিচালিত 'ইসলামী সংস্কৃতি' শীর্ষক সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান। ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনার জনাব আবুল আসাদ ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. এম. উমার আলী, অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ, অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ, জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন প্রমুখ।

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী বলেন, আজকের চলমান ভোগবাদী সংস্কৃতি কুসংস্কারের আকণ্ঠে নিমজ্জিত। ইসলামী সংস্কৃতি দিয়েই বিজাতীয় অপসংস্কৃতির মুকাবিলা করতে হবে।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, সংস্কৃতি মানে পরিশীলন, পরিমার্জন, সুসম্পাদন কিংবা সর্বোত্তমরূপে সম্পাদন। কোন্ কাজ কিভাবে করলে, কোন কথা কিভাবে বললে, কোন লেখা কিভাবে লিখলে এবং কোন আচরণ কিভাবে করলে তা পরিশীলিত, পরিমার্জিত, সুসম্পাদিত কিংবা উত্তমরূপে সম্পাদিত বলে স্বীকৃত হবে? এর একটিই জবাব, ইসলামী শরীয়াহ অনুমোদিত সকল কর্মকাণ্ড ইসলামী মূল্যবোধের নিরিখে সর্বোত্তমরূপে সম্পাদনের নাম ইহসান। আর এই ইহসানই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। তিনি বলেন, আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাই সংস্কৃতির একমাত্র কার্যকর নিয়ন্ত্রক শক্তি। এই নিয়ন্ত্রক শক্তির অনুপস্থিতি মানুষকে এমন সব কর্মকাণ্ড

www.pathagar.com

উদ্ভাবন ও অনুশীলনে প্ররোচিত করে সেগুলোকে ঢাকঢোল পিটিয়ে সংস্কৃতি বলে প্রচার করা হলেও আসলে সেইগুলো সংস্কৃতি নয়, অপসংস্কৃতি।

অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ বলেন, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা ও উপলব্ধি থাকতে হবে। আজ ইবনে খালদুনের মত মনীষীদের প্রয়োজন– যারা ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সমাজকে সম্যক অবহিত ও জাগরিত করতে পারেন। ইসলামী সংস্কৃতির প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিকটাও আজ সমাজের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। অপসংস্কৃতিতে গোটা মিডিয়া ও দেশ ছেঁয়ে গেছে। আজ আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং উপায়-উপকরণ নির্ধারণ করতে হবে যে, ইসলামী সংস্কৃতির মাধ্যমে কিভাবে এই জাতিকে অপসংস্কৃতির কবল থেকে রক্ষা করা যায়।

জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান বলেন, ইসলামী সংস্কৃতির সাথে ইবাদাতের একটি সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। অতএব ইসলামী সংস্কৃতি নিজে মেনে চলা এবং অন্যদেরকেও সেই আলোকে আলোকিত করার দাবী রাখে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, সংস্কৃতি একটি ব্যাপক বিষয়কে ধারণ করে। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দান করেছেন। কিন্তু এটা পরিষ্কার থাকা জরুরী যে, আমরা মুসলমান। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি হবে একমাত্র ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতায় রয়েছে অতীতের মুসলিম মনীষীদের বিরাট অবদান। সেগুলোকেও সামনে রাখতে হবে। তিনি বলেন, সংস্কৃতির মূল ভিত্তিই হলো বিশ্বাস, যেটা আল কুরআন ও আস সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেবল সেই দিকটিই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। অপসংস্কৃতির ছোবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে সেই সাথে সমাজ ও জাতিকেও বাঁচাতে হবে।

অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ইসলাম যেমন স্থান-কাল-আবহাওয়া-বর্ণ-গোত্র নিরপেক্ষ সর্বজন ও সর্বকালীন পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, ইসলামী সংস্কৃতিও তাই। ইসলামী সংস্কৃতি বিনির্মাণে ইসলামী আদর্শ ও জীবন চেতনাই প্রধান। তিনি তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে তৎপর হতে হবে। বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল বিজাতীয় অপসংস্কৃতির করালগ্রাস থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

বিশ্বায়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

দৈনিক সংগ্রামের সম্পদাক, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের চেয়ারম্যান জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, 'বিশ্বায়ন' আজকের দিনে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। আমরা মনে করি বিশ্বায়ন একটি পদ্ধতিগত কর্মকৌশল। সেই দিক থেকে বিচার করলে এর ক্ষতিকর বিষয়গুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে বুঝা যায় না। কিন্তু এর নেতিবাচক দিকগুলো এতই মারাত্মক যে বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলো এর প্রভাবে সমূহ সঙ্কটে পতিত হবে।

www.pathagar.com

গত ৮ই আগস্ট, ২০০৪ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'বিশ্বায়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির অভিভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের নিজস্ব সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক, মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ কর্তৃক পরিচালিত উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক ও ব্যাংকার জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক, বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, আকরাম ফারুক, ওমর বিশ্বাস, নকীব হুদা প্রমুখ।

জনাব আবুল আসাদ তাঁর আলোচনায় বলেন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত অর্থে বাস্তবসম্মত এবং সার্বিক কল্যাণমুখী 'বিশ্বায়নের' সফল প্রবর্তক। রাব্বুল আলামীন গোটা মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্যই কেবল তাঁকে মনোনীত করেছেন। রাসূল (সা) তাঁর গোটা জীবনকেই মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য ব্যয় করেছেন। আজকের দিনেও রাসূল প্রদর্শিত পথেই কেবল 'বিশ্বায়নের' সফল স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

জনাব আবুল আসাদ বলেন, আজ বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দকে একটি কার্যকরী ইসলামী বাস্তবসম্মত কর্মকৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। আমাদের প্রজ্ঞাসম্পন্ন উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সতর্কতার সাথে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে হবে। পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেয়া 'বিশ্বায়ন' প্রকৃত অর্থে এককেন্দ্রিকরণের একটি অপকৌশল। তাদের এই অপকৌশলের মুকাবিলায় মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে একধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত বন্ধনে অগণিত মানুষকে বন্দী করা হচ্ছে, এই বিষয়টিও ভালোভাবে বিশ্লেষিত হওয়া দরকার এবং গণ-মানুষের আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রকৃত অর্থেই কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, আজকের বহুল আলোচিত 'বিশ্বায়ন' হচ্ছে অর্থ, বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতির মিলন ক্ষেত্র। এটা পশ্চিমাদের একটি বাণিজ্যিক মিশন। আজ সাম্রাজ্যবাদ গোটা পৃথিবীর বুকে চেপে বসেছে। তারা তাদের নিজস্ব স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলছে। তাদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকগুলো খুবই প্রকট। এর ভয়ানক গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বনির্ভরশীল হতে হবে।

www.pathagar.com

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান বলেন, যে অর্থে আজ পশ্চিমা বিশ্ব বিশ্বায়ন চর্চা করছে ইসলাম তা সমর্থন করে না। বরং ইসলাম এর অবসান চায়। কারণ, একমাত্র ইসলামই সার্বজনীন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পৃথিবীর যে কোনো জাতির জন্যেই মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম। ইসলামী আদর্শকে আজ বিশ্বের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আজকের 'বিশ্বায়নের' মূলে রয়েছে সুদী ও মহাজনী ব্যবসা। অর্থের বিনিময়ে আজ ইহুদীরা মুসলমানের মাথা কেনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সুতরাং বিশ্ব মোড়লদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, বিশ্বায়ন তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের জনগণের জন্য দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনতে পারে না। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সত্যিকার বিশ্বায়ন একমাত্র ইসলামের দ্বারাই সম্ভব। বিশ্বায়ন যদি সমতাপূর্ণ, সহযোগিতাভিত্তিক হয়, তবে তা আশির্বাদ। কিন্তু দুর্বলকে শোষণ এবং বিশ্বায়নের ছদ্মবেশে দুর্বলকে শাসন করা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদ

দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক ও বিশিষ্ট লেখক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, সমাজতন্ত্রের পতন হলেও বিশ্ব থেকে এখনও সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটেনি। বরং নানারূপে, নানাভাবে সে তার আগ্রাসী ভূমিকা আরও বেগবান করেছে। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ উত্তর আধুনিক রূপ ধারণ করে বিশ্বব্যাপী চালাচ্ছে তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। অস্ত্র, অর্থ, শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখন মিডিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। সাম্রাজ্যবাদের বাইরের দিকগুলো যেমন আমাদেরকে বুঝতে হবে, তেমনি এর অন্তর্গত স্বরূপটিও উন্মোচন করতে হবে। তিনি বলেন, ২১ শতকের লড়াই হলো পশ্চিমা দর্শন ও ইসলামের মধ্যে। এই প্রেক্ষিতে বিশ্ব মুসলিম মিল্লাতকে আজ সতর্ক থাকতে হবে। আমাদেরকে মৌলিক মানবীয় গুণাবলী ও যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে। ইসলামের উৎকৃষ্ট জীবন দর্শন বিশ্বের কাছে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরতে হবে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত "যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদ" শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের নিজস্ব সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত 'যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদ' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ, সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক ও বিশিষ্ট লেখক-বুদ্ধিজীবী জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, প্রফেসর ড. এম. উমার আলী,

www.pathagar.com

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির, জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, জনাব মীযানুল করীম, জনাব আহসান হাবীব ইমরোজ প্রমুখ।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ বলেন, সাম্রাজ্যবাদ সকল সময় দখলদারিত্ব ও আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে। পরদেশ দখল, শোষণ ও শৃঙ্খলিত করে। দখলকৃত দেশের মানুষকে দাসত্বে বাধ্য করে কিন্তু ইসলাম শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে দাসত্বমুক্ত করার জন্যই অন্য দেশে যায়। ইসলাম সাম্রাজ্যবাদকে কখনই সমর্থন করে না। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাপটে কম্পমান। এর ভয়াবহ ছোবলের মুকাবিলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরাই আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। যদি সেটা সফলভাবে করা সম্ভব হয় তাহলে আমার বিশ্বাস শুধু মুসলমানই নয়, সমগ্র বিশ্বই আলোড়িত ও জাগরিত হবে। তিনি বলেন, যে সকল কারণে বড় বড় সাম্রাজ্যবাদীদের ইতিপূর্বে পতন ঘটেছে, আজকের বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকার মধ্যেও পতনের সেই লক্ষণসমূহ দেখা যাচ্ছে। মনে করি, তাদের পতনও অত্যাসন্ন।

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, বিশ্ব ইতিহাস যখন থেকে চর্চা শুরু হয়েছে, তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদ বিকাশ লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস বহু পুরনো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। এই সময়ে আমেরিকা তার সাম্রাজ্যবাদের থাবা বিস্তারের সুযোগ পেল। এখন বিশ্বের একক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। হিটলারের চেয়েও আমেরিকা এখন ভয়ানক ও হিংস্র হয়ে উঠেছে। তাদের উদ্দেশ্য ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনকে উৎখাত করা, মুসলমানদেরকে দুর্বল ও নিঃশেষ করা। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা রাখছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়নি, হতে পারে না। সুতরাং আমেরিকার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরও পতন অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য প্রয়োজন এখন মুসলিম বিশ্বকে সচেতন হওয়া এবং আত্মনির্ভরশীল হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার।

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী বলেন, সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা ভূমি-দস্যুদের মত, বরং তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। তারা শুধু দেশই গ্রাস করে না, গ্রাস করে সেই দেশের আদর্শ, ঐতিহ্য ও সভ্যতাও। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। আমরা যেন কোনোক্রমেই তাদের তাবেদারে পরিণত না হই।

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান বলেন, কর্তৃত্ব ও শোষণের জন্যই যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটেছে। কালে কালে সাম্রাজ্যবাদ খোলস বদল করলেও তার অবসান কখনই হয়নি। আজকের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ করার মত কোনো শক্তি বিশ্বে নেই– এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ইসলামকে যদি যথাযথভাবে বিশ্ব দরবারে আমরা তুলে ধরতে পারতাম, তাহলে এর অবসান প্রত্যাশা করা যেত। কারণ ইসলামই একমাত্র মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রদানে সক্ষম।

www.pathagar.com

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, সাম্রাজ্যবাদ একটি বিশাল আগ্রাসী শক্তি। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে আরও ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। এর বিরুদ্ধে গণ-সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরী।

অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "আগে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শক্তিকে সনাক্ত করা গেলেও বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে অদেখা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবলে আক্রান্ত হয়েছে তাবৎ বিশ্ব। আগে অনেকগুলো সাম্রাজ্যবাদী দেশ বা শক্তির উদ্ভব লক্ষ্য করা গেলেও বর্তমানে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রযত্নে ও পৃষ্ঠপোষকতায় একজোট হয়েছে সকল সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি বিশ্বের দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলোর বিরুদ্ধে।"

উক্ত সেমিনারে দেশের প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ইজতিহাদ কি ও কেন?

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন বলেছেন, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকেই বর্তমান সময়ে ব্যাপকভাবে ইজতিহাদ করার প্রয়োজন রয়েছে। এটা যদি শূরাভিত্তিক হয় তাহলে আরও বেশী ফলপ্রসূ হবে। তিনি বলেন, বর্তমান আলেম সমাজকে ইজতিহাদের জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তিনি আলেমদের প্রতি ইজতিহাদ ও জ্ঞানের দরজা খুলে দেবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

গত ১৮ই এপ্রিল, ২০০৫ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত 'ইজতিহাদ কি ও কেন?' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব যাইনুল আবেদীন উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ পরিচালিত 'ইজতিহাদ কি ও কেন?' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলাম প্রচার সমিতির চেয়ারম্যান মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান।

পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন যথাক্রমে প্রফেসর ড. এম. উমার আলী, মাওলানা এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ, মাওলানা আবু তাহের, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ, মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুর রহমান, মাওলানা আবদুল খালেক মজুমদার, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, মাওলানা খলিলুর রহমান আল মাদানী, ড. হাসান মঈনুদ্দীন, মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন, মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাহান, মাওলানা আবদুল হাকীম আল মাদানী প্রমুখ।

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী বলেন, আজকের সমাজের অবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ইজতিহাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া একান্ত জরুরী। যারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাদের সেই বিষয়ে ইজতিহাদ করা প্রয়োজন। পরিস্থিতির আলোকে ইজতিহাদের কাজকে সম্প্রসারিত করা এবং এর প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে আলেম

www.pathagar.com

সমাজকে আজ ভাবতে হবে। তিনি ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য আলেম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মাওলানা এ. কিউ. এম. ছিফাতুল্লাহ বলেন, জাতির জন্য ইজতিহাদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য যে চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন– সেটাই ইজতিহাদ। জাতির সামনে যখন যে সমস্যা আসবে তখন ইজতিহাদের মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান প্রদান করতে হবে। এর জন্য উলামায়ে কিরামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, আজকের সমাজে ইজতিহাদ নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা-ভাবনা করা হয় না। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম যেহেতু চলমান, সেই কারণে ইজতিহাদের কাজও চলমান থাকা উচিত। ইজতিহাদের কাজ খুব সচেতনভাবে দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে করা প্রয়োজন। তিনি ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সমষ্টিগতভাবে, এমনকি একটি নির্দিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে ইজতিহাদের কাজ চালানোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন।

মাওলানা আবু তাহের বলেন, রাসূলের (সা) জীবনের যেখানে সমাপ্তি, সেখান থেকেই ইজতিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শুরু করেছে। এটা চলবে কিয়ামত পর্যন্ত। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বের সমস্যা সমাধানের জন্য শরীয়তের আলোকে, কুরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে ইজতিহাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া একান্ত জরুরী। এর জন্য প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান তাঁর মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "সাধারণত মনে করা হয়, বর্তমানকালে ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ, কারো পক্ষে এ যুগে ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা বর্তমান যুগেও যদি কেউ ইজতিহাদের জন্য আবশ্যক যাবতীয় যোগ্যতা, গুণাবলী ও জ্ঞান-গরিমার অধিকারী হন, তাহলে নির্দিষ্ট সীমা ও শর্তাধীনে ইজতিহাদ অসম্ভব নয়। বরং আল্লাহপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দীনকে সচল ও স্থায়ী রাখার জন্য ইজতিহাদের পথ সদা উন্মুক্ত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।"

উক্ত সেমিনারে বহু আলেম ও শিক্ষাবিদ উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদ্র ঋণ : দারিদ্র্য দূরীকরণ বনাম সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন সুদৃঢ়করণ

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রচলিত এনজিওগুলো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের ছদ্মাবরণে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে চলেছে। ক্ষুদ্র ঋণ যারা দিচ্ছে তারা তাদের অনৈতিক ম্যাকানিজমের মাধ্যমে প্রদেয় ঋণের চেয়ে বহুগুণে লাভসহ আদায় করছে। এতে করে পোষণের পরিবর্তে তাদের শোষণের চিত্রটিই অনেক বেশী করে ফুটে উঠছে। তিনি বলেন, ইসলামই একমাত্র শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সুতরাং ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপারে ইসলামী অবকাঠামো জোরদার ও উৎসাহিত করতে হবে।

www.pathagar.com

গত ২৫শে জুলাই, ২০০৫ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'ক্ষুদ্র ঋণ : দারিদ্র্য দূরীকরণ বনাম সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন সুদৃঢ়করণ' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ-এর পরিচালিত উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম।

পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব প্রফেসর ড. এম. উমার আলী, সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মুহাম্মদ কামারুজ্জামন, অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ, শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ও মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বুলবুল।

জনাব আবুল আসাদ আরও বলেন, এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণদান এ পর্যন্ত বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে তা আজ খতিয়ে দেখার প্রয়োজন। তাদের প্রদত্ত ঋণ কিভাবে দরিদ্র মানুষকে আরও শোষণের হাতিয়ার বানাচ্ছে তাও তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ৮৬ হাজার গ্রামকে নিয়ে সমীক্ষা চালাতে হবে এবং দরিদ্র মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে চিহ্নিত করে তার আলোকে ইসলামী বাস্তবানুগ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকৃত দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তিনি এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসহ ইসলামী এনজিওসমূহকে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

প্রফেসর ড. এম. উমার আলী বলেন, আজ ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না, বরং সেটা হচ্ছে মূলত সাম্রাজ্যবাদ বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য। এক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামী কর্মকৌশলই মানুষকে প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে।

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, ক্ষুদ্র ঋণ আজ মিডিয়ানির্ভর বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারিত ইস্যু। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের নামে মূলত তাদেরকেই শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একটা ঘৃণ্য অপকৌশল। বাংলাদেশেও বিদেশীনির্ভর প্রচুর এনজিওর মাধ্যমে চলছে অবাধে দরিদ্র-শোষণ। তারা গ্রামান্তরে পৌঁছে অসহায় মানুষকে নানা অপকৌশলের মাধ্যমে শোষণ করে চলেছে। এতে করে মূলত সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইসলাম ও সাম্য ইনসাফের আদর্শ পেশ করেছে। আমরা যদি ইসলামপ্রদর্শিত শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের হতদরিদ্র মানুষের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারি, যদি তাদের প্রকৃত চাহিদা পূরণ করতে পারি তাহলে তারা শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তিনি দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ইসলামের প্রায়োগিক কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নের প্রতি জোর তাকিদ দেন। তিনি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য শিক্ষাঋণ চালুর জন্য সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ বলেন, ক্ষুদ্র ঋণের নামে আমাদের চোখের সামনে এনজিওগুলো পুকুরচুরি করছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী এনজিওগুলো এদেশে কাজ চালাচ্ছে। তারা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যিক পরিবার প্রথাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী চক্র এদেশে কিভাবে তাদের মিশন পরিচালনা করছে তা সমীক্ষার মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। এর পাশাপাশি ইসলামের প্রেক্ষিতে কিভাবে দারিদ্র্য দূর করা যায় তা গভীরভাবে গবেষণা করে উপায়-উপকরণ বের করতে হবে। এদেশের দরিদ্র মানুষের প্রকৃত মুক্তির জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।

জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, জাহেলী যুগে মানুষকে যতটা নির্যাতনের হাতিয়ার বানানো হয়েছিল, আজ ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে এনজিওগুলো তার চেয়েও ভয়ঙ্করভাবে এদেশের দরিদ্র মানুষকে শোষণ করছে। তাদের শোষণের চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। সেই সাথে ইসলামের আলোকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রচেষ্টা কিভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, সেই কর্মপন্থাও অবলম্বন করা প্রয়োজন।

জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এনজিওরা যেভাবে শোষণের হাতিয়ার বানিয়েছে, তাতে করে আমরা শঙ্কিত না হয়ে পারি না। দরিদ্রদেরকে পরনির্ভরশীল না করে স্বনির্ভরশীল করার জন্য আমাদেরকে কর্মকৌশল উদ্ভাবন করা জরুরী। তাদের প্রকৃত মুক্তির জন্য ইসলাম কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে তাও সামনে রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রাসূলের (সা) প্রদর্শিত পথ ও নীতি অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আমাদের দেশের কেবল দরিদ্র-জনগোষ্ঠীকেই শোষণ করা হচ্ছে না, বরং সেই সাথে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে তারা এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সরকারের ওপরও প্রভাব বিস্তার করছে। সুতরাং এখনই আমাদেরকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

মূল প্রবন্ধে জনাব মুহাম্মাদ নূররুল ইসলাম বলেন, "দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলে বংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণের জমজমাট ব্যবসা করে আসছে। বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলোর ওপর সরকারের শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ না থাকায় তারা ইচ্ছামতো ঋণের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক গরীব মানুষকে শোষণ করছে। ফলে গরীব মানুষ এনজিওর খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে। .... ইসলাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শোষণের সকল পথ বন্ধ করে দিতে চায়। অর্থ কেন্দ্রীভূতকরণ ও শোষণের সকল পথ বন্ধ করা হলে কোন দেশ বা অঞ্চল রাতারাতি ধনী হওয়া আর কোন দেশ দরিদ্রে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক নয়।" তিনি তাঁর প্রবন্ধে ক্ষুদ্র ঋণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামের কর্মকৌশল সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন।

উক্ত সেমিনারে বহু লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী উপস্থিত ছিলেন।

ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদের কোনো সম্পর্ক নেই

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ বলেছেন, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদ কিংবা জঙ্গীবাদের দূরতমও কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃত

www.pathagar.com

অর্থে ইসলাম শান্তির প্রতীক এবং সকলপ্রকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার অবস্থান। ইসলামের যে দাওয়াত সেটা ব্যক্তি ও জীবন গঠনের দাওয়াত। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ একটি বহুল আলোচিত বিষয়। কিন্তু এর শুরু বহু পূর্বে। মূলত ইসলামের বিজয়কে প্রতিহত করার জন্যই পশ্চিমাবিশ্ব ইসলাম ও মুসলমানের ওপর সন্ত্রাস এবং জঙ্গীবাদের অপপ্রয়োগ করে আসছে। পশ্চিমাদের অভ্যাসই হলো মুসলমানদের সকল কিছুর মধ্যে সন্ত্রাসের গন্ধ আবিষ্কার করা। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটেও বিষয়টি আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। ১৭ই আগস্ট বাংলাদেশে যে ঘৃণ্যতম সিরিজ বোমা হামলা হলো, মনে করি এর পেছনেও রয়েছে দেশজ ও আন্তর্জাতিক সুগভীর ষড়যন্ত্র। ইসলামের ছদ্মাবরণে এদেশে কারা কি উদ্দেশ্যে এ ধরনের আত্মঘাতি কার্যক্রম চালাচ্ছে তার উৎস উদঘাটন করা একান্ত জরুরী।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'সন্ত্রাসবাদ' শীর্ষক এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে জনাব আবুল আসাদ উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে 'সন্ত্রাসবাদ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী এবং মাসিক পৃথিবী ও মাসিক আল ইসলামের সম্পাদক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী এবং সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, ড. অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম, মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান, অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ, জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, মাওলানা খলিলুর রহমান আল মাদানী, জনাব আকরাম ফারুক প্রমুখ।

জনাব আবুল আসাদ আরও বলেন, সমগ্র বিশ্বে এখন সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহুদীচক্র সন্ত্রাস ঘটিয়ে সুকৌশলে সেটা ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়। ইহুদী চক্রান্তে গোটা বিশ্ব এখন কম্পমান। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে কতিপয় স্বার্থান্বেষী দেশের গোয়েন্দা সংস্থার অপতৎপরতা। বাংলাদেশও সেই কালো থাবা থেকে মুক্ত নয়। বিষয়টি আজ গভীরভাবে ভাবতে হবে।

অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ বলেন, ইসলামে সন্ত্রাসের কোনো দৃষ্টান্ত নেই। রাসূলের (সা) যুগেও ছিল না। তাঁর সময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে– কখনই সন্ত্রাসের স্থান ছিল না। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। তিনি বলেন, মানুষের চিন্তার পরিশুদ্ধি ছাড়া কখনই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। ইসলামী আন্দোলন মূলত সেই কাজই করে যাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে যে ভয়াবহ সিরিজ বোমা হামলা সংঘটিত হলো, এর সাথে

www.pathagar.com

প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত দেশকে অস্থির ও অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য একশ্রেণীর কুচক্রীমহল সুপরিকল্পিতভাবে এধরনের কাজ করে তার দায়ভার ইসলামী আন্দোলনের ওপর চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে আরও সতর্ক হতে হবে।

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বিশ্বের প্রায় সাড়ে চারশো কোটি মানুষ ইসলাম, আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা এসকল বিষয়ে কোনো ধারণাই রাখে না। সুতরাং পশ্চিমাদের পক্ষে খুব সহজ হচ্ছে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের সাথে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে যুক্ত করা। তিনি বলেন, বর্তমান মিডিয়াগুলোর একটি অংশও সন্ত্রাসের চাষ করছে এবং দেশের মুসলিম যুবসমাজের মধ্যে সন্ত্রাসের বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। আমাদের ব্যর্থতা যে, আজো আমরা প্রকৃত সন্ত্রাসী ইহুদী কুচক্রীদের মুখোশ উন্মোচন করতে পারিনি। তারা নিজেদের ছাড়া অন্যদেরকে মানুষই গণ্য করে না। সারা মুসলিম বিশ্বে তারা সুপরিকল্পিতবাবে সন্ত্রাস ঘটিয়ে তার দোষ ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, দুর্নীতি, অর্থ, মতাদর্শ ও রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হয়। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান সরকার, চারদলীয় ঐক্যজোট এবং আগামী নির্বাচনই এই সন্ত্রাসীদের মূল টার্গেট। এ ব্যাপারে সরকার, জোট ও জনগণকে সচেতন থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ বলেন, সন্ত্রাস ও জিহাদ এক জিনিস নয়। এর মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু পাশ্চাত্যবিশ্ব সন্ত্রাস ও জিহাদকে এক করে ইসলাম ও মুসলমানকে বিশ্বের দরবারে সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী হিসাবে তুলে ধরছে। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহপাক সকলপ্রকার সন্ত্রাস ও ফেতনা থেকে দূরে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামে বিশ্বাসী কোনো মুসলমানই কখনো সন্ত্রাসী হতে পারে না। পশ্চিমা বিশ্বের এটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া একটি ঘৃণ্য বিষয়।

ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম বলেন, শুধু বোমা বা অস্ত্র দিয়ে নয়, ইসলাম ও মুসলমানের ওপর বর্তমান সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসও চলছে।

জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বলেন, ইসলাম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে কোনো ক্রমেই অনুমোদন করে না বরং সন্ত্রাস দমনের জন্য ইসলামে কঠোরভাবে নির্দেশনা রয়েছে। সন্ত্রাসীদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহপাক আল কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ প্রদান করেছেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কখনোই সন্ত্রাসের আশ্রয় নেবার নজির নেই। একটি বিশেষ মহল তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য এ ধরনের কাজ ছদ্মবেশ ধারণ করে পরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছে।

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান বলেন, সন্ত্রাসের সাথে ইসলামকে যুক্ত করা হচ্ছে মূলত ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যই। অথচ ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

www.pathagar.com

জনাব আকরাম ফারুক বলেন, ইসলাম এসেছে মূলত সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনের জন্য। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, আজকের মিডিয়াগুলোর বিরাট একটি অংশ ইসলামকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। মিডিয়ার এই জঘন্য সন্ত্রাস অত্যন্ত নিন্দনীয়।

অধ্যাপক মাহফুজ পারভেজ বলেন, ইসলাম হলো একটি সংস্কারমূলক আন্দোলন। এর সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। যতই মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী বলে প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা করা হোক না কেন, মুসলিমদের উচিত হবে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করা ও আল্লাহর পথে অবিচল থাকা। কোনো উসকানিই যেন আমাদের পথ চলাকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে।

মূল প্রবন্ধে জনাব শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির বলেন, "জন্মের উৎস থেকে বুঝা যাচ্ছে, 'সন্ত্রাস' শব্দের উৎস ইসলামে নয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভেতরেই রয়েছে। .... পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশ্বের অধিকাংশ সন্ত্রাসী ঘটনার পেছনে রয়েছে পাশ্চাত্যের কুশলী হাত।... ইসলামে অন্যায়ভাবে কোনো মানুষ হত্যার লাইসেন্স যেমন নেই, তেমনি আত্মঘাতি বোমা হামলারও কোনো অনুমতি নেই। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদ, ইতিবাচক সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনো বুনিয়াদ নয় বিধায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, আদর্শ সমাজ গঠনের কোনো ভিত্তি নয়।"

উক্ত সেমিনারে বহু সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সাংস্কৃতিককর্মী উপস্থিত ছিলেন। ■

লেখক-পরিচিতি : মোশাররফ হোসেন খান– কবি, সম্পাদক : মাসিক নতুন কলম।

www.pathagar.com

সেমিনার
স্মারক-গ্রন্থ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com